Bangobondur Jibone S
Pathak Shamabesh
Since
1987
4390802
Tk. 500.00

বঙ্গবন্ধুর জীবনে স্মরণীয় ঘটনা

ড. দেবব্রত দেবরায়

বঙ্গবন্ধুর জীবনে স্মরণীয় ঘটনা

ড. দেবব্রত দেবরায়



বঙ্গবন্ধুর
জীবনে
স্মরণীয় ঘটনা

বঙ্গবন্ধুর জীবনে স্মরণীয় ঘটনা

ড. দেবব্রত দেবরায়

পারিজাত প্রকাশনী

উৎসর্গ

শিল্প-সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশকে
এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংগ্রামে অক্লান্ত যোদ্ধা
জনাব ড. আবদুস শোভন গোলাব-এর করকমলে

বঙ্গবন্ধুর জীবনে স্মরণীয় ঘটনা ■ ড. দেবব্রত দেবরায়

প্রথম প্রকাশ ॥ ২০১৫

স্বত্ব ॥ লেখক

প্রকাশক ॥ শওকত হোসেন লিটু
পারিজাত প্রকাশনী ৬৮-৬৯ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৫৬২৫ মোবাইল ॥ ০১৬১১-৯০৬০৪০
ই-মেইল ॥ parijat1999@gmail.com
প্রচ্ছদ ॥ সাজেদুর রহমান সাজ
বর্ণবিন্যাস ॥ শাওন কম্পিউটার, বাংলাবাজার, ঢাকা
মুদ্রণ ॥ আল্-কাদের অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

মূল্য ৫০০ টাকা

BANGOBONDUR JIBONE SORORIYA GOTONA
by D. Debbrata Debroy
Published by Showkat Hossain Litu
Parijat Prakashani 68-69 Pyaridas Road, Dhaka-1100
Phone : 9575625 e-mail : parijat1999@gmail.com
U.K. Distributor : Sangeeta Limited, 23 Brick Lane, London.
U.S.A. Distributor : Muktadhara, 378-69. 2nd floor, 74 St, Jackson Height, N.Y. 11372
Canada Distributor : Anyamela, 300 Danforth Ave. (1st floor, Suite-202), Toronto
ATN Mega Store, 2970 Danforth Ave, Toronto.
First Published 2015
Price : Taka 500 Only
ISBN 978-984-507-227-4

অনলাইনে বই খুঁজতে ভিজিট করুন http://rokomari.com/parijat
অথবা ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭

প্রাকভাষ

বঙ্গবন্ধু। ছোট্ট এই বাংলা শব্দটি আমাদের মননে উদ্ভাসিত হলেই আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে একজন মহান মানুষের অবয়ব। বঙ্গবন্ধু শব্দটি উচ্চারিত হলেই গভীর শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায় বিশ্বব্যাপী বাঙালির। বঙ্গবন্ধু মানেই আত্মত্যাগ। বঙ্গবন্ধু মানেই মুক্তি এবং স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু মানেই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। বঙ্গবন্ধু মানেই একবুক আশা আর প্রত্যয়। বঙ্গবন্ধু মানেই জাতি গঠন এবং জাতির বিকাশ। বঙ্গবন্ধু মানেই এক বুক ভালোবাসা। তিনি এক অবিসংবাদি নেতা। শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশেরই এক অন্য নাম শেখ মুজিবুর রহমান। শারীরিকভাবে হয়তো তিনি আজ নেই আমাদের মাঝে। কিন্তু তার আদর্শের কোনো মৃত্যু নেই। তাঁর জীবদ্দশায় নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফসলই আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ। যা সমগ্র বিশ্বের কাছে আজ এক অত্যুজ্জ্বল নাম; যার স্রষ্টা এবং রূপকারের নাম শেখ মুজিবুর রহমান। যিনি প্রায় একাই ধারণ করেছিলেন সমগ্র বাংলাদেশকে। যার আহ্বান সমগ্র বাঙালির হৃদয়ে ঝড় তুলেছিল। যিনি বলেছিলেন প্রয়োজনে আরো রক্ত দেব, তবু এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাআল্লাহ।

বঙ্গবন্ধু শব্দটি উচ্চারিত হলে মনুষ্যত্ব এবং মানবতা প্রতিষ্ঠায় বিশ্বব্যাপী নিবিড় সংগ্রামে যে মানুষটির স্মৃতি জ্বলজ্বল করে সাধারণের হৃদয়ে-মননে বারবার উদ্ভাসিত হয়, তিনি বাঙালি জাতির সর্বকালের আত্মশ্লাঘার অগ্রপথিক সুহৃদ শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু মানেই রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিপ্লব। ব্যক্তি মুজিবুরকে হয়তো বা হত্যা করা যায়। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের রূপকারকে কোনোভাবেই হত্যা করা যায় না। কেননা মুজিবুর মানেই একটা বিপ্লব। একটা মতাদর্শ। জাতি গঠনের শপথ গ্রহণ। ফলে তাঁর চিন্তন, মনন, মতাদর্শ এবং ভালোবাসাকে তো হত্যা করা সম্ভব নয়। বাঙালির মুক্তির জন্য তাঁর আত্মবলিদানের চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে অথচ তাঁর প্রত্যয়, তাঁর স্বপ্ন আজ লক্ষ লক্ষ বাঙালি যুবক-যুবতীর হৃদয়ে জ্বলজ্বল করছে। ভবিষ্যতে তিনি আরো বেশি উদ্ভাসিত আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবেন বাংলাদেশ তথা বাঙালি জাতির হৃদয়ে। যে মনীষীদের সঙ্গে তাঁকে বিশ্ববাসী একই আসনে তাদের হৃদয়াকাশে পরমশ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠা করেন অনুক্ষণ, তাঁরা হলেন কার্ল মার্কস, মহামতি লেনিন, মাও সেতুং, হো-চি-মিন, ফিদেল কাস্ত্রো, মার্টিন লুথার, লেনসন ম্যান্ডেলা, চৈতন্যদেব, রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, আইনস্টাইন প্রমুখ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আসলে একজন বড় মাপের সমাজ বিপ্লবী, সমাজসংস্কারক। তিনি জীবন দিয়ে পরাভূত করেছেন সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ এবং মৌলবাদকে। মুক্তি দিয়ে গেছেন একটি বৃহত্তর জাতিকে। প্রতিষ্ঠা করে গেছেন ধর্মনিরপেক্ষ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের। তাই বাঙালি জাতি যতদিন থাকবে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র যতদিন থাকবে তত দিন শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি কোনোদিনও ম্লান হবে না। আর মাত্র কয়েক বছর পরেই আসছে তাঁর জন্মশতবর্ষ। ২০১৯ সালের মার্চ মাস থেকেই শুরু হয়ে যাবে পৃথিবীজুড়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন। তাই নতুন প্রজন্মের পাঠকরা, যুবক-যুবতীরা, ছাত্রছাত্রীরা এবং সাধারণ মানুষ যাতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও সংগ্রামকে আরো স্বচ্ছভাবে, আরো বস্তুনিষ্ঠভাবে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারে–সে জন্যই গত বছর ঢাকার পারিজাত প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল আমার লেখা গ্রন্থ 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও সংগ্রাম'। সমগ্র বাংলাদেশ, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গবন্ধুর অনুরাগী পাঠকদের কাছে গ্রন্থটি সমাদৃত হওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রাণিত হয়েছি। প্রশ্নোত্তরভিত্তিক এই গ্রন্থটি বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং গবেষকদের কাছে। বঙ্গবন্ধুর সমগ্র জীবনই স্মরণীয় এবং ঘটনাবহুল। তবুও কিছু কিছু ঘটনা আমাদের হৃদয়ে রেখাপাত করে আছে। তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনসহ এই সমস্ত ঘটনাগুলিকে একত্রিত করার অনুভব থেকেই এই গ্রন্থ প্রণয়নের ভাবনা। গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্য এবারও এগিয়ে এসেছেন ঢাকার বাংলাবাজারের তরুণ প্রকাশক শওকত হোসেন লিটু। তাঁর পারিজাত প্রকাশনী সংস্থা ইতিমধ্যেই সমগ্র বাংলাদেশে সুনাম কুড়িয়েছে মননশীল গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য। এই গ্রন্থটি নিয়ে পারিজাত থেকে প্রকাশিত হলো আমার তিনটি গ্রন্থ। একটি বিশ্ব নাগরিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে এবং দুটি গ্রন্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরকে নিয়ে। আশা করি বঙ্গবন্ধুর উপর লেখা আমার প্রথম গ্রন্থখানির মতোই দ্বিতীয় গ্রন্থখানিও পাঠক মহলে আদৃত হবে।

এই গ্রন্থখানি পাঠ করে যদি নতুন প্রজন্মের পাঠকরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও সংগ্রামকে অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে অনুভব করতে পারে, তাহলে ভাববো আমার শ্রম সার্থক হয়েছে। মানবতার বিরুদ্ধে শক্তি আজও সক্রিয়। বঙ্গবন্ধুর মতাদর্শকেও ওরা শেষ করে দেয়ার অপচেষ্টায় জড়িত। তাই বঙ্গবন্ধুর জীবন সংগ্রাম ও মতাদর্শকে আরো বেশি বেশি করে নতুন প্রজন্মের মানুষজনের কাছে তুলে ধরার জন্যই এই গ্রন্থের অবতারণা। নতুন বাংলাদেশ গঠনের মহান যজ্ঞে এই গ্রন্থ যদি সামান্য হলেও সাহায্য করে তাহলেই তৃপ্তি অনুভব করব। এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমার লেখা অন্য গ্রন্থ থেকেই সর্বাধিক তথ্য আহরণ করেছি। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর নিজের লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' একটি নির্দেশনার মতোই কাজ করেছে। এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে দারুণভাবে উৎসাহিত করেছেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত কবি ও লেখক এবং নতুন বাংলাদেশ গঠনের অক্লান্ত যোদ্ধা, গণতন্ত্রের মানসকন্যা, জননেত্রী শেখ হাসিনার স্নেহধন্য বন্ধুবর শাফিকুল রাহী, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহায়ক এবং আওয়ামী লীগ-এর অফিস সম্পাদক ড. আবদুস শোভন গোলাব। তাঁদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশের পড়শি রাজ্য ত্রিপুরার বাসিন্দা হিসেবে আমি সবসময়ই গর্ব অনুভব করি। কারণ বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরাও সেদিন তার সামর্থ নিয়ে শামিল হতে পেরেছিল। ত্রিপুরার অসংখ্য কবি, লেখক এবং বুদ্ধিজীবীবৃন্দ যাঁরা আমাকে প্রতিনিয়তই উৎসাহিত করেন বাংলাদেশের উপর সৃজনশীল কাজ করার জন্য, তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

সবশেষে যাঁর কথা উল্লেখ করতে চাই তিনি আমার সহধর্মিণী সংগীতশিল্পী শ্রীমতী স্বর্ণিমা রায়। কেননা তাঁর অপরিসীম সহযোগিতা ও আন্তরিকতা ছাড়া আমার কোনো গ্রন্থই প্রকাশিত হতে পারে নাই। এই গ্রন্থটি প্রকাশের পেছনেও তাঁর দারুণ উৎসাহ আমাকে মুগ্ধ করেছে।

বিনম্রচিত্তে

ড. দেবব্রত দেবরায়
আগরতলা, ত্রিপুরা
উত্তর-পূর্ব ভারত

তারিখ : ঢাকা
একুশে বইমেলা ২০১৫

সূচি পত্র

উত্তরাধিকার ১৫

প্রথম প্রেরণা ২০

পবিত্র সতেরো মার্চ ২২

শৈশবেই গড়ে ওঠে রাজনৈতিক জ্ঞান ২৩

কৈশোরেই মুসলিম সেবা সমিতির সম্পাদক ২৫

চিন্তনে-মননে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ২৯

সতেরো বছর বয়সেই জেল খাটলেন সাত দিন ৩১

আঠারো বছর বয়সেই ছাত্রলীগের সম্পাদক ৩৩

চার বছর ছিলেন ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন ৩৪

তীব্র জ্বর নিয়ে বসেছিলেন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ৩৫

কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার ৩৭

৪৩-এর দুর্ভিক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মানুষের পাশে ৩৮

১৯৪৩ সালে দিল্লির মুসলিম লীগ সম্মেলনে ৪০

কুষ্টিয়ায় ছাত্রলীগের সম্মেলনে মুজিবুরের দৃপ্ত ভূমিকা ৪৩

মুসলিম লীগের ম্যানিফেস্টো এবং মুজিবুরের তৎপরতা ৪৪

মুসলিম লীগ সরকারের পতন ৪৫

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামিয়া কলেজের সাধারণ সম্পাদক ৪৬

প্রকাশ করলেন 'মিল্লাত' সাপ্তাহিক কাগজ ৪৭

ফরিদপুরে মুজিবুর ঘর ভাড়া পাননি ৪৮

দিল্লিতে মুসলিম লীগ কনভেনশনে মুজিবুর রহমান ৫০

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বন্ধ কামরার দরজায় ৫২

ঝাঁপিয়ে পড়লেন '৪৬-এর দাঙ্গার আগুন নেভাতে ৫৪

কলকাতার আগুন নিভিয়ে গেলেন পাটনার আগুন নেভাতে ৫৬

বি.এ. পাস করলেন শপথ নিয়ে ৫৮

১৯৪৭ : বাংলা ভাগকে অন্তর থেকে মানতে পারেননি ৬০

সিলেটের গণভোটে শেখ মুজিবুর রহমান ৬১

ব্যারাকপুরে গান্ধিজি মুজিবুরকে আপেল দিলেন খেতে ৬৩

গণতান্ত্রিক যুবলীগ : পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবুরের প্রথম সংগঠন ৬৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন আইন পড়ার জন্য ৬৭

গড়ে তুললেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ৬৯
১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ : ভাষা আন্দোলনে গ্রেপ্তার বরণ ৭১
১৯৪৮ সালের ১৬ মার্চ : ভাষা আন্দোলনে আহত মুজিবুর ৭৩
১৯৪৮-এর ১৯ মার্চ : জিন্নাহর বললেন উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা ৭৫
তীব্র খাদ্য সংকট : ক্ষেত মজুরদের পাশে মুজিবুর ৭৭
জিন্নাহ ফান্ড : গড়ে তুললেন গোপালগঞ্জ কলেজ ৭৯
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শিল্পী আব্বাসউদ্দিনের সঙ্গে মুজিবুর ৮১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের ধর্মঘটের পাশে ৮৩
ছাত্র ধর্মঘটের জের : গ্রেপ্তার মুজিবুর ৮৫
প্রতিষ্ঠিত হলো পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ৮৭
গোপালগঞ্জের সভা : চতুর্থবারের জন্য গ্রেপ্তার হলেন মুজিবুর ৮৯
নৌকোয় মুজিবুর : ডাকাতরা পালিয়ে গিয়েছিল ৯১
পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেবার দাবি ৯৩
পুলিশের লাঠির আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে নর্দমায় মুজিবুর ৯৫
প্রথম বারের জন্য লাহোরের মাটিতে ৯৮
লাহোরের হাইকোর্টের কাছে আক্রান্ত হলেন মুজিবুর ১০০
লাহোর থেকে ফিরেই পঞ্চমবারের জন্য গ্রপ্তার হয়ে গেলেন ১০২
জেলের মধ্যে তিনি একটি সুন্দর বাগান তৈরি করেছিলেন ১০৫
মামলায় মুজিবুরকে দেয়া হলো তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ১০৭
গোপালগঞ্জে সাব জেলে মুজিবুর : তাঁকে দেখতে লোকারণ্য ১০৯
হাসিনা আমার গলা ধরল আর ছাড়তে চায় না ১১১
খুলনা জেলে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল শেখ মুজিবুরের জীবন ১১৩
জেল থেকে মুক্ত হয়েই ষষ্ঠবারের জন্য গ্রেফতার ১১৫
১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা জেলেই শুরু হলো তাঁর আমরণ অনশন ১১৭
"আব্বা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই" ১২৩
বন্দি মুক্তি দাবি নিয়ে মে মাসেই মুজিবুর গেলেন করাচি ১২৫
করাচিতে সাংবাদিক সম্মেলনে মুজিবুরের চ্যালেঞ্জ ১২৭
লাহোরে সাংবাদিক সম্মেলনে দৃপ্ত মুজিবুর ১২৯
লাহোর থেকে ঢাকায় ফিরেই জোর দিলেন সংগঠনে ১৩১
শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে সেপ্টেম্বরে গেলেন চীন ১৩৪
চীন থেকে ফিরেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন আওয়ামী লীগ সংগঠনে ১৩৯
১৯৫৩ সালের নির্বাচনে তাঁর অবিসংবাদী নেতৃত্ব ১৪১
দশ হাজারের বেশি ভোটে জয়ী হলেন শেখ মুজিবুর রহমান ১৪৪
১৯৫৪ সালের মে মাস : প্রথমবারের জন্য মন্ত্রিত্বের শপথ ১৪৬
মন্ত্রিত্বের শপথ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো করাচির মাটিতে ১৪৮
১৯৫৪ সালের মে মাস : সপ্তমবারের জন্য গ্রেপ্তার হলেন মুজিবুর ১৫০
জেল থেকে মুক্ত হয়ে চতুর্থবারের জন্য করাচিতে মুজিবুর ১৫৩
১৯৫৫ : সংসদে বললেন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম জারি থাকবে ১৫৬
১৯৫৬ : ১৪৪ ধারা ভেঙে নেতৃত্ব দেন ভুখা মিছিলের ১৫৮
চাকরির সমতা, নিবর্তনমূলক আটক : গণপরিষদে সোচ্চার শেখ মুজিবুর রহমান ১৬০
১৯৫৭ : তীব্র প্রতিবাদে পদত্যাগ করলেন মন্ত্রিসভা থেকে, দ্বিতীয়বার চীনে ১৬৩
১৯৫৮ : অষ্টমবারের জন্য গ্রেপ্তার হলেন মুজিবুর, রাজনীতি নিষিদ্ধ ১৬৪
১৯৬০ : গড়ে উঠল "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ" ১৬৭
১৯৬২ : দশমবারের জন্য গ্রেপ্তার হলেন শেখ মুজিবুর রহমান ১৬৯
১৯৬৩ : লন্ডন সফরে মুজিবুর ১৭১
১৯৬৪ : গড়ে তুললেন 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ' একাদশতম গ্রেপ্তার বরণ ১৭৩
১৯৬৬ : এলো ৬ দফা মুক্তি সনদ তিন মাসে গ্রেপ্তার হলেন আটবার ১৭৫
শেখ মুজিবুর রহমান প্রস্তাবিত ছয় দফা দাবির মূলকথা ১৭৭
১৯৬৮ : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মুজিবুরের ২০তম গ্রেপ্তার বরণ ১৭৯
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ট্রাইব্যুনালের কাছে বিবৃতি
শেখ মুজিবুর রহমানের বিবৃতি ১৮০
১৯৬৯ : দশ লক্ষ লোকের সমাবেশে মুজিবুরকে 'বঙ্গবন্ধু' সম্মাননা ১৮৭
১৯৬৯-এর ৫ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ' ১৮৯
১৯৭০ : দেশের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুই ছিলেন প্রচারের প্রধান মুখ ১৯১
১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে দেশবাসীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর বিনম্র আবেদন ১৯৩
১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নজিরবিহীন সাফল্য ১৯৭
১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি বিশ লক্ষ মানুষের সামনে
শপথবাক্য পাঠ করান বঙ্গবন্ধু ১৯৯
১৯৭১ এর ১৫ ফেব্রুয়ারি : বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিলেন ওয়াদার সাথে
বেইমানি করতে পারি না ২০৪
১৯৭১-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমিতে বললেন সর্বত্র চালু হবে বাংলা ২০৬
১৯৭১-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা–চাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ২০৯
১৯৭১-এর ১ মার্চ : ইয়াহিয়া খানের বিবৃতি বঙ্গবন্ধুর হরতালের আহ্বান ২১২
১৯৭১-এর ৭ মার্চ : বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা–
এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ২১৫
১৯৭১-এর ৮ মার্চ : বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে শুরু হলো অসহযোগ আন্দোলন ২২০
১৯৭১-এর ১৪ মার্চ : ৩৫টি নির্দেশ জারি করে বললেন–মুক্তির সংগ্রাম চলবেই ২২২
১৯৭১-এর ২৬ মার্চ : বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন ২৩২
১৯৭১-এর ১০ এপ্রিল : বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে গঠিত হয় বিপ্লবী সরকার ২৩৫
দেশব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের শুভ সূচনা রণাঙ্গনের ১১টি সেক্টর ২৪১
১৯৭১-এর ৭ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে পাকিস্তান সরকার ২৫১
বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য বিশ্বব্যাপী বুদ্ধিজীবীদের চাপ ২৫৪

১৯৭১-এর ৪ ডিসেম্বর : ইন্দিরা গান্ধীকে পত্র দিল বাংলাদেশ সরকার ২৫৮
১৯৭১-এর ৬ ডিসেম্বর : বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর পত্র ২৬০
১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর : একটি জাতির মুক্তির দিন ২৬২
১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর : জয় হলো দেশপ্রেমের বললেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ২৬৪
১৯৭২-এর ৮ জানুয়ারি : দশ মাস পরে মুক্ত হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর ২৬৫
১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি : দিল্লি বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধু বললেন
শ্রীমতী গান্ধী একজন মানবতাবাদী নেত্রী ২৬৭
১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি : বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখলেন
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬৯
১৯৭২-এর ১২ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেন
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৭৩
স্বাধীন দেশের প্রথম ভাষা দিবসে বঙ্গবন্ধুর আহবান ২৭৭
১৯৭২-এর মে দিবসে শোষণহীন বাংলাদেশ গঠন করার আহ্বান ২৮০
১৯৭২-এর ৪ নভেম্বর : বাংলার জনগণ পেল মৌলিক অধিকার ২৮২
১৯৭২-এর ৬ ফেব্রুয়ারি : এই ঋণ শোধ করার নয় ব্রিগেড ময়দানে বঙ্গবন্ধু ২৮৪
১৯৭৪-এর ২২ ফেব্রুয়ারি : পাকিস্তানের বুকে দাঁড়িয়ে
আধিপত্যবাদের বিরোধিতা ২৮৮
১৯৭৪-এর ৯ সেপ্টেম্বর : আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ২৯১
১৯৭৪-এর ২৪ সেপ্টেম্বর : জাতিসংঘে দাঁড়িয়ে বললেন
ক্ষুধা, অশিক্ষা দূর করতে চাই ২৯৩
১৯৭৪-এর ১০ ডিসেম্বর : নৌবাহিনী দিবসে বললেন
বাঁচতে হবে আত্মমর্যাদার সঙ্গে ২৯৫
১৯৭৫-এর ২৬ মার্চ : বললেন দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবোই ২৯৭
১৯৭৫-এর ১৯ জুন : দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৯৯
১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট : সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর জীবনাবাসন ৩০১

উত্তরাধিকার

বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া আজ সমগ্র বাঙালি জাতির কাছে একটি তীর্থক্ষেত্র। বঙ্গবন্ধুর শুভ আবির্ভাব ঘটেছিল এই টুঙ্গিপাড়া গ্রামেই। খুব পেছনের দিকে না গিয়েও আমরা সাধারণভাবে এটা বলতে পারি যে, বঙ্গবন্ধুর বংশের বেশ কয়েক সিঁড়ি আগে থেকেই তাঁর পূর্বপুরুষরা এই গ্রামেই বাস করেছেন। নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ। অপরূপ তার নদীরূপ। পদ্মা, মেঘনা, বুড়িগঙ্গা শীতলক্ষ্যা, তিতাসের মতোই মধুমতী নদী একটি পবিত্র নাম। এই মধুমতী নদী-বিধৌত খুলনা এবং ফরিদপুর জেলা। মধুমতী নদী বয়ে চলেছে এই অঞ্চলের উপর দিয়ে। বর্তমানে এই মধুমতী নদীই খুলনা এবং ফরিদপুর জেলাকে ভাগ করে রেখেছে দু'দিকে।

এই টুঙ্গিপাড়াতেই একটি মধ্যবিত্ত শেখ পরিবার ছিল। পরিবারটির নামডাক ছিল প্রথম থেকেই। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত বলেই এই শেখ পরিবারের পরিচিতি। অর্থনীতির বিচারে এই মুসলমান পরিবারটিকে উচ্চবিত্ত না বললেও মধ্যবিত্ত পরিবারই বলা যেতে পারে। এই শেখ পরিবারের গোড়াপত্তন করেছিলেন কে, এ নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। কিন্তু আমরা এই প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর নিজের বক্তব্যকেই সবচাইতে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করছি। বঙ্গবন্ধু নিজেই তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বলেছেন যে, বহুকাল আগে শেখ বোরহানউদ্দীন নামে একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ এই শেখ বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এক সময় যে এই বংশের সুখ-সমৃদ্ধি ইত্যাদি ছিল তার নৃতাত্ত্বিক প্রমাণও পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিজের কথাই উদ্ধৃত করতে চাই। তিনি তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বলেছেন এইভাবে–

"আমাদের এই শেখ বংশের যে একদিন সুদিন ছিল তার প্রমাণস্বরূপ মোগল আমলের ছোট ছোট ইটের দ্বারা তৈরি চকমিলান দালানগুলি আজও আমাদের বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি করে আছে। বাড়ির চার ভিটায় চারটি দালান, বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করার একটিমাত্র দরজা, যা আমরাও ছোট সময় দেখেছি। বিরাট একটা কাঠের কপাট দিয়ে বন্ধ করা যেত। একটা দালানে আমার এক দাদা থাকতেন। এক দালানে আমার এক মামা আজও কোনোমতে দিন কাটাচ্ছেন। আর একটা দালান ভেঙে পড়েছে, সেখানে বিষাক্ত সর্পকুল বাসা

করে আশ্রয় নিয়েছে। এই সকল দালান চুনকাম করার ক্ষমতা আজ অনেকেরই নেই। এই বংশের অনেকেই প্রথম এই বাড়ির চারপাশে টিনের ঘরে বাস করেন। আমি এই টিনের ঘরের এক ঘরেই জন্মগ্রহণ করি।"

বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজের পরিবারের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মূলত জেনেছিলেন মুরব্বি বা বড়োদের কাছ থেকে। আবার চারণকবিদের কাছ থেকেও তিনি ঐতিহ্যমণ্ডিত এই শেখ পরিবারের ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে তাঁদের টুঙ্গিবাড়ির যে দালান ঘরগুলির কথা বলেছেন, এই ঘরগুলির বয়স সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন এগুলির বয়স কমপক্ষে দুই শত বছরের বেশি। ফলে আমাদের এটা আন্দাজ করতে অসুবিধে হয় না যে, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গবন্ধুর পূর্বপুরুষদের পারিবারিক মর্যাদা কী রকম ছিল। এমন প্রশ্ন হলো যে, শেখ পরিবারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শেখ বোরহানউদ্দীন সাহেব ঠিক কোন সময়ে এই মধুমতী নদীর তীরে এসে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে সম্মানিত গবেষকবৃন্দ নির্দিষ্ট একটি বছরকে চিহ্নিত করতে না পারলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই ধর্মপ্রাণ মানুষটি মধুমতী নদীর তীরে এসে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন বলে অনেকেরই ধারণা।

শেখ পরিবারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শেখ বোরহানউদ্দীনের উত্তরপুরুষ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেছেন এভাবে–

"শেখ বোরহানউদ্দীনের পরে তিন চার পুরুষের কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে শেখ বোরহানউদ্দীনের ছেলে অথবা দুই-এক পুরুষ পরে দুই ভাই-এর ইতিহাস পাওয়া যায়। এদের সম্পর্কে অনেক গল্প শোনা যায় আজও। এই দুই ভাই-এর একজনের নাম ছিল শেখ কুদরত উল্লাহ এবং অন্য ভাইয়ের নাম ছিল শেখ একরাম উল্লাহ। আমরা এখন যারা আছি তারা এই দুই ভাই-এর বংশধর। এই দুই ভাইয়ের সময়ে শেখ বংশ যথেষ্ট অর্থ ও সম্পদের অধিকারী ছিল। জমিদারির সাথে সাথে তাদের বিরাট ব্যবসাও ছিল।"

শেখ পরিবারের পারিবারিক মর্যাদা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর নিজের এই অভিমত পাঠ করে আমরা অন্তত এটা অনুভব করতে পারি যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে তাঁদের পরিবার ছিল যথেষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন। বঙ্গবন্ধু বর্ণিত এই শেখ কুদরত উল্লাহ ছিলেন তখনকার দিনে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। অন্যদিকে একরাম উল্লাহ ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব একটা যুক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন মূলত একজন নেতৃস্থানীয় মানুষ। তিনি প্রায়ই সভা-সমিতি বা বিচার সভা ইত্যাদিতে যুক্ত থাকতেন। বিচারকার্য সম্পাদন করতেন এবং ন্যায়বিচার করতেন। দু' পক্ষকেই তিনি একটা সন্তোষজনক রায় শোনাতেন। তাঁর রায় শুনে বাদী-বিবাদী উভয়েই সন্তুষ্ট হতেন।

অন্যদিকে কুদরতউল্লাহ মূলত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গেই ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সেই সময় অবিভক্ত বঙ্গ প্রদেশের বিভিন্ন জমিদারদের সঙ্গে এ-দেশে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তুলেছিল। এই সমস্ত জমিদারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কুদরতউল্লাহ। কুদরতউল্লাহ এতটাই প্রভাবশালী ছিলেন যে তিনি একবার দোর্দণ্ড প্রতাপশীল ব্যবসায়ী রাইন সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে বিজয়ী হয়েছিলেন। কুদরত উল্লাহর আভিজাত্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে একটি কাহিনি বিধৃত করেছেন। কাহিনিটি এইরকম–

"খুলনা জেলার আলাইপুরে মি. রাইন নামে একজন ইংরেজ কুঠিয়াল সাহেব নীল চাষ শুরু করে এবং একটি কুঠি তৈরি করে। আজও সেই কুঠিটা আছে। শেখদের নৌকার বহর ছিল। সেই সব নৌকা নিয়ে কলকাতা যেত। মি. রাইন নৌকা আটক করে মাঝিদের দিয়ে কাজ করাত এবং অনেক দিন পর্যন্ত আটক রাখত। শুধু শেখদের নৌকাই নয়, অন্য অনেকের নৌকাই আটক রাখত। কেউ বাধা দিলে অযথা অত্যাচার করত। রাইনের লোকদের সঙ্গে কয়েক দফা দাঙ্গা-হাঙ্গামা হলো এবং কোর্টে মামলা দায়ের হলো। মামলায় প্রমাণ হলো যে, রাইন অন্যায় করছে। কোর্ট শেখ কুদরত উল্লাহকে বলেছিলেন যত টাকা ক্ষতি হয়েছে জরিমানা করুন। রাইন দিতে বাধ্য। শেখ কুদরতউল্লাহ রাইন সাহেবকে অপমানিত করার জন্য আধা পয়সা জরিমানা করেন।"

এই মামলায় প্রচণ্ড অপমানিত রাইন সাহেব কুদরতউল্লাহকে বলেছিলেন যে, যত টাকা প্রয়োজন তিনি দিতে রাজি আছেন। কিন্তু কোনোভাবেই যেন জরিমানা না করা হয়। কেননা এই দেশের কোনো মানুষ জরিমানা করেছে এই সংবাদ যদি প্রচারিত হয় এবং ইংরেজরা জানতে পারে, তাহলে তাকে একঘরে করে রাখা হবে এবং ইংরেজ সমাজ তাকে গ্রহণ করবে না। কিন্তু কুদরতউল্লাহ সেদিন রাইন সাহেবের আবেদনে সাড়া না দিয়ে আত্মমর্যাদার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি মাত্র আধা পয়সা জরিমানা করেছিলেন। কুদরতউল্লাহ সেদিন বলেছিলেন যে "আমি টাকা গুনি না। মেপে রাখি। টাকা আমার দরকার নেই। তুমি আমার লোকের উপর অত্যাচার করেছ, আমি প্রতিশোধ নিলাম।"

এই কুদরতউল্লাহকে নিয়ে বাংলাদেশে বহু গল্প প্রচলিত আছে। বিশেষ করে খুলনা এবং ফরিদপুর জেলার মানুষের মুখে মুখে গল্প, সংগীত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তা প্রচলিত ছিল। চারণকবিরাও এই মানুষটিকে নিয়ে অনেক গান রচনা করেছেন। অসম্ভব আত্মসম্মানবোধ ছিল এই দুই ভাইয়ের। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর কাছে তাঁরা কখনোই মাথানত করেননি। মাথা উঁচু করেই

স্মরণীয় ঘটনা–২

ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা করেছেন। কুদরতউল্লাহ শেখ কদু শেখ নামেই খুলনা এবং ফরিদপুর জেলায় পরিচিত। কিন্তু কুদরতউল্লাহ এবং একরামউল্লাহের জীবনাবসানের পর শেখ পরিবারের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হ্রাস পেতে শুরু করে।

এই শেখ পরিবারের সঙ্গেই একসময় কলকাতার রানি রাসমণি পরিবারের বিরোধ বেধেছিল। মূলত রানি রাসমণি এস্টেটের সঙ্গেই এই বিরোধ হয়েছিল। এই সময় তমিজুদ্দিন নামে এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা রানি রাসমণির পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিল। এই দুই পরিবারের মধ্যে যে বিরোধ হয়েছিল তাতে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছিল টুঙ্গি পরিবারের সদস্য-সদস্যাবৃন্দ। তৎকালীন বাংলাদেশের টুঙ্গি পরিবারের পাশেই আরেকটি প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী পরিবার ছিল। এই পরিবারটি ছিল মূলত কাজী পরিবার। অর্থাৎ কাজী বংশের পরিবার। এই কাজী বংশের পরিবারের সদস্য-সদস্যার সঙ্গে শেখ পরিবারের আত্মীয়তাও ছিল। ঐ কাজী পরিবারের সবচাইতে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিটির নাম ছিল মেরাজতুল্লা কাজী।

কিন্তু মেরাজতুল্লা কাজীর প্রয়াণের পর থেকেই দুটি পরিবারের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। মেরাজতুল্লা কাজীর মৃত্যু হয়েছিল নির্মমভাবে। মেরাজতুল্লা কাজীর ছেলেরা অর্থের লোভে তাদের পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে শেখ পরিবারের গরুঘরের কাছে এনে মৃতদেহ ফেলে গিয়েছিল। ঐ ঘটনায় তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। যথারীতি ইংরেজ সরকারের পুলিশ শেখ পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্যাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। বহু দিন পর কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ঐ মামলাটি পুনরায় শুরু করেছিল সি. আই. ডি.। তদন্তের পর দেখা গেল যে, শেখ পরিবারের অভিযুক্ত সদস্যরা নির্দোষ এবং তারা যথারীতি মুক্তি পায় এবং কাজী পরিবারের ছেলেদের জেল হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বপুরুষরা মূলত দুটি ভাষায় কথা বলতে পারতেন। এই দুটি ভাষা হলো বাংলা ও ফার্সি। যদিও বঙ্গবন্ধুর ঠাকুর্দার সময় থেকেই তারা একটু একটু করে ইংরেজি ভাষা শিখতে থাকেন। ইংরেজিতে কথাবার্তাও বলতে শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর ঠাকুর্দারা ছিলেন মূলত তিন ভাই। এই তিন ভাইয়ের মধ্যে বড়ো ভাই দেশের বিচার-আচার নিয়ে থাকতেন। মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বিরোধের সমাধান করতেন। বঙ্গবন্ধুর এক কাকা ছিলেন যিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করে মারা গিয়েছিলেন। মুজিবুরের নানার নাম ছিল শেখ আবদুল মজিদ। তাঁর ছোট কাকার নাম ছিল শেখ আবদুর রশিদ এবং মুজিবুরের দাদার নাম ছিল আবদুল হামিদ। ইংরেজরা বঙ্গবন্ধুর ছোট কাকা শেখ আবদুর রশিদকে খান সাহেব উপাধি প্রদান করেছিল।

শেখ মুজিবুর রহমানের পিতার নাম ছিল শেখ লুৎফর রহমান এবং তাঁর মায়ের নাম ছিল সাহারা খাতুন। শেখ লুৎফর রহমান সম্পর্ক বঙ্গবন্ধু লিখেছেন এইভাবে–"যেদিন আমি ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়তে যাই আমার আব্বা সেদিন পেনশন নিয়ে বাড়ি চলে যান।"

বঙ্গবন্ধুর ছোট কাকা খান সাহেব শেখ আবদুর রশিদ একটি এম. ই. স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি একটি ইংরেজি স্কুল। পরবর্তীকালে স্কুলটি একটি হাইস্কুলে উন্নীত হয়। বঙ্গবন্ধুর ছোট দাদার একমাত্র ছেলে শেখ মোশাররফ হোসেন আয়ুব খানের আমলে প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য ছিলেন।

প্রথম প্রেরণা

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পিতা ছিলেন শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতা সাহারা খাতুন। সাহারা খাতুন প্রকৃত অর্থেই রত্নগর্ভা। কেননা তাঁর গর্ভেই একটু একটু করে বিকশিত হয়েছিল সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। লুৎফর রহমান শহরে কাজ করতেন। কিন্তু সাহারা খাতুন স্বামীর সঙ্গে না থেকে তিনি বেশিরভাগ সময়েই গ্রামের বাড়িতে থাকতেন। গ্রামে থাকার পক্ষে সাহারা খাতুন বলতেন, "আমার বাবা আমাকে সম্পত্তি দিয়ে গেছেন যাতে আমি তাঁর বাড়িতে বসবাস করি। শহরে চলে গেলে বাড়িতে আলো জ্বলবে না। বাবা অভিশাপ দেবেন।"

বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন একজন আধুনিক মনের মানুষ। তিনি অনেকগুলি খবরের কাগজ নিয়মিত পাঠ করতেন। কোনো গোঁড়ামি এবং সংকীর্ণতা তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। তখনকার দিনে তিনি যে সমস্ত খবরের কাগজগুলি পাঠ করতেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'আনন্দবাজার', 'বসুমতী', 'আজাদ', 'মাসিক মোহাম্মদী, 'সওগাত' ইত্যাদি। ১৯৩৬ সালে তিনি প্রমোশন পেয়ে শেরেস্তাদার পদে উন্নীত হন এবং মাদারীপুর মহকুমায় বদলি হয়ে যান।

শেখ লুৎফর রহমান এবং সাহারা খাতুনের সন্তান ছিলেন ছয় জন। এঁরা হলেন– ফাতেমা বেগম, আসিয়া বেগম, শেখ মুজিবুর রহমান, আমেনা বেগম, শেখ আবু নাসের এবং খোদেজা বেগম। অর্থাৎ চার কন্যা, দুই পুত্র। পিতা লুৎফর রহমান যেহেতু নিজে শিক্ষিত ছিলেন এবং এন্ট্রান্স পাস করেছিলেন সেহেতু তিনি তাঁর প্রত্যেকটি সন্তানকেই শিক্ষিত করে তুলতে পেরেছিলেন। গোপালগঞ্জ কোর্টে তিনি নাজির হিসেবে কাজ করেছেন বহু দিন। বঙ্গবন্ধুর জীবনে তিনজন মানুষ সবচাইতে বেশি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন। এরা হলেন পিতা মাতা এবং তাঁর সহধর্মিণী। সমগ্র বাঙালি জাতিকে মুক্ত করার জন্য তিনি যেভাবে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন সেটা সম্ভব হয়েছিল এই তিনজন মানুষের অপরিসীম স্নেহ-ভালোবাসা এবং প্রেরণার জন্য।

শেখ মুজিবুরের মা সাহারা খাতুন ছিলেন অত্যন্ত বড়ো মাপের মানুষ। বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী ফজিলাতুন্নেসা মুজিব যখন মাত্র তিন বছর বয়সে আকস্মিকভাবেই পিতা-মাতাকে হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছিলেন তখন মা

সাহারা খাতুনই পিতৃমাতৃহীন ছোট্ট রেণুকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং কোলে-পিঠে করে বড়ো করে তোলেন। এই রকমই মহীয়সী নারী ছিলেন সাহারা খাতুন। অর্থাৎ ছোট্টবেলা থেকেই রেণু শাশুড়ি সাহারা খাতুনের স্নেহ ও ভালোবাসায় বড়ো হয়েছেন। মা সাহারা খাতুন ১৯৭৪ সালের ৩০ মে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। আর পিতা শেখ লুৎফর রহমানের জীবনাবসান ঘটে ১৯৭৫ সালের ৩০ মার্চ। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর আত্মবলিদানের মাত্র সাড়ে চার মাস আগে। এই দুজন মানুষ মানবজাতিকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক মানব সন্তানকে উপহার দিয়ে গেছেন। যে সন্তান মুক্ত করেছে একটি গোটা জাতিকে। সে জন্যই সমগ্র বাঙালি জাতির কাছেই শেখ লুৎফর রহমান এবং সাহারা খাতুন এই দুটি নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কেননা তাঁদের প্রেরণাতেই ছোট্ট মুজিব বিশ্ব সমাজে পরিচিত হন বঙ্গবন্ধু হিসেবে। পিতা-মাতার কাছ থেকেই বঙ্গবন্ধু পেয়েছিলেন প্রথম প্রেরণা।

পবিত্র সতেরো মার্চ

২৫ বৈশাখ যেমন সমগ্র বাঙালির কাছে একটি পবিত্রতম দিবস, তেমনি ১৭ মার্চও বাংলাদেশ তথা সমগ্র বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর কাছে একটি মহান দিবস। ১৯২০ সাল। দেশব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আইন অমান্য অথবা অসহযোগ আন্দোলনের পরিবেশ। এই লড়াকু পরিবেশের ভেতর থেকেই ঐ বছরের ১৭ মার্চ আবির্ভূত হয়েছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পিতা শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতা সাহারা খাতুনের এই সন্তানের জন্ম হয় বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। টুঙ্গিপাড়ার বিখ্যাত শেখ বংশে তাঁর আবির্ভাব সত্যিই এক যুগান্তকারী ঘটনা। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন এ দেশে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী তাদের শোষণ-নির্যাতনের মাত্রা অনেকটাই বৃদ্ধি করে ফেলেছিল। এই নির্যাতন এবং শোষণের প্রতিবাদে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলছিল সমগ্র দেশজুড়ে। সময়ের দাবিতে এবং সমগ্র ভারতীয় জাতির প্রয়োজনে দেশজোড়া এই সংগ্রামকে তীব্রতর করা, দেশের জনগণকে একই মঞ্চে নিয়ে এসে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য যিনি সামনের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী। এই রকম একটা রাজনৈতিক পরিবেশে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। এঁরা ভাই-বোন ছিলেন মোট ছয়জন। চার বোন এবং দুই ভাই-এর মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। বঙ্গবন্ধুর জন্মের মাত্র কয়েক মাস আগে প্রথম বিশ্বযুগের সমাপ্তি ঘটে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজের লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে টুঙ্গিপাড়ায় তাঁদের মূল বাড়ির চারপাশে যে সমস্ত টিনের ঘরের কথা উল্লেখ করেছিলেন এই ঘরগুলির একটিতেই তিনি ভূমিষ্ঠ হন। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই ছিল। কারণ তখন তাঁর পিতা চাকরি করতেন। একটা সাধারণ সচ্ছল মুসলমান পরিবারের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশেই ছোট্ট মুজিব মা-বাবার কোলে-পিঠে চড়ে বিকশিত হন। যেহেতু তাঁদের পরিবারটি ছিল একটি একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবার, সেহেতু আর পাঁচটা পরিবারের মতোই মুজিবুর বেড়ে উঠতে থাকেন। তবে ছোট্ট শিশু মুজিবুরের জেদ এবং আচার-আচরণের মধ্যে ছিল ব্যতিক্রমী ভাব। এই ছোট্ট শিশুটিই যে সমগ্র বাঙালি জাতির মুক্তিদাতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং সহস্র বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন তা টুঙ্গিপাড়ার মানুষ হয়তো সেদিন অনুভব করতে পারেন নাই।

শৈশবেই গড়ে ওঠে রাজনৈতিক জ্ঞান

গ্রামের নাম টুঙ্গিপাড়া। বর্তমান বাংলাদেশের হাজার হাজার গ্রামের মতোই একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। চারদিকে গাছপালা, নদীনালা, ক্ষেত-বাগিচা ইত্যাদি। বর্তমানে গ্রামটি একটি সমৃদ্ধ গ্রাম হলেও আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে এই গ্রামের অবস্থা তত উন্নত ছিল না। ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার এই গ্রামটিতেই ছোটবেলা ঘুরে বেড়াতেন ছোট্ট মুজিব। বাবা-মা এবং অন্যান্যরা তাঁকে ডাকতেন খোকা নামে। অত্যন্ত আনন্দমুখর পরিবেশে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছেন মুজিবুর। কিন্তু ছোটবেলায় তাঁর স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো ছিল না। যদিও মায়ের অতি যত্নে তিনি ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছেন।

তিনি যে খুব বড়ো হৃদয়ের মানুষ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করবেন তা কিন্তু বোঝা গিয়েছিল একেবারে শৈশবকাল থেকেই। শৈশবে যদি কোনো ভিখারি তাঁদের বাড়িতে আসত তাহলে যেন ছোট্ট খোকার আনন্দের আর শেষ ছিল না। হাতের কাছে যা-ই পেত, তা-ই দিয়ে দিত এবং এতেই যেন এক পরম তৃপ্তি লাভ করত। মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালোবাসা। আর ভবিষ্যতেও মানুষই ছিল তাঁর সব। পরিণত জীবনে আমরা দেখেছি যে, যেখানেই সমস্যা, যেখানেই মানুষ, সেখানেই মুজিবুর।

শৈশবে মুজিবুর ছিলেন অত্যন্ত দুরন্ত এবং মেধাবী। যখন যে বিষয়ে পড়াশুনা করতেন গভীর একাগ্রতা নিয়ে করতেন। গবেষকরা বলেছেন যে পিতা-মাতার প্রভাবই সবচাইতে বেশি ছিল তার ব্যক্তিত্ব গঠনে। ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি নেতৃত্বের বিকাশও পরিলক্ষিত হয়েছিল ছোটবেলা থেকেই। তিনি তখন স্কুলের ছাত্র। যেকোনো সমস্যায় এগিয়ে আসতেন সকলের আগে। সমস্যার গভীরে যেতেন এবং সমস্যার সমাধানে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিতেন। নেতৃত্বের এক অসাধারণ দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়েছিল শৈশব থেকে। নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বা সমস্যার সমাধানে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে অযথা বিলম্ব করতেন না। নেতৃত্ব দেওয়ার এই চারিত্রিক গুণটি পরিলক্ষিত হয় একেবারে শৈশবকাল থেকে। পিতামাতার মধ্যে মায়ের প্রভাবই পড়েছিল বেশি মুজিবের উপর। যেহেতু বাবা শহরে থাকতেন বেশিরভাগ সময় সেহেতু মায়ের চারিত্রিক দৃঢ়তাই তার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব গঠনে সবচাইতে বেশি কার্যকর হয়েছিল।

বাড়িতে ভোরবেলা উঠেই তাঁদেরকে প্রথমে পাঠ করতে হত কোরআন শরিফ। প্রতিদিনই ভোরবেলা আসতেন মৌলভী সাহেব। তাঁর কাছেই শুদ্ধ উচ্চারণ ও শুদ্ধ সুরে কোরআন পাঠ করা ছিল তাঁদের পারিবারিক রীতি। কোরআন শরিফ পাঠ শেষেই বাড়িতে আসতেন গৃহশিক্ষক হামিদ মাস্টার। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল কাজী আবদুল হামিদ। এই হামিদ মাস্টারের কাছেই পাঠ নিতেন বাংলা, অংক, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে। এই হামিদ মাস্টার, নিছক একজন গৃহশিক্ষকই ছিলেন না, তিনি আসলে ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ে ছোট্ট মুজিব প্রথম জ্ঞান লাভ করেন হামিদ মাস্টারের কাছে। উচ্চশিক্ষিত এই হামিদ মাস্টারকেই আমরা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম গুরু বলে উল্লেখ করতে পারি। শৈশবেই রাজনৈতিক শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু হামিদ মাস্টারের কাছ থেকে। ফলে শৈশবেই তাঁর মধ্যে গড়ে ওঠে রাজনৈতিক জ্ঞান।

কৈশোরেই মুসলিম সেবা সমিতির সম্পাদক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখাপড়ার শুভারম্ভ বা সূচনা হয়েছিল টুঙ্গিপাড়া গ্রামের পাঠশালাতেই। বিদ্যালয়টির নাম ছিল এম. ই. স্কুল। এই স্কুলটি একটি পুরনো স্কুল। স্কুলটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন খান সাহেব শেখ আবদুর রশিদ। যিনি ছিলেন মুজিবুরের ছোট দাদা। বর্তমানে স্কুলটি একটি মাধ্যমিক স্কুল হিসেবে উন্নীত হয়েছে। মুজিবুর এই স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত। চতুর্থ শ্রেণিতে প্রমোশান পেয়েই তাঁকে এই স্কুল ছাড়তে হয়। এই সময় তিনি ভর্তি হয়েছিলেন গোপালগঞ্জে পাবলিক স্কুলে। মুজিবুর রহমানের পিতা শেখ লুৎফরই তাঁকে এই স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন। কেননা তিনি সেই সময় গোপালগঞ্জেই সরকারি চাকরি করতেন। গোপালগঞ্জে পিতার কাছেই তিনি থাকতেন। লেখাপড়ার ব্যাপারে তাঁর আব্বাই অর্থাৎ শেখ লুৎফর রহমানের সাহায্যই তিনি পেয়েছেন সবচাইতে বেশি। পিতাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোনোই ছিল মুজিবুরের দীর্ঘদিনের অভ্যাস।

১৯৩৪ সাল। বঙ্গবন্ধুর বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ বছর। সে বছর তিনি পড়তেন সপ্তম শ্রেণিতে। ঐ বছরই তিনি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তাঁকে শহরের বড় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হয়েছিল। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে মুজিবুর নিজেই লিখেছেন যে, ছোটবেলায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুরন্ত প্রকৃতির। ছোটবেলায় তিনি একদিকে যেমন খেলাধুলা করতেন তেমনি অন্যদিকে ব্রতচারীতেও প্রশংসা অর্জন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, "ছোট সময়ে আমি খুবই দুষ্টু প্রকৃতির ছিলাম। খেলাধুলা করতাম। গান গাইতাম এবং খুব ভালো ব্রতচারী করতে পারতাম। হঠাৎ বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে আমার হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। আব্বা আমাকে নিয়ে কলকাতায় চিকিৎসা করতে যান। কলকাতার বড় বড় ডাক্তার শিবপদ ভট্টচার্য্য, এ. কে. রায় চৌধুরী আরও অনেককেই দেখাল এবং চিকিৎসা করতে থাকেন। প্রায় দু'বছর আমার এভাবেই চলল।"

১৯৩৬ সাল। তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এবার আক্রান্ত হলো তাঁর দুটি চোখ। চোখ নিয়ে তিনি কষ্টও পেলেন অনেক দিন। আসলে তাঁর চোখে গ্লুকোমা নামে একটি রোগ ধরা পড়েছিল। কোনো রকম ঝুঁকি না নিয়ে

শেখ লুৎফর রহমান ছেলেকে নিয়ে কলকাতা চলে যান এবং উন্নত চিকিৎসা করান। এই সময়ে তাঁর পড়াশুনারও বিঘ্ন ঘটেছিল। কারণ ১৯৩৬ সালেই শেখ লুৎফর রহমান মাদারীপুর মহকুমায় বদলি হয়ে গিয়েছিলেন শেরেস্তাদার হয়ে। ফলে ঐ সময় মুজিবুরকে পুনরায় অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হতে হয়েছিল। কলকাতাতে যে চিকিৎসক মুজিবুরের চোখের চিকিৎসা করেছিলেন তাঁর নাম ছিল ডা. টি. আহমেদ সাহেব। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দশ দিনের ব্যবধানে মুজিবুরের চোখের অস্ত্রোপচার হয়েছিল। ফলে ১৯৩৬ সাল থেকেই অর্থাৎ ষোল বছর বয়স থেকেই মুজিবুরকে চশমা পরতে হয়েছিল। চোখের অপারেশনের সময় মুজিবুর কলকাতাতে ছিলেন তাঁর মেজবোন আসিয়া খাতুনের বাড়িতে।

চোখের অপারেশনের পর মুজিবুর চলে এসেছিলেন মাদারীপুরে। এই প্রসঙ্গে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বলেছেন–"চোখের চিকিৎসার পর মাদারীপুরে ফিরে এলাম; কোনো কাজ নেই। লেখাপড়া নেই, খেলাধুলা নেই, শুধু একটা মাত্র কাজ বিকেলে সভায় যাওয়া। তখন স্বদেশী আন্দোলনের যুগ।"

এই অবস্থায় মুজিবুরের লেখাপড়ায় দারুণ ব্যাঘাত দৃষ্টি হলো। বছর দুয়েক নানা রকম অসুস্থতা ইত্যাদির জন্যই এই ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। মুজিবুরের বন্ধুরা যথারীতি উপরের শ্রেণিতে উঠে যায়। ১৯৩৭ সাল। পিতা শেখ লুৎফর রহমান পুনরায় তাঁকে ভর্তি করান গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে। শেখ লুৎফর রহমান গোপালগঞ্জে একটি নতুন বাড়ি তৈরি করেছিলেন। সেই বাড়িতে থাকতেন তাঁর গৃহশিক্ষক কাজী আবদুল হামিদ। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল এম. এস. সি.। এর আগেও তিনি গৃহশিক্ষক হিসেবে মুজিবুরকে পড়িয়েছেন। এবার আবার নতুন করে তিনি মুজিবুরকে পড়াতে লাগলেন। হামিদ মাস্টার যে উচ্চ শিক্ষিত গৃহশিক্ষকই ছিলেন তাই নয়, তাঁর অন্য পরিচয়ও ছিল। তিনি গোপালগঞ্জে একটি সমিতি গঠন করেছিলেন। মূলত অসহায় গরিব মুসলমান ছেলেমেয়েদের সাহায্য করার জন্যই তিনি এই সমিতি গঠন করেছিলেন। এই সমিতির নাম ছিল মুসলিম সেবা সমিতি। এর পাশাপাশি তিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর মাধ্যমেই প্রথম রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জন করেন। মুসলিম সেবা সমিতি প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, "মাস্টার সাহেব গোপালগঞ্জে একটা মুসলিম সেবা সমিতি গঠন করেন, যার দ্বারা গরিব ছেলেদের সাহায্য করতেন। মুষ্টি ভিক্ষার চাল ওঠাতেন সকল মুসলমান বাড়ি থেকে। প্রত্যেক রবিবার আমরা থলি নিয়ে বাড়ি বাড়ি থেকে চাউল উঠিয়ে আনতাম এবং এই চাল বিক্রি করে তিনি গরিব ছেলেদের বই এবং পরীক্ষার ও অন্যান্য খরচ দিতেন।"

কিন্তু হঠাৎ করেই হামিদ মাস্টার যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। মাস্টার মশাই-এর এই আকস্মিক প্রয়াণে সতেরো বছরের কিশোর মুজিবুর রহমানের উপরেই এই সমিতির সম্পাদকের দায়িত্ব এসে পড়ে। তখন অন্য আরেকজন মুসলমান শিক্ষক এই সমিতির সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জীবনে প্রথম একটি গুরুত্বপূর্ণ সমিতির সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেই মুজিবুর আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ শুরু করেন। একদিকে খেলাধুলা, বিশেষ করে ফুটবল, ভলিভল ও হকি আর অন্যদিকে সমাজসেবামূলক কাজ। এছাড়া তখন থেকেই বঙ্গবন্ধু নিয়মিত অনেকগুলি কাগজ পাঠ করতেন। সেই সময় গোপালগঞ্জের এম.এল.এ. ছিলেন খন্দকার শামসুদ্দীন আহমেদ সাহেব। তাঁর বড় ছেলে খন্দকার মাহবুবউদ্দীন ওরফে ফিরোজ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর প্রিয় বন্ধু। ফলে কৈশোরকাল থেকেই মুজিবুর রাজনৈতিক ঘটনাবলির প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখতেন।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, শেখ মুজিবুর রহমানরা ছিলেন ছয় ভাই-বোন। চার বোন, দুই ভাই। বঙ্গবন্ধুর বড় বোনের নাম ছিল শেখ ফাতেমা খাতুন। মেজ বোনের নাম ছিল আছিয়া খাতুন। শেখ আছিয়া খাতুন মুজিবের চেয়ে দু' বছরের বড়ো ছিলেন। অন্যদিকে বড় বোন শেখ ফাতেমা খাতুনের বিবাহ হয়েছিল ষোল বছর বয়সে। টুঙ্গিপাড়া থেকে বগুরা নৌকোয় চড়ে একদিনের পথ পাড়ি দিয়ে ভাঙ্গা থানার দত্তপাড়ায় ছিল তাঁর শ্বশুরবাড়ি। এছাড়া মেজ বোন আছিয়া খাতুনের বিবাহ হয়েছিল গোপালগঞ্জের বাসিন্দা নুরুল হকের সঙ্গে। বঙ্গবন্ধুর অন্য আরেক ছোট বোনের নাম ছিল খোদেজা হোসেন। শেখ নুরুল হক প্রথমে কলকাতা শহরে থেকে ব্রিটিশ আমলে সরকারি চাকরি করতেন। পরবর্তীকালে তিনি দেশভাগের পর ঢাকায় চলে আসেন।

বঙ্গবন্ধু যখন কলকাতাতে থেকে পড়াশুনা করতেন তখন তিনি থাকতেন বেকার হোস্টেলে। এই সময়ে তিনি প্রায়ই এসে থাকতেন বোন আছিয়া খাতুনের কলকাতার বাড়িতে। ভগ্নিপতি নুরুল হক এবং বোন আছিয়া খাতুন ছিলেন তার কলকাতার অভিভাবক। ঠিক এই সময়ই ঘটেছিল সেই দুঃখজনক ঘটনাটি। বড় বোন ফাতেমা খাতুন মাত্র কুড়ি বছর বয়সে দুটি শিশুসন্তানসহ আকস্মিকভাবে বিধবা হয়ে যান। ভগ্নিপতীর এই আকস্মিক প্রয়াণে তিনি জীবনে প্রথম সবচাইতে বেশি কষ্ট পেয়েছিলেন। মুজিবুবের ভাইবোনদের মধ্যে মেজ বোন আছিয়া খাতুনকে কেন্দ্র করেই তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় বন্ধনে অটুট ছিল। আছিয়া খাতুনের বড় ছেলের নাম ছিল শেখ ফজলুল হক মণি। ছাত্র আন্দোলন করে শেখ ফজলুল হক মণি সারা বাংলাদেশে বিখ্যাত

হয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মামা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গেই শহীদের মৃত্যুবরণ করেন শেখ ফজলুল হক মণি এবং তাঁর স্ত্রী আরজু মণি। সেই ভয়ংকর রাতে একই সঙ্গে ষোলজন নিহত হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা সেই সময়ে দেশের বাইরে ছিলেন বলে প্রাণে বেঁচে যান। ১৫ আগস্ট সেই কারণেই বাংলাদেশের প্রতিটি গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিকের কাছে একটি তীব্রতম শোকের দিন।

চিন্তনে মননে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু

শৈশবেই তিনি প্রথম শুনেছিলেন মহান দেশপ্রেমিক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কথা। তাঁর গৃহশিক্ষক হামিদ মাস্টারই প্রথম গল্পচ্ছলে নেতাজির কথা বলেন। তখন থেকেই শিশু মুজিবুরের চিন্তন-মননে নেতাজি এক স্থায়ী আসন দখল করে নেন। নেতাজিকে যেন বুকের ভেতর আঁকড়ে ধরে শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তীর্ণ হন। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৬ সাল থেকেই শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। নেতাজির রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে মুজিবুর এত ভাবতেন না, যতটা ভাবতেন তাঁর কঠোর ব্যক্তিত্ব দৃপ্ত পথচলা এবং দেশপ্রেমের তীব্রতা। মুজিবুরের পড়ার টেবিলেও নেতাজির ছবিই জ্বলজ্বল করত। এই ছবিই যেন প্রতি মুহূর্তে মুজিবুরের হৃদয় এবং মননকে গড়ে তুলতে সাহায্য করল।

১৯৩৬ সালে যখন চোখের চিকিৎসা শেষ করে কিশোর শেখ মুজিব মাদারীপুর মহকুমায় পিতার কাছে চলে আসেন, সেই সময়টা ছিল স্বদেশি আন্দোলনের যুগ। এই সময়কালকেই আমরা মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাতের সময়কাল বলতে পারি। কেননা মাদারীপুর এবং গোপালগঞ্জে সেই সময় কংগ্রেসের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ইত্যাদি অঞ্চলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রভাবই ছিল সবচাইতে বেশি। ফলে পনেরো ষোল বছরের ছেলেমেয়েরাই তখন প্রায় সব অঞ্চলেই স্বদেশি বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়ত। বঙ্গবন্ধুও এই সময় থেকেই স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। প্রতিটি সভাতেই তিনি অংশগ্রহণ করতেন এবং নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শুনতেন। কিন্তু মনে মনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন ও আদর্শকে অনুসরণ করে চলতে লাগলেন।

মুজিবুর রহমানের সক্রিয়তা, কার্যকলাপ, আচার-আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে অনেকের মনে যেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হলো তেমনি সরকারি আধিকারিকদের মনে সংশয়ও তৈরি হলো। বিশেষ করে গোপালগঞ্জের এস. ডি. ও. মুজিবুরের দাদা খান সাহেবকে মুজিবুরের কার্যকলাপ সম্পর্কে সতর্ক করেন। যেহেতু মুজিবুরের লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটেছে প্রায় দু'বছর তাই বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে তিনি অন্যান্য সহপাঠীদের চেয়ে বয়সের দিক থেকে কিছুটা বড়োই ছিলেন। পড়াশুনায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত মনোযোগী। কিন্তু

দেশের অবস্থা, স্বাধীনতা সংগ্রাম, ইংরেজদের কার্যকলাপ ইত্যাদি ব্যাপারে সুবোধ বালকের মতো নিশ্চুপ থাকতেন না। সবসময়ই সমসাময়িক ঘটনাবলি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন, আলোচনা করতেন সহপাঠীদের সঙ্গে। অর্থাৎ খুব সহজেই তিনি ছাত্রনেতা বা দলনেতা নির্বাচিত হতেন এবং নেতৃত্ব দিতেন। এইভাবেই তিনি টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ এবং মাদারীপুরে সকলের কাছে পরিচিত এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। নিয়মিত তিনি যেহেতু অনেকগুলি খবরের কাগজ পাঠ করতেন সেহেতু তাঁর জ্ঞানও ছিল অনেক বেশি অন্যান্যদের চেয়ে। পাশাপাশি তাঁকে যদি কেউ কোনোদিন কটু কথা বলত তাহলে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন এবং মারপিট ইত্যাদি করতে পারতেন।

এই পর্যায়ে মুজিবুর আবদুল হাকিম মিয়া নামে এক ভদ্রলোককে খুবই ভয় পেতেন। আসলে তিনি ছিলেন মুজিবুরের পিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু। মুজিবুরের আচার-আচরণের মধ্যে তিনি যদি সামান্য অসঙ্গতি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ করতেন তাহলে তিনি তাঁর বন্ধু অর্থাৎ মুজিবুরের পিতাকে জানাতে ভুল করতেন না। সেই সময়ে গোপালগঞ্জের এম. এল. এ. ছিলেন নামকরা আইনজীবী খন্দকার শামসুদ্দীন আহমেদ সাহেব। উনার বড় ছেলে খন্দকার মাহবুবউদ্দীন ওরফে ফিরোজ ছিলেন মুজিবুরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। শামসুদ্দীন সাহেব শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের কৃষক পার্টির সদস্য ছিলেন। তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত অমায়িক ছিল বলে জনগণ তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসত। এ. কে. ফজলুল হক সাহেব পরবর্তীকালে বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগে যোগদান করেন। এ দলটি ১৯০৬ সালে ঢাকায় প্রধানত অবাঙালি মুসলিম অভিজাত নবাব নাইট ও জমিদারদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল। এই দলই ১৯৪৭ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে। আসলে মুসলিম লীগ তখন কাগজপত্রে একটি সংগঠন ছিল। এই সময়টা মুজিবুরের জন্য ছিল একটি সন্ধিক্ষণ। বঙ্গবন্ধুর সামনে মুসলিম লীগ ছাড়া আর কোনো সংগঠন বা রাজনৈতিক দল ছিল না। তাই বঙ্গবন্ধুর উপর এই অঞ্চলের ছাত্র আন্দোলনের দায়িত্ব পড়ে। কিছুদিন পরেই মুজিবুর রহমান ছাত্রলীগের সম্পাদক পদে বৃত হয়েছিলেন।

সতেরো বছর বয়সেই জেল খাটলেন সাত দিন

১৯৩৮ সাল। মুজিবুর তখন স্কুলের ছাত্র। সেই সময় দুজন জননেতা এসেছিলেন গোপালগঞ্জে। এদের একজন হলেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক এবং শ্রমমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী। গোপালগঞ্জে এই দুই জননেতার আগমন উপলক্ষে মুজিবুরের কাছে হিন্দু-মুসলমান বলে কিছু ছিল না। তিনি অত্যন্ত উদার মনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়তে গিয়ে বেশ সমস্যায় পড়ে গেলেন। তিনি দেখলেন যে, হিন্দু ছাত্ররা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী থেকে সরে পড়েছে। কারণ জানতে চাইলে হিন্দু ছাত্ররা তাঁকে বলেছিল যে, কংগ্রেস থেকেই নিষেধ করা হয়েছে। এই ঘটনায় তিনি মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আসলে এ. কে. ফজলুল হক মুসলিম লীগের সাথে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন বলে হিন্দুরা সেদিন খেপে গিয়েছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত কিছুসংখ্যক নমশূদ্র শ্রেণির হিন্দু যোগদান করেছিল কারণ মুকুন্দ বিহারী মল্লিক তখন মন্ত্রী ছিলেন এবং তিনিও হক সাহেবের সঙ্গে আসবেন বলে প্রচারিত হয়েছিল।

যথারীতি সোহরাওয়ার্দী সাহেব গোপালগঞ্জে এলেন এবং তিনি মিশন স্কুল পরিদর্শনও করেন। সেই সময় শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ছাত্ররা স্কুলেই সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে। এই অনুষ্ঠানেই সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে মুজিবুরের পরিচয় হয়। সংবর্ধনা গ্রহণ করে তিনি বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন মুজিবুরের সঙ্গে। নোটবই বের করে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই মুজিবুরের নাম-ঠিকানা ইত্যাদি নিয়ে রাখেন। মুজিবুরের সঙ্গে সোহরাওয়ার্দীর এই পরিচয় ছিল ঐতিহাসিক। কেননা মুজিবুর সারা জীবন সোহরাওয়ার্দী সাহেবকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেবও মুজিবুরকে নিজের সন্তানের মতোই স্নেহ করতেন।

সোহরাওয়ার্দী সাহেব মুজিবুরের নাম-ঠিকানা লিখে রেখেই দায়িত্ব শেষ করলেন না। তিনি কলকাতা ফিরে গিয়ে মুজিবুরকে একটি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যাতে মুজিবুর কলকাতা গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। এই সময়ই মুজিবুর জীবনে প্রথম গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাস। আবদুল মালেক নামে মুজিবুরের এক সহপাঠী ছিলেন। তিনি খন্দকার শামসুদ্দীন সাহেবের আত্মীয়। তাঁকে হিন্দু মহাসভার সভাপতি সুরেন

ব্যানার্জীর বাড়িতে ধরে নিয়ে কিছু মারধর করা হয়। মুজিব এই কথা শুনে দলবল নিয়ে গিয়ে মালেককে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। এই ঘটনায় পুলিশে মামলা হয় এবং মুজিবুরকে প্রথম গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার করার জন্য মুজিবুরের বিরুদ্ধে অদ্ভুত সব অভিযোগ আনা হয়েছিল। তিনি নাকি খুন করার চেষ্টা করেছিলেন এবং লুটপাট ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগিয়েছিলেন শহরে ও গ্রামে। এজাহারে আরো যাদের নাম দেয়া হয়েছিল তারা হলেন মুজিবুরের মামা মোক্তার সাহেব, খন্দকার শামসুদ্দীন আহমেদ, এম. এল. এ. সাহেবের মুহুরি জহুর শেখ, মুজিবুরের সহাপাঠী আবদুল মালেকসহ আরো অনেক। পুরোপুরি মিথ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা এই মামলার জন্য মুজিবুরকে সাত দিন জেলে রাখা হয়েছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত মামলাটি প্রত্যাহৃত হয়েছিল। উভয় পক্ষের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এবং দেড় হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে মামলাটির নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। মাত্র সতেরো বছর বয়স ছিল তখন মুজিবুরের। সেই থেকে শুরু হয়েছিল তাঁর জেল জীবন। পরবর্তীকালে মুজিবুরকে আরো বহুবার জেলে যেতে হয়েছিল। সহ্য করতে হয়েছিল অমানবিক কষ্ট, নির্যাতন।

আঠারো বছর বয়সেই ছাত্রলীগের সম্পাদক

১৯৩৯ সাল। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কথামতো মুজিবুর কলকাতা বেড়াতে যান এবং সেখানে ছাত্রনেতা আবদুল ওয়াসেকের সঙ্গে যেমন দেখা করেন তেমনি দেখা করেন সোহারাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে মুজিবুর রহমান দ্রুত গোপালগঞ্জে চলে আসেন এবং গোপালগঞ্জে গড়ে তুললেন ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন খন্দকার শামসুদ্দীন সাহেব। সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ছাত্রলীগ গঠিত হবার পরেই গোপালগঞ্জে ১৯৩৯ সালে গঠিত হয়েছিল মুসলিম লীগ। মূলত এম. এস. এ. খন্দকার শামসুদ্দীন সাহেবকে কেন্দ্র করেই গোপালগঞ্জে এই মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল। মুসলিম লীগের গোপালগঞ্জ ইনউনিটের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন একজন মোক্তার সাহেব। প্রায় একই সঙ্গে গোপালগঞ্জে ছাত্রলীগ এবং মুসলিম লীগ গঠিত হয়। বলা চলে এই দুটি সংগঠনেরই সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন মুজিবুর রহমান। এভাবেই শেখ মুজিবুর ধীরে ধীরে রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে পড়লেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে তিনি বলেছেন–

"আমি আস্তে আস্তে রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করলাম। আব্বা আমাকে বাধা দিতেন না, শুধু বলতেন লেখাপড়ার দিকে নজর দেবে।"

সেই সময় গোপালগঞ্জে আরেকটি সংগঠন গড়ে উঠেছিল। সংগঠনটির নাম ছিল মুসলিম লীগ ডিফেন্স কমিটি। এই সংগঠনটির সম্পাদকও হয়েছিলেন মুজিবুর রহমান। খেলাধুলার প্রতি ছিল মুজিবুরের দারুণ আগ্রহ। সেই সময় গোপালগঞ্জের মিশন স্কুলের ফুটবল টিমের ক্যাপটেন ছিলেন মুজিবুর। এদিকে মুজিবুরের পিতা শেখ লুৎফর রহমানও ছিলেন অফিসার্স ক্লাবের সম্পাদক। যখন শেখ মুজিবুর রহমানের টিম এবং তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমানের টিমের মধ্যে ফুটবল খেলা হতো তখন সবচাইতে বেশি আনন্দ উপভোগ করতেন জনগণ। একদিকে খেলাধুলা এবং অন্যদিকে সমাজসেবা এবং রাজনৈতিক কার্যাবলির মধ্য দিয়ে মুজিবুর ক্রমশ ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এই সময় থেকেই গড়ে ওঠে তার প্রখর ব্যক্তিত্ব।

চার বছর ছিলেন ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন

ছাত্রলীগ, মুসলিম লীগ এবং মুসলিম লীগ ডিফেন্স কমিটি এই তিনটি সংগঠনেরই দায়িত্ব ধীরে ধীরে এসে পড়ল মুজিবুরের উপর। এর সঙ্গে রয়েছে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা। এত ব্যবস্থার মধ্যেও ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪২ সাল, এই চার বছর তিনি ছিলেন গোপালগঞ্জের ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন। প্রায় সব ধরনের খেলাতেই ছিল তাঁর দক্ষতা। তবে ফুটবল খেলার প্রতি তাঁর টান ছিল সবচাইতে বেশি। তিনি ছিলেন গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলের ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন। আর সবচাইতে মজার বিষয় হলো, এই টিমের সঙ্গে সবচাইতে বেশি খেলা হয়েছিল অফিসার্স ক্লাবের টিমের সঙ্গে। এই অফিসার্স ক্লাবের সম্পাদক ছিলেন মুজিবুরের পিতা শেখ লুৎফর রহমান। এই নিয়ে তখন সারা গোপালগঞ্জে আলোচনা। সেই সময় গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু রসরঞ্জন সেনগুপ্ত। তিনি তাঁর স্কুলের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার জন্য মুজিবুরকে দারুণভাবে উৎসাহিত করেছিলেন, যাতে অফিসার্স ক্লাবের টিমকে হারিয়ে দেয়া যায়।

ঐ কয়েক বছর যে ফুটবল শিল্ড নিয়ে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল তার নাম ছিল এ. জেড. খান শিল্ড। এ. জেড. খান ছিলেন গোপালগঞ্জের এস. ডি. ও। তিনি গোপালগঞ্জেই প্রয়াত হয়েছিলেন। তাঁর নামেই এই শিল্ড-এর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিবছরই এই খেলায় মিশন স্কুল ফাইনালে জয়ী হয়। ১৯৩৯ সালের বেশ কয়েকটি খেলায় মিশন স্কুল জয়ী হলেও দুর্ভাগ্যবশত ফাইনাল খেলায় মুজিবুরের টিম হেরে গিয়েছিল। আসলে ঐ সময় ছাত্রদের ছিল পরীক্ষা। এ ছাড়াও সারা বছর খেলে খেলে তাঁরা ছিল ক্লান্ত। ঠিক পরীক্ষার সময়টাতে ছাত্রদের টিমটি খেলতে চাইছিল না। ফলে মানসিকভাবে তারা প্রস্তুত ছিল না বলেই তারা হেরে গিয়েছিল। সে বছর ছাত্ররা মাত্র এক গোলে বড়োদের কাছে হেরে গিয়েছিল। সে বছর অফিসার্স ক্লাব বাইরে থেকে প্লেয়ার হায়ার করে নিয়ে এসেছিল বলে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বলা হয়েছে। মুজিবুর প্রধান শিক্ষককে বলেছিলেন, "স্যার, আমাদের সকলেই ক্লান্ত, এগারোজনই সারা বছর খেলেছি, সকলের পায়ে ব্যথা, দুই-চার দিন বিশ্রাম দরকার..."

তীব্র জ্বর নিয়ে বসেছিলেন ম্যাট্রিক পরীক্ষায়

১৯৪১ সাল। মুজিবুরের বয়স কুড়ি বছর। সে বছরই তিনি বসেছিলেন ম্যাট্রিক পরীক্ষায়। এই প্রসঙ্গে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে তিনি লিখেছেন এইভাবে : "১৯৪১ সালে আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেব। পরীক্ষায় পাশ আমি নিশ্চয়ই করবো সন্দেহ ছিল না। রসরঞ্জন বাবু ইংরেজির শিক্ষক, আমাকে ইংরেজি পড়াতেন। আর মনোরঞ্জন বাবু অঙ্কের শিক্ষক, আমাকে অংক করাতেন। অঙ্ককে আমার ভয় ছিল। কারণ ভুল করে ফেলতাম। অঙ্কের জন্যই বোধহয় প্রথম বিভাগ পাব না। পরীক্ষার একদিন পূর্বে আমার ভীষণ জ্বর হলো এবং মামস হয়ে গলা ফুলে গেল। একশ চার ডিগ্রি জ্বর হয়েছে। আব্বা রাতভর আমার কাছে বসে রইলেন।"

এত তীব্র জ্বর দেখে মুজিবুরের পিতা শেখ লুৎফর সে বছর পরীক্ষায় না বসতে বলেছিলেন। কিন্তু মুজিবুর কিছুতেই একটা বছর নষ্ট করতে চাইলেন না। তিনি পরীক্ষা দেবেনই। যাইহোক ওষুধপত্র খেয়ে তিনি পরীক্ষার হলে গেলেন। প্রথম দিন ছিল বাংলা পরীক্ষা। ধীরে ধীরে জ্বরটা বসে যাওয়াতে শেষ পর্যন্ত মুজিবুর সবগুলি পরীক্ষাই দিতে পেরেছিলেন। পরীক্ষার রেজাল্ট খুব খারাপ হয়নি। তিনি দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেন। তাঁর এই রেজাল্টে বাড়ির সবাই, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এবং প্রধান শিক্ষকসহ স্কুলের সবাই খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন।

ঐ বছরই মুজিবুর ভর্তি হয়েছিলেন কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে। ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হবার পর তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল কলকাতার বেকার হোস্টেলে। সেই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পুরোপুরি শুরু হয়ে গেছে। সারা বিশ্বব্যাপী সংকট। এই সময়ে মুজিবুর কখনো কলকাতা, কখনো মাদারীপুর, আবার কখনো গোপালগঞ্জে ছাত্রলীগ এবং মুসলিম লীগের হয়ে কাজ করতে শুরু করেন। তার নিজের ভাষায়–

"তখন রাজনীতি শুরু করেছি ভীষণভাবে। সভা করি, বক্তৃতা করি। খেলার দিকে আর নজর নাই। শুধু মুসলিম লীগ আর ছাত্রলীগ। পাকিস্তান আনতেই হবে। নতুবা মুসলমানদের বাঁচার উপায় নাই। খবরের কাগজ 'আজাদ' যা লেখে তাই সত্য বলে মনে হয়।"

কলকাতায় বেকার হোস্টেলে থাকাকালীন সময়ে মুজিবুর প্রায়ই দেখা করতেন সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে। তিনিও মুজিবুরকে পুত্রের মতোই স্নেহ

করতেন। গোপালগঞ্জে মুসলিম লীগ বলতেই মুজিবুরকে বোঝাত। এই সময়েই ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে জিন্নাহ সাহেবের মনোমালিন্য হয়। হক সাহেব জিন্নাহ সাহেবের হুকুম মানতে রাজি না হওয়ায় তিনি মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে নয়া মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মুসলিম লীগ এবং ছাত্রকর্মীরা তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। সেই সময় নাটোর এবং বালুরঘাটে দুটো উপনির্বাচন হয়েছিল। সেখানে মুজিবুর হক সাহেবের প্রার্থীদের হারানোর জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করেন। তখন থেকেই সোহরাওয়ার্দী সাহেব মুজিবুরকে পরিচালনা করতে লাগলেন।

কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার

কাজী নজরুল ইসলাম এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলার এই দুই কিংবদন্তি কৃতী সন্তানের জন্য বাঙালি মাত্রই গর্ববোধ করেন। ১৯৪১ সালে এদের দুজনের মধ্যে পরিচয় হয়েছিল। সেই সময় মুজিবুরের বয়স ছিল মাত্র কুড়ি বছর, অন্যদিকে নজরুল ইসলামের বয়স ছিল বিয়াল্লিশ বছর। মুজিবুর রহমান থেকে নজরুল ইসলাম প্রায় একুশ বছরের বড়ো ছিলেন। তাঁদের দুজনের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল ফরিদপুরে। এ বছর ফরিদপুরে ছাত্রলীগের ছিল জেলা সম্মেলন। এই জেলা সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সমগ্র ফরিদপুরে একটা উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল। কেননা বেশ কয়েকজন গুণী মানুষ ফরিদপুরে আসছেন। মূলত তিনজন অতিথি এসেছিলেন ঐ সম্মেলনে। এঁরা হলেন কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির এবং ইব্রাহিম খাঁ সাহেব।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো সেই সম্মেলনটি পূর্ব ঘোষিত তারিখ ও স্থান অনুয়ায়ী অনুষ্ঠিত হয়নি। কারণ সরকার এই সম্মেলনটিকে ভালো নজরে দেখেননি। ফলে আগে থেকেই সম্মেলন স্থলের আশেপাশে জারি করে রাখা হয়েছিল ১৪৪ ধারা। যদিও শেষ পর্যন্ত সভা বন্ধ করা যায়নি। হুমায়ুন কবিরের বাড়িতে হয়েছিল সেই সম্মেলন। কাজী নজরুল ইসলাম এই সম্মেলনে ছাত্রদের সামনে উদ্দীপনাময় সংগীত পরিবেশন করেছিলেন। এই সংগীত শুনে ছাত্রদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল। এই সম্মেলনে রাজনৈতিক কথাবার্তা একটু কমই হয়েছিল। তবে শিক্ষা এবং ছাত্রদের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচিত হলো।

এই সম্মেলনের কিছুদিন পরেই জিন্নাহ সাহেব এসেছিলেন বাংলাদেশের পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মেলনে যোগদান করার জন্য। মুজিবুর ফরিদপুর থেকে ছাত্রলীগের সদস্যসহ বিরাট কর্মী বাহিনী নিয়ে গিয়েছিলেন সিরাজগঞ্জে। এইভাবে ধীরে ধীরে মুজিবুর জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ফরিদপুর, সিরাজগঞ্জ এবং কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে। ছাত্রলীগের মধ্যে দুটি গোষ্ঠী তৈরি হয়। মুজিবুর সোহরাওয়ার্দী সাহেব নির্দেশিত পথেই হাঁটতে লাগলেন।

৪৩-এর দুর্ভিক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মানুষের পাশে

মুজিবুর রহমান এই সময়ে পুরোপুরি জড়িত হয়ে পড়েছেন রাজনীতির সঙ্গে। ইসলামিয়া কলেজে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। অফিসিয়াল ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে তাদের পরাজিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইসলামিয়া কলেজই ছিল বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের প্রাণ কেন্দ্র। মুজিবুরের জনপ্রিয়তা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মুজিবুরের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে পর পর তিন বছর কেউ প্রার্থী দাঁড় করায়নি। সেই সময় কলকাতার ছাত্র জহিরুদ্দিন মুজিবুরকে সাহায্য করত। তৎকালীন দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান গঠন যে জরুরি তা যেমন মুজিবুর বুঝতে পেরেছিলেন, তেমনি তিনি অন্যান্যদের বোঝাতেও সক্ষম হয়েছিলেন। সেই সময়ে মুজিবুর ছাড়াও আরো দুজন ছাত্র নেতা ছিলেন। এরা হলেন আনোয়ার হুসেন এবং চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী। সেই সময় অল বেঙ্গল মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন ওয়াসেক সাহেব। ঐ একই সময় প্রাদেশিক ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সাদেকুর রহমান। পরবর্তীকালে আনোয়ার হুসেন প্রাদেশিক ছাত্রলীগের সম্পাদক পদে বৃত হয়েছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমান যে ইসলামিয়া কলেজের অবিসংবাদী নেতা ছিলেন তা প্রমাণ হয়ে যায় যখন আমরা দেখি যে, ছাত্রলীগের অফিসিয়াল প্যানেলের প্রার্থীরা মুজিব মনোনীত প্রার্থীদের কাছে গো-হারা হেরে যায়। এলো ১৯৪৩ সাল। ঐ বছরই মুজিবুর রহমান প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই সময় মুসলিম লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন জনাব আবুল হাশিম সাহেব। এর আগে মুসলিম লীগের সম্পাদক ছিলেন সোহরাওয়ার্দী সাহেব।

ঐ সময় থেকেই মুসলিম লীগের মধ্যে আমরা দুটি গোষ্ঠী লক্ষ্য করি। একটি হলো প্রগতিবাদী এবং অন্যটি হলো প্রতিক্রিয়াশীল। প্রগতিবাদী গোষ্ঠীর মূল উদ্দেশ্য ছিল। মুসলিম লীগকে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে জনগণের একটা লীগে পরিণত করা। অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ছিলেন জমিদার, জোতদার, খানবাহাদুর ও নবাববৃন্দ। ১৯৪৩ সালেই খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব তার ভাই খাজা শাহাবুদ্দীন সাহেবকে শিল্পমন্ত্রী করেছিলেন। ঐ বছর সোহরাওয়ার্দী সাহেব মন্ত্রী হয়েছিলেন সিভিল সাপ্লাই দপ্তরের।

১৯৪৩ সালের বাংলায় যে মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তাতে শেখ মুজিবুর রহমান অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে তিনি লিখেছেন এইভাবে–

"এই সময় শহীদ সাহেব লঙ্গরখানা খোলার হুকুম দিলেন। আমি ত লেখাপড়া ছেড়ে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অনেকগুলি লঙ্গরখানা খুললাম। দিনে একবার করে খাবার দিতাম। মুসলিম লীগ অফিসে, কলকাতা মাদ্রাসায় এবং আরো অনেক জায়গায় লঙ্গরখানা খুললাম। দিনভর কাজ করতাম, আর রাতে কোনোদিন বেকার হোস্টেলে ফিরে আসতাম, কোনোদিন লীগ অফিসের টেবিলে শুয়ে থাকতাম।"

দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এই সময় মুজিবুরকে সবচাইতে বেশি উৎসাহ জুগিয়েছিলেন ফিরোজপুরের নূরুদ্দিন আহমেদ, বেকার হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট প্রফেসর সাইদুর রহমান সাহেব, কলেজের অধ্যক্ষ ড. আই. এইচ. জুবেরী প্রমুখ। এদিকে গোপালগঞ্জে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় মুজিবুর সেখানে দক্ষিণ বাংলা পাকিস্তান কনফারেন্স নামে একটি সভা করেছিলেন। সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির প্রধান করা হয়েছিল মুজিবুরকেই এবং সম্পাদক করা হয়েছিল যশোর জেলার মৌলভী আফসারউদ্দিন মোল্লা নামে একজন ব্যাপারীকে।

১৯৪৩ সালে দিল্লির মুসলিম লীগ সম্মেলনে

১৯৪২ সাল শেখ মুজিবুরের জীবনে একটি স্মরণীয় বর্ষ। কেননা ছোটবেলাতে তাঁদের বিবাহ হলেও ফুলশয্যা হয়েছিল ১৯৪২ সালে। বিবাহ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বলেছেন–

"আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার বয়স বারো তেরো বছর হতে পারে। রেণুর বাবা মারা যাওয়ার পর ওর দাদা আমার আব্বাকে ডেকে বললেন তোমার বড় ছেলের সাথে আমার এক নাতনির বিবাহ দিতে হবে। কারণ আমি সমস্ত সম্পত্তি ওদের দুই বোনকে লিখে যাব। রেণুর দাদা আমার আব্বার চাচা। পরিবারের মুরুব্বির হুকুম মানার জন্যই রেণুর সাথে আমার বিবাহ রেজিষ্ট্রি করে ফেলা হয়। আমি শুধু এটুকু জানলাম যে আমার বিবাহ হয়েছে। তখন কিছুই বুঝতাম না। রেণুর বয়স তখন বোধ হয় তিন বছর হবে। রেণুর যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তার মা মারা যান।"

দুর্ভিক্ষে পীড়িত মানুষদের সেবা করতে গিয়ে মুজিবুর নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই প্রথম মুজিবুরকে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন তাঁর সহধর্মিণী রেণু। এই সময়ে মুজিবুরের বাবা বলেছিলেন, "বাবা রাজনীতি কর আপত্তি করবো না, পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করছ এ তো সুখের কথা। তবে লেখাপড়া করতে ভুলিও না। লেখাপড়া না শিখলে মানুষ হতে পারবে না। আর একটা কথা মনে রেখো Sincerity of purpose and honesty of purpose থাকলে জীবনে পরাজিত হবা না।"

এই সময় শেরে বাংলা অর্থাৎ এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে মুজিবুরের কিছু কিছু মতানৈক্য হয়েছিল। কেননা এ. কে. ফজলুল হক সাহেব তখন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। যদিও মুজিবুরের আব্বা তাকে বারবার বলেছেন যাতে ফজলুল হক সাহেবের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ না করতে। এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যেই মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবের কথা জানতে পারলেন মুজিবুর রহমান। এই লাহোর প্রস্তাবে দুটি পাকিস্তানের কথা বলা হয়েছিল। বাংলা ও আসাম নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান, অন্যদিকে পাঞ্জাব বেলুচিস্তান সীমান্ত ও সিন্ধু প্রদেশ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান।

১৯৪৩ সাল। দিল্লিতে বসেছিল অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ সম্মেলন। এই সম্মেলনে মুজিবুর অংশ নিয়েছিলেন। এই প্রথম তিনি পা রাখলেন বাংলার বাইরে। দিল্লিতে তিনি ছিলেন অ্যাংলো অ্যারাবিয়ান কলেজ প্রাঙ্গণে তাঁবুর

মধ্যে। শেখ মুজিবুরের সঙ্গে ছিলেন ইসলামিয়া কলেজ ইউনিয়নের সম্পাদক মীর আশরাফ উদ্দিন। ওঁর বাড়ি ছিল ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার কসবা গ্রামে। এই সম্মেলনেই মহম্মদ আলী জিন্নাহকে হাতির পিঠে বসিয়ে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বার করা হয়েছিল। এই সম্মেলনে হায়দ্রাবাদের মুসলিম লীগ সভাপতি নবাব ইয়ার জং বাহাদুর উর্দুতে তিন ঘণ্টা বক্তৃতা করেছিলেন।

দিল্লির অতিরিক্ত গরম এবং রাত্রিতে ঠাণ্ডার জন্য মুজিবুর ওখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই সময় ছাত্রলীগের বিখ্যাত কর্মী খলিলুর রহমান অনেক কষ্ট করে ডাক্তার নিয়ে এসে তাঁর চিকিৎসা করিয়েছিলেন। এই খলিল ভাই থাকতেন তাঁর ইলিয়ট হোস্টেলে। শরীরটা একটু ভালো হলে মুজিবুর দিল্লির লালকেল্লা, দেওয়ানি আম, দেওয়ানি খান, কুতুব মিনার, নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগাহ, নতুন দিল্লি ইত্যাদি স্থান পরিদর্শন করেছিলেন। এদিকে সম্মেলন শেষ করে হাওড়া ফেরার পালা। মুজিবুর রহমান, খলিল ভাই এবং নূরুদ্দিন এই তিন বন্ধুর কারো কাছেই পর্যাপ্ত টাকা ছিল না। তাই তারা একটি টিকিট করে প্রথম শ্রেণির প্যাসেঞ্জার কামরার সাথে যুক্ত চাকরদের জন্য কামরায় উঠে টি. টি.-কে কোনোরকম ফাঁকি দিয়ে হাওড়ায় এসে পৌঁছেছিলেন। হাওড়া থেকে বাসে করে তিন বন্ধু মিলে বেকার হোস্টেলে ফিরে এলেন। ১৯৪৪ সালে মুজিবুরকে একই সঙ্গে মুসলিম লীগ এবং ছাত্রলীগ এই দুটি সংগঠনেরই কাজ করতে হয়েছে। এই সময়ে মুজিবুরের সহযোদ্ধা যারা ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলে, নূরুদ্দিন, বর্ধমানের খন্দকার নূরুল আলম ও শরফুদ্দিন, সিলেটের মোয়াজ্জেম আহমেদ চৌধুরী, খুলনার একরামুল হক, চট্টগ্রামের মাহবুব আলম, নূরুদ্দিনের চাচাতো ভাই এস. এ. সালেহ প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই শহীদ সাহেব ও আবুল হাশিম সাহেবের অনুগামী ছিলেন। এই সময়ে শহীদ সাহেবের সঙ্গে মুজিবুরের তীব্র কথাকাটাকাটি হয়েছিল। কেননা শহীদ সাহেব আনোয়ার সাহেবকে একটি পদ দিতে বলেছিলেন। যার তীব্র বিরোধিতা করেন শেখ মুজিব। এই সময় মুজিবুরকে সমর্থন করেন নূরুদ্দিন, একরাম, নূরুল আলম প্রমুখ। শেষ পর্যন্ত রাগ করে মুজিব যখন কলকাতার ৪০ নং থিয়েটার রোড থেকে বেরিয়ে আসছিলেন তখন শহীদ সাহেব নূরুল হুদা সাহেবকে বলেছিলেন 'ওদের ধরে আনো'। এই নূরুল হুদা মানুষটি খুবই গুণী ছিলেন। পরবর্তীকালে বুলবুল একাডেমীর সম্পাদক হয়েছিলেন এই মাহমুদ নূরুল হুদা। যিনি শহীদ সাহেবের খুবই অনুরাগী ছিলেন। তাঁকে সবাই হুদা ভাই বলে ডাকতেন। কারো কোনো বিপদ হলে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

নূরুল হুদা যখন পুনরায় মুজিবুরকে শহীদ সাহেবের সামনে উপস্থিত করলেন তখন শহীদ সাহেব মুজিবুরকে বলেছিলেন, "তুমি বোকা, আমি তো আর কাউকেই এ কথা বলি নাই। তোমাকে বেশি আদর ও স্নেহ করি বলেই তোমাকে বলেছি। যাতে ইলেকশন করো। দেখো নিজেদের মধ্যে গোলমাল করো না।" সাংগঠনিক এই নির্বাচনে চট্টগ্রাম জেলা মুসলিম লীগ এবং ছাত্রলীগের কর্মীদের সাহায্য নিয়ে ফজলুল কাদের চৌধুরী সংগঠন দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সময়ে চট্টগ্রামে যাদের সঙ্গে মুজিবুরের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন এম. এ. আজিজ, জহুর আহমেদ চৌধুরী, আজিজুর রহমান, ডা. সুলতান আহমেদ, আবুল খায়ের চৌধুরী প্রমুখ। ধীরে ধীরে মুজিবুরের পরিচিতি এবং জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগল। সোহরাওয়ার্দী সাহেব মুজিবুরকে পেছন থেকে সাহায্য করেছিলেন। এরই মধ্যে সিদ্ধান্ত হলো যে কুষ্টিয়ায় হবে ছাত্রলীগের সম্মেলন। শুধু কুষ্টিয়ায় নয়, জেলায় জেলায় যেখানে যেখানে সম্ভব জেলা সম্মেলন করার উদ্যোগ নেয়া হলো।

কুষ্টিয়ায় ছাত্রলীগের সম্মেলনে মুজিবুরের দৃপ্ত ভূমিকা

১৯৪৪ সাল। ছাত্রলীগের নেতৃত্বের মধ্যে সমস্যা চলছিল। বিশেষ করে আনোয়ার সাহেব এবং নূরুদ্দিনের মধ্যে সমস্যা। মুজিবুরের ব্যক্তিত্ব এতটাই দৃঢ় ছিল যে, সব গোষ্ঠীই মুজিবুরকে চায়। আনোয়ার সাহেব কলকাতা এবং ঢাকায় ছাত্রলীগের সম্মেলন করতে সাহস না পেয়ে কুষ্টিয়াতে সম্মেলন আহ্বান করলেন। যেহেতু কুষ্টিয়া ছিল ছাত্রনেতা শাহ আজিজুর রহমানের নিজের জেলা, তাই সম্মেলন সেখানেই ডাকা হলো। মুজিবুর চট্টগ্রামসহ সমস্ত জেলায় লোক পাঠালেন প্রতিনিধি প্রেরণ করার জন্য। কুষ্টিয়ার কাছেই ফরিদপুর। ফরিদপুরেও ছাত্রদের দুটো ভাগ। একটি অংশ ছিল মুজিবুরের সঙ্গে। অন্য অংশ ছিল মোহন মিয়া সাহেবের সমর্থক। আবার মোহন মিয়া ছিলেন আনোয়ারের সমর্থক।

সম্মেলন হয়েছিল কুষ্টিয়ার সিনেমা হলে। পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জনাব হামুদুর রহমান সাহেব ছিলেন সভাপতি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সম্মেলনস্থলে ছাত্র নয় এমন বহু লোককে আগে থেকেই বসিয়ে রাখা হয়েছিল। এই অবস্থায় তীব্র প্রতিবাদ করে মুজিবুর রহমান সমর্থকদের নিয়ে সম্মেলন বয়কট করলেন। শেষ পর্যন্ত মুজিবুর কলকাতা মুসলিম লীগ ছাত্রলীগের নামেই কাজ করতে লাগলেন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ছাত্রলীগে আর কোনো নির্বাচন হয় নাই। মুসলিম লীগের ছাত্রলীগ দুটো দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করতে লাগল। একদল পরিচিত হতো শহীদ সাহেব ও হাশিম সাহেবের দল বলে এবং অন্যদল পরিচিত হতো খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব এবং মওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের দল বলে।

মুসলিম লীগের ম্যানিফেস্টো এবং মুজিবুরের তৎপরতা

এত দিন মুসলিম লীগের কোনো ইশতেহার বা ম্যানিফেস্টো ছিল না। যদিও শেষ পর্যন্ত হাশিম সাহেব এবং শহীদ সাহেব দুজনে মিলেই মুসলিম লীগের একটা খসড়া ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেন। এই ফেনিফেস্টো প্রকাশের পর একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এই ম্যানিফেস্টোতে বলা হয়েছিল যে, মুসলিম লীগ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এর রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া। এর সঙ্গে অবশ্যই ছিল জমিদার প্রথা বিলোপসহ অন্যান্য বিষয়।

মুজিবুর এই দলিল বা ইশতেহারে প্রগতিশীল বিষয়গুলিকে লুফে নিলেন এবং অস্ত্র হিসেবে সেগুলোকে প্রয়োগ করতে লাগলেন। সেই সময় মুজিবুর একদিকে যেমন পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করেছেন তেমনি অন্যদিকে পাকিস্তান গঠিত হবার পর কী ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে তা নিয়েও প্রচার অভিযান চালাতে লাগলেন। তখন থেকেই মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে জেলায় জেলায় সফর করেন। এই রাজনৈতিক ইশতেহার সম্পর্কে প্রচার অভিযান সংগঠিত করেন। ঐ সময় জনাব আবু মইন চৌধুরী, যিনি পরবর্তীকালে ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন, তিনিও মুজিবুরের সহযোগী ছিলেন। শুধু শহীদ সাহেবের সঙ্গে নন, হাশিম সাহেবের সঙ্গেও মুজিবুর বহু স্থানে ক্লাস নিতে গেছেন।

এই সময়েই ঢাকার ১৫০ নম্বর মোগলটুলিতে মুসলিম লীগের একটি প্রাদেশিক শাখা অফিস খোলা হয়েছিল। সেখানে মুজিবুর রহমান, জনাব শামসুল হক সাহেব, শামসুদ্দিন আহমেদ, নোয়াখালীর আজিজ আহমেদ, খোন্দকার মোশতাক আহমেদ প্রমুখরা অনেকেই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। ঢাকা অফিসের মূল ভার ছিল শামসুল হক সাহেবের উপর এবং মুজিবুর কলকাতা অফিসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময় কলকাতার আহমেদ আলী পার্কে মুসলিম লীগের কাউন্সিল সভা হয়। সেই সভা থেকে হাশিম সাহেবকেই মুসলিম লীগের সম্পাদক করা হয়। তবে ম্যানিফেস্টো পাস করানোর ব্যাপারে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

মুসলিম লীগ সরকারের পতন

এই সময়েই আকস্মিকভাবে পতন ঘটে দেড় বছর বয়সী মুসলিম লীগ সরকারের। গভর্নর শাসন ক্ষমতা নিজের কাছে নেন। কলকাতার মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি, অসততা ইত্যাদির ব্যাপারে শহীদ সাহেব ব্যবস্থা নিতেই মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা দুই-একজন এম. এল. এ.-কে টাকা দিয়ে কিনে নেয় এবং মুসলিম লীগ সরকারের পতন ঘটায়। প্রকৃতপক্ষে মাত্র এক ভোটে লীগ সরকারকে চলে যেতে হয়েছিল। কোনো অনাস্থা প্রস্তাব নয়। স্পিকার ছিলেন নওশের আলী সাহেব। পরের দিন তিনি বললেন যে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয়ে গেছে। এইভাবে মাত্র এক ভোটে খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের সরকারের পতন ঘটে।

এভাবে টাকা দিয়ে এম. এল. এ-কেনা যায় এ সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না মুজিবুরের। রাজনৈতিক নীচতার নিকৃষ্ট উদাহরণ তিনি এই প্রথমবারের মতো প্রত্যক্ষ করলেন। সেই সময় মুজিবুর রহমানের উপর দায়িত্ব পড়েছিল কয়েকজন এম. এল. এ.-কে পাহারা দেয়ার জন্য। যাতে তারা বিক্রি না হয়ে যান। এই রকমই একটা সংকটের সময় মুজিবুরকে গভীর রাতে আসাম বেঙ্গল ট্রেনে কলকাতা থেকে রংপুর যেতে হয়েছিল একজন এম. এল. এ.-কে নিয়ে আসার জন্য, যাতে তাকে বিরোধীরা ক্রয় করতে না পারে।

এই প্রসঙ্গে অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বঙ্গবন্ধু বলেছেন :– "আমরা ছাত্র ছিলাম, দেশকে ভালোবাসতাম, দেশের জন্য কাজ করতাম, এই সকল নীচতা এই প্রথম দেখলাম, পরে যদিও অনেক দেখেছি, কিন্তু এই প্রথমবার। এই সমস্ত খান বাহাদুরদের দ্বারা পাকিস্তান আসবে, দেশ স্বাধীন হবে, ইংরেজকে তাড়ানোও যাবে, বিশ্বাস করতে কেন যেন কষ্ট হত। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠান পূর্বে ছিল খান সাহেব, খান বাহাদুর ও ব্রিটিশ খেতাবধারীদের হাতে, আর এদের সাথে ছিল জমিদার, জোতদার শ্রেণির লোকরা। এদের দ্বারা কোনোদিন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হতো না। শহীদ সাহেব ও হাশিম সাহেব যদি বাংলার যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে মুসলিম লীগকে জনপ্রিয় না করতে পারতেন এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণিকে টেনে আনতে না পারতেন, তাহলে কোনোদিনও পাকিস্তান আন্দোলন বাংলার কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারত না।"

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামিয়া কলেজের সাধারণ সম্পাদক

অল্পদিনের মুসলিম লীগ সরকারের পতনের পর শহীদ সাহেব মুসলিম লীগ সংগঠনের দিকে মন দিলেন। কংগ্রেসের নেতৃত্বে চলছে ভারত ছাড়ো আন্দোলন এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্বে চলছে পাকিস্তান গঠনের সংগ্রাম। ঐ একই সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু হিন্দু মুসলমান সৈন্যদের নিয়ে গঠন করেন আজাদ হিন্দ বাহিনী। আমরা পূর্বেই বলেছি, মুজিবুর নেতাজির দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত। সিঙ্গাপুর থেকে ভেসে আসা নেতাজির বক্তৃতায় মুজিবুর চঞ্চল হয়ে উঠতেন। একদিকে ইংরেজদের তাড়ানো আর অন্যদিকে পাকিস্তান গঠন–এই দুই ধরনের চিন্তায় মুজিবুর যেন কোনো কূল-কিনারা পেতেন না। ইংরেজদের পর যদি অখণ্ড ভারত আসে তাহলে তো দশ কোটি মুসলমানের সমস্যার সমাধান হবে না। তাই পাকিস্তান গঠনই সমস্যার সমাধান করতে পারে। এইভাবেই ভাবতেন মুজিবুর।

মুজিবুর সেই সময় বেকার হোস্টেলেই ছিলেন। সেখানে থেকেই মুজিবুর সোহরাওয়ার্দী সাহেব, শেরে বাংলা ফজলুল হক প্রমুখের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। আবার অন্যদিকে ছাত্র আন্দোলন এবং ছাত্রদের সংগঠিত করতেন। যেহেতু ইসলামিয়া কলেজে ছাত্ররা সবাই মুসলমান, তাই ছাত্রদের নানাবিধ সমস্যার সমাধানে কলেজ কর্তৃপক্ষও মুজিবুরের উপর দায়িত্ব দিল। কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রায় প্রত্যেকেই মুজিবুরকে স্নেহ ও সম্মান করতেন। তাঁর জনপ্রিয়তা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনে মুজিবুরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস ছিল না কোনো ছাত্রের। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন ছাত্র সংসদ নির্বাচনে।

তার ভাষায়– : "এই সময়ে আমি বাধ্য হয়ে কিছুদিনের জন্য ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হই। অনেক চেষ্টা করেও দুই গ্রুপের মধ্যে আপোষ করতে পারলাম না। দুই গ্রুপই অনুরোধ করলো আমাকে সাধারণ সম্পাদক হতে, নতুবা তাদের ইলেকশন করতে দেয়া হোক। পূর্বের দুই বৎসর নির্বাচন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় করেছি। ইলেকশন আবার শুরু হলে আর বন্ধ করা যাবে না। মিছামিছি গোলমাল, লেখাপড়া নষ্ট, টাকা খরচ হতে থাকবে। আমি বাধ্য হয়ে রাজি হলাম এবং বলে দিলাম তিন মাসের বেশি আমি থাকবো না।"

প্রকাশ করলেন 'মিল্লাত' সাপ্তাহিক কাগজ

সেই দিনগুলিতে মুজিবুর রহমানদের দাবি অর্থাৎ মুসলিম লীগের দাবি পাকিস্তান গঠনকে দুই-একটি সংবাদপত্র ছাড়া বেশিরভাগ সংবাদপত্রই অগ্রাহ্য করে। তৎকালীন সময়ে দৈনিক আজাদই ছিল একমাত্র বাংলা খবরের কাগজ, যা মুসলিম লীগ এবং পাকিস্তান গঠন করার আন্দোলনকে সমর্থন করত। অন্যদিকে ইংরেজি কাগজগুলির মধ্যে দৈনিক মর্নিং নিউজ এই আন্দোলনকে সমর্থন করত। মুজিবুর বহুদিন ধরেই মুসলিম লীগের একটি নিজস্ব খবরের কাগজের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন। সেই সময় দৈনিক আজাদের মালিক, সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আকরাম খাঁ সাহেব। মুসলিম লীগের আদর্শ এবং পাকিস্তান গঠনের দাবিকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্যই মুজিবুর একটি সাপ্তাহিক কাগজের কথা নেতৃবৃন্দকে বলছিলেন বহুদিন ধরে।

মুজিবুরের এই অনুভূতির কথা হৃদয়ঙ্গম করে আর্থিক সাহায্য নিয়ে যিনি এগিয়ে এসেছিলেন তিনি হলেন সেই সময়ের জনপ্রিয় মুসলিম লীগ নেতা এবং কলকাতার বিখ্যাত ব্যারিস্টার শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব। কাগজের নাম স্থির হলো 'মিল্লাত'। কাগজটির সম্পাদক হয়েছিলেন আবুল হাশিম সাহেব স্বয়ং। পত্রিকাটির অফিস ঘর হয়েছিল কলকাতার মুসলিম লীগ অফিসের নিচের তলায়। 'মিল্লাত'-এ বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখতেন তৎকালীন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী কাজী মোহাম্মদী ইদ্রিক। তিনিই সাংবাদিক হিসেবে কাজ করতেন। 'মিল্লাত'-এর প্রচারের জন্য মুজিবুর রহমান হকারি পর্যন্ত করেছেন। সমগ্র বাংলা থেকেই 'মিল্লাত'-এর প্রতিনিধি নির্ধারণ করা হলো। বুদ্ধিজীবী সমাজের মধ্যে 'মিল্লাত' খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং হিন্দুদের মধ্যেও অনেকে কাগজটা পড়তেন। যাই হোক 'মিল্লাত'-এ বেশ ভালো ভালো প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। মুসলিম লীগ-এর উদ্দেশ্য কী এবং কেন পাকিস্তান গঠন প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা থাকত মিল্লাত-এ। পাকিস্তান গঠন করতে পারলে মুসলমানদের যে সঠিক উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটবে তা ব্যাখ্যা করে প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। প্রকৃতপক্ষে মিল্লাত প্রকাশিত হওয়ায় মুসলিম লীগের সাংগঠনিক তৎপরতা বেড়ে গিয়েছিল। কেননা 'মিল্লাত'-এ সভা-সমিতির যাবতীয় খবরাখবর থাকত। ফলে উৎসাহিত হতেন সর্বস্তরের কর্মী এবং নেতৃত্ব। অনেক সময় মুসলিমের শিক্ষক হিসেবে কাজ করত মিল্লাত।

ফরিদপুরে মুজিবুর ঘর ভাড়া পাননি

বাংলায় নির্বাচনের দিন-ক্ষণ ঘোষণা করা হয়। কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউটে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারির বোর্ডের সভা আহ্বান করা হয়, মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব। শহীদ সাহেব ডেপুটি লিডার। ১৯৩৭ সালে শহীদ সাহেব যখন দুটো আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন তখন একটি থেকে পদত্যাগ করে খাজা নাজিমুদ্দীনকে জয়ী করে নিয়ে আসা হয়েছিল। অথচ সেই খাজা সাহেব ষড়যন্ত্র করে শহীদ সাহেবকে পার্লামেন্টারি বোর্ডের বাইরে রাখতে চাইলেন। এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুজিবুর। বললেন, শহীদ সাহেবকে এম. এল. এ.-দের পক্ষ থেকে কেন নেয়া হবে না? তাঁকে অপমান করা হয়েছে। কারণ তিনি মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির ডেপুটি লিডার। এটা একটা ষড়যন্ত্র। সেই সময় মুজিবুর রহমান অসাধারণ ভূমিকা পালন করলেন। যদিও তিনি তখনো ছাত্রনেতা, কিন্তু তার প্রভাব অপরিসীম।

এই সময় এম. এল. এ. এম. এল. সি. এবং লীগ নেতাদের সামনে বলেছিলেন, "আমাদের কথা আছে, শুনতে হবে। শেষ পর্যন্ত নেতারা রাজি হলেন। আমিই প্রথম বক্তা, প্রায় আধ ঘণ্টা বক্তৃতা করলাম এবং শহীদ সাহেবকে বললাম, আপোষ করার কোনো অধিকার আপনার নেই। আমরা খাজাদের সাথে আপোস করবো না। কারণ ১৯৪২ সালে প্রধানমন্ত্রী হয়ে নিজের ভাইকে মন্ত্রী বানিয়েছিলেন। আবার তাঁর বংশের থেকে এগারোজনকে এম. এল. এ. বানিয়েছিলেন। এদেশে তারা ছাড়া আর লোক ছিল না? মুসলিম লীগে কোটারি করতে আমরা দিব না। আমরাই হক সাহেবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি, দরকার হয় আপনাদের বিরুদ্ধেও আন্দোলন করবো।"

শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো যে, মনোনয়ন নয়, নির্বাচনের মাধ্যমেই গঠিত হবে মুসলিম পার্লামেন্টারি বোর্ড। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল যে, শহীদ সাহেবের দলের পাঁচজনই জিতলেন। তবে ফরিদপুরে শহীদ সাহেবের সমর্থকবৃন্দ খুব একটা জয়ী হতে পারলেন না। সেই সময় মুসলিম লীগ থেকে নির্দেশ এসেছিল যে, প্রত্যেক জেলায় নির্বাচনী অফিস করে কাজ করতে হবে। মুজিবুরের ওপর দায়িত্ব পড়েছিল ফরিদপুর জেলার। এই দায়িত্ব পেয়ে মুজিবুর কলেজ ছেড়ে ফরিদপুরে চলে আসলেন ফরিদপুরে মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন মোহন মিয়া। তিনি মুজিবুরকে পছন্দ করেন না। তিনিই

চক্রান্ত করে বলে ছিলেন যাতে মুজিবুর ফরিদপুরে একটাও ঘর ভাড়া না পান। ফলে শহরের উপর মুজিবুর ঘর ভাড়া পেলেন না।

এই ফরিদপুরেই মুজিবুরের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় ছিলেন। তার ছিল একটি দোতলা বাড়ি। তিনিই মুজিবুরকে থাকতে দিলেন। এখানে থেকেই মুজিবুর মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ এবং রাজবাড়িতে মুসলিম লীগের কাজ করতে শুরু করেন। সেই বছর নির্বাচনে একশো উনিশটার মধ্যে একশোটা আসন দখল করেছিল মুসলিম লীগ।

দিল্লিতে মুসলিম লীগ কনভেনশনে মুজিবুর রহমান

১৯৪৬ সাল। শেখ মুজিবুরের বয়স মাত্র পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। কলেজ ছেড়ে দিয়েছেন অনেক দিন। মুসলিম লীগের ব্যাপক দায়িত্ব এখন তাঁর উপর। অনেকগুলো জেলা দেখছেন তিনি। বলা চলে মুসলিম লীগের সর্বক্ষণের কর্মী। ছাত্রলীগ দেখার সময় পাচ্ছেন না। মুসলিম লীগের বয়স্ক নেতৃবৃন্দ মুজিবুরকে খুবই ভালোবাসেন এবং ভরসা করেন। বিশেষ করে মুজিবুরের নিরপেক্ষতা, স্পষ্টবাদিতা এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে নেতৃবৃন্দ ছিলেন দারুণভাবে মুগ্ধ। এই রকম সময়েই সাত, আট এবং নয় এপ্রিল মুসলিম লীগের কনভেনশন আহ্বান করা হলো দিল্লিতে। এই কনভেনশন আহ্বান করেছেন জিন্নাহ সাহেব। এতে উপস্থিত থাকবেন সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলিম লীগপন্থী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ।

সেই সময়ে সমগ্র ভারত বর্ষে ছিল মাত্র এগারোটি প্রদেশ। কিন্তু বিগত নির্বাচনে বাংলাদেশ ও মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলিতে মুসলিম লীগ একচেটিয়াভাবে জয়লাভ করেছে। যদিও মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত পাঞ্জাব সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগ একইভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারে নাই। একমাত্র বাংলাদেশেই জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকার গঠিত হয়। শহীদ সাহেব নির্দেশ দিলেন একটা স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করতে। সিদ্ধান্ত হলো যে বাংলা ও আসামের মুসলিম লীগ নেতা ও কর্মীরা এই ট্রেনে দিল্লি যাবেন। শহীদ সাহেব বলেছিলেন ছাত্রফ্রন্ট থেকেও দশ-পনেরো জন যাবে এই কনভেনশনে যোগ দিতে।

বাংলাদেশে মুসলিম লীগ জয় লাভ করাতে সারা দেশেই মুসলমানদের মধ্যে একটা উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই কারণেই হাওড়া থেকে দিল্লি পর্যন্ত অসংখ্য স্থানে সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে ছাত্ররা এই কনভেনশনে যোগ দিল। ছাত্র-যুবদের মধ্য থেকে যারা এই কনভেনশনে যোগ দিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জহিরুদ্দিন, নূরুদ্দিন, নূরুল আলম, শরফুদ্দিন, কিউ. জে. আজমিরী, আনোয়ার হোসেন, শামসুল, হক, খোন্দকার মোশতাক আহমেদসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছাত্রনেতা। পাটনা স্টেশনে হাজার হাজার মুসলমান ট্রেন থামিয়ে ধ্বনি তুলেছিলেন বাংলাকা মুসলমান জিন্দাবাদ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান ইত্যাদি। আবেগে পাটনা

স্টেশনে প্রত্যেককে একটি করে ফুলের মালা যেমন দেয়া হয়েছিল, তেমনি এলাহাবাদ স্টেশনে পুরো ট্রেনটাকেই ফুল-মালা দিয়ে সাজিয়ে দেয়া হয়েছিল।

যথারীতি ট্রেন পৌঁছেছিল দেরি করে। ফলে জিন্নাহ সাহেব কনভেনশন শুরু করেন একটু দেরি করে। জিন্নাহ সাহেব কনভেনশনে প্রস্তাব পেশ করার জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে অনুরোধ করেন। কারণ তিনিই বাংলার এবং তখনকার দিনে একমাত্র প্রধানমন্ত্রী। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল–

"That the Zones comprising Bengal and Assam in North East and the Punjab, North west Frontier Province, Sind and Beluchistan in the North West of India namely Pakistan Zones where the Muslims are in a dominant majority, be constituted into one soverign independent state and that an unequivoeal undertaking be given to implement the establishment of Pakistan without delay."

শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের এই প্রস্তাব এতটাই শক্তিশালী যে, ইংরেজ সরকার পরবর্তীকালে এই প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করেই পাকিস্তান গঠন করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তার সুফল বাঙালি মুসলমানরা পাননি। প্রকৃত স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল অর্থাৎ আরো চব্বিশ বছর তীব্র সংগ্রাম করতে হয়েছিল। যার নেতৃত্বে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বন্ধ কামরার দরজায়

১৯৪৩ সালে প্রথমবার দিল্লি এসে ঐতিহাসিক তাজমহল না দেখেই ফিরে যেতে হয়েছিল মুজিবুরকে। এবার আর সেই সুযোগ তিনি নষ্ট করতে চাইছিলেন না। এবার যেভাবেই হোক দেখে যেতে হবে–এই ছিল তাঁর মানসিক প্রস্তুতি। মুজিবুরসহ আট-দশজন জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে প্রথমে দিল্লি শহরটা খুব ভালোভাবে দেখে নিলেন। দিল্লির লালকেল্লা, কুতুব মিনার, জামে মসজিদসহ স্থাপত্য নিদর্শনগুলি দেখে তাঁরা রওয়ানা হলেন আজমীর শরীফের দিকে। আজমীর শরীফে খাদেমদের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হলেন মুজিবুর। খাজা বাবার দরগাসহ তারাগড় পাহাড় আনার সাগর ইত্যাদি স্থান দেখে মোগল আমলের কীর্তিগুলি সবই তারা দেখলেন। বাদশা-বেগমরা এখানে এসে বিশ্রাম করতেন। আজমীর শরীফের সবকিছু দেখে, অনুভব করে মুজিবুররা আবার ট্রেনে উঠলেন। এবার লক্ষ্য আগ্রা। এই প্রসঙ্গে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে মুজিবুর লিখেছেন এইভাবে–

"আজমীর শরীফকে বিদায় দিয়ে আবার আমরা ট্রেনে উঠে বসলাম আগ্রার দিকে। সেখানে মমতাজ বেগম শুয়ে আছেন তাজমহলকে বুকে করে। বহুদিনের স্বপ্ন তাজমহল দেখবো। মোগল শিল্পের ও স্থাপত্যকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই তাজ। বাদশা শাহজাহানের অমর প্রেমের নিদর্শন এই তাজ। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম এই তাজ। আমাদের নিজেদের মধ্যে তাজ দেখা নিয়ে অনেক আলোচনা হলো। দুনিয়ার বহু দেশ থেকে বহু লোক শুধু তাজ দেখার জন্য ভারত বর্ষে আসতো। তাজমহলের কথা জানে না এমন মানুষ দুনিয়ায় খুব বিরল।"

আগ্রায় পৌঁছে মুজিবুররা দেখলেন সেদিন পূর্ণিমা। পূর্ণিমায় তাজমহল দেখার আনন্দই আলাদা। একে তাজমহল, ইতিমাদ-উদ-দৌলা বা বেগম নূরজাহানের পিতার কবর, আগ্রা দুর্গ, দেওয়ানি আম, মতি মসজিদ, মদিভবন, নাগিনা মসজিদ, শীসা মহল ইত্যাদি প্রায় সবকিছুই দেখলেন।

তাজমহলের বর্ণনা দিতে গিয়ে মুজিবুর বলেন : "আমাদের পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করলাম, এত ভিড় কি সকল সময়ই থাকে? বললেন, না, পূর্ণচন্দ্রের সময়ই অনেক লোক বিশেষ করে আসে। সূর্য যখন অস্ত গেল, সোনালি রঙ আকাশ থেকে ছুটে আসছে। মনে হলো তাজের যেন আর একটা নতুন রূপ। সন্ধ্যার একটু পরেই চাঁদ দেখা দিল। চাঁদ অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে আসছে

আর সাথে সাথে তাজ যেন ঘোমটা ফেলে দিয়ে নতুন রূপ ধারণ করেছে। কী অপূর্ব দেখতে।"

পরের দিন সকালবেলা ওঁরা চলে গেলেন ফতেপুর সিক্রিতে। এই ফতেপুর সিক্রি তৈরি করেছিলেন সম্রাট আকবর। এখানেই ছিল তাঁর রাজধানী। এই ফতেপুর সিক্রির সামনে বিশাল মাঠের নাম খানওয়া। যেখানে সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করে সম্রাট বাবর মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন। এখানে বুলন্দ দরোজা, সেলিম চিশতীর দরগাহ, তানসেনের বাড়ি, আকবরের সমাধিস্থল সেকেন্দ্রা ইত্যাদি দেখে মুজিবুররা গেলেন তুলন্দা স্টেশনে। সবাইকে ট্রেনে তুলতে গিয়ে ট্রেন ছেড়ে দেয়। কোনো উপায় না দেখে দৌড়ে তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একটি প্রথম শ্রেণির বন্ধ কামরার দরজায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। লক্ষ্য হলো পরের স্টেশনে গাড়ি থামলে নিজের জায়গায় উঠে বসবেন। কিন্তু পরের স্টেশন খুব কাছে ছিল না। এই অবস্থায় দীর্ঘ সময় দাঁড়ানোয় মুজিবুরের হাত-পা অবশ হয়ে যাচ্ছিল। যেকোনো সময় তিনি ট্রেন থেকে পড়ে যেতে পারতেন। যাই হোক পরের স্টেশনে ট্রেন থামলে তিনি নিজের জায়গায় গেলেন। পরের দিন সন্ধ্যায় হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে তিনি দেখলেন সবারই সবকিছু ঠিকঠাক রয়েছে। শুধু নেই তাঁর সুটকেসটি। ফলে শুধু ছোট বিছানাটি নিয়েই তিনি কলকাতা ফিরলেন। কলকাতা থেকে সোজা চলে গেলেন গোপালগঞ্জে। কারণ হাতে টাকা-পয়সা প্রায় নেই বললেই চলে। সঙ্গে অভাব রয়েছে কাপড়-চোপড়ের। কিছুদিন পর আবার এলেন কলকাতা। এসেই দেখেন কলকাতার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা।

ঝাঁপিয়ে পড়লেন '৪৬-এর দাঙ্গার আগুন নেভাতে

পুনরায় কলকাতা ফিরে এসেই মুজিবুর জানলেন যে, জিন্নাহ্ সাহেব ২৯ জুলাই মুম্বাই শহরে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ-এর কাউন্সিল সভা আহ্বান করেছেন। নেতৃবৃন্দ মুজিবুরকেও অনুরোধ করেছিলেন এ সভায় যোগদান করার জন্য। কিন্তু শুধুমাত্র অর্থের অভাবেই তিনি ঐ গুরুত্বপূর্ণ সভাটিতে যোগ দিতে পারেননি। ঐ সভা থেকেই জিন্নাহ সাহেব পরবর্তী ১৬ আগস্ট দিনটিকে 'একশন ডে' হিসেবে পালন করার আহ্বান জানান। অবশ্যই সেই কর্মসূচি উদ্‌যাপন করতে হবে শান্তিপূর্ণভাবে। যদিও কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ তা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু জিন্নাহ সাহেব ব্রিটিশ সরকার এবং ক্যাবিনেট মিশনকে এটাই দেখাতে চেয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষের দশ কোটি মুসলমান পাকিস্তান দাবি আদায় করতে বদ্ধপরিকর।

যথারীতি এই দিবসটি উদ্‌যাপন করার জন্য ডাক পড়ল মুজিবুরের। হাশিম সাহেব মুজিবুরদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে–

"তোমাদের মহল্লায় মহল্লায় যেতে হবে, হিন্দু মহল্লায়ও তোমরা যাবে। তোমরা বলবে, আমাদের এই সংগ্রাম হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। আসুন আমরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই দিনটা পালন করি।"

শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী। তিনিও জনগণের কাছে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে এই দিবসটি পালন করার আবেদন জানান। সিদ্ধান্ত হলো ১৬ আগস্ট কলকাতার গড়ের মাঠে হবে জনসভা। ঐ দিন সকল সাতটায় মুজিবুর এবং ছাত্রনেতা নূরুদ্দিন ইসলামিয়া কলেজ থেকে সাইকেলে করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে মুসলিম লীগের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। তাঁর ভাষায়–

"আমি ও নূরুদ্দিন সাইকেলে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হলাম। পতাকা উত্তোলন করলাম। কেউই আমাদের বাধা দিল না। আমরা চলে আসার পরে পতাকা নামিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল শুনেছিলাম। আমরা কলেজ স্ট্রিট থেকে বউবাজার হয়ে আবার ইসলামিয়া কলেজে ফিরে এলাম। কলেজের দরজা ও হল খুলে দিলাম। আর যদি আধাঘণ্টা দেরি করে আমরা বউ বাজার হয়ে আসতাম তবে আমার ও নূরুদ্দিনের লাশও আর কেউ খুঁজে পেত না।"

এই সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানের যাঁরা সহযোগী সহযোদ্ধা ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন হাজেরা বেগম, হালিমা খাতুন, জয়নাব বেগ, সাদেকা বেগম প্রমুখ। মূলত ১৬ আগস্ট থেকেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে কলকাতার পথে। ঐ দিনের মূল কর্মসূচি ছিল গড়ের মাঠে। লক্ষ মানুষের সমাবেশ। বিভিন্ন জায়গা থেকে অসংখ্য শোভাযাত্রা এলো গড়ের মাঠ পর্যন্ত। নানা জায়গায় শোভাযাত্রাগুলির উপর নানা ধরনের আক্রমণও হলো। মূল বক্তা ছিলেন সোহরাওয়ার্দী সাহেব। তিনি সকলকে শান্ত থাকতে যেমন বললেন তেমনি দ্রুত বাড়িঘরে ফিরে যেতে বললেন।

এদিকে মুজিবুরদের ছয় ভাই-বোনের মধ্যে পাঁচ ভাই তখন কলকাতায়। তিনি এদের জন্যও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে পুরোপুরিভাবে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষ মারা গেলেন। দাঙ্গার আগুন নেভাতে এবং মানুষকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুজিবুর। মুসলিম সম্প্রদায়ের আক্রান্ত মানুষরা সে সময় আশ্রয় নিয়েছিল মুসলিম লীগ অফিস, ইসলামিয়া কলেজ, কলকাতা মাদ্রাসা, বেকার হোস্টেল, ইলিয়ট হোস্টেল, টেইলর হোস্টেল ইত্যাদি স্থানে। শুধু আশ্রয় দিলেই তো চলবে না, শরণার্থীদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। মুজিবুর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শহীদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বেশ কয়েক বস্তা চাল জোগাড় করে ঠেলায় করে ঠেলতে ঠেলতে বেকার হোস্টেল, ইলিয়ট হোস্টেলে চাল পৌঁছে দিলেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি গাড়ি করে কয়েক বস্তা চাল পৌঁছে দিয়েছিলেন কারমাইকেল হোস্টেলে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কদিন তিনি কলকাতা শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন নেভানোর কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যেও যে মেলবন্ধন হয় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে ৪৬-এর দাঙ্গায়। এই বিষয়টি বলতে গিয়ে মুজিবুর তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বলেছেন–

"একটা কথা সত্য, অনেক হিন্দু মুসলমানদের রক্ষা করতে যেয়ে বিপদে পড়েছে। জীবনও হারিয়েছে। আবার অনেক মুসলমান হিন্দু পাড়া-পড়শীকে রক্ষা করতে যেয়ে জীবন দিয়েছে। আমি নিজেই এর প্রমাণ পেয়েছি। মুসলিম লীগ অফিসে যেসব টেলিফোন আসতো তার মধ্যে বহু টেলিফোন হিন্দুরাই করেছে। তাদের বাড়িতে মুসলমানদের আশ্রয় দিয়েছে। শীঘ্রই এদের নিয়ে যেতে বলেছে, নতুবা এরাও মরবে, আশ্রিত মুসলমানরাও মরবে।"

কলকাতার আগুন নিভিয়ে গেলেন পাটনার আগুন নেভাতে

কলকাতার দাঙ্গা বন্ধ হতে না হতেই নোয়াখালী জেলায় শুরু হয়ে গিয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। নোয়াখালীতে মূলত মুসলমানদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। মুসলমানরাই সেখানে হিন্দুদের বাড়িঘর লুট করল এবং আগুন লাগিয়ে দেয়। ঠিক একই সঙ্গে বিহারেও শুরু হয়ে যায় ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সেখানে বেশিরভাগ আক্রান্ত হয়েছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়। বিহারে দাঙ্গা শুরু হওয়ার তিন দিনের মধ্যে মুজিবুর পাটনা পৌঁছে গিয়েছিলেন। সঙ্গী হিসেবে গিয়েছিলেন জহিরুদ্দিন এবং নূরুদ্দিন। পাটনাতেও মুজিবুরের জীবন বিপন্ন হতে পারত। মুজিবুররা পাটনাতে গিয়ে কোথায় উঠবেন তাও জানা ছিল না। শেষ পর্যন্ত বিহার সরকারের এক মন্ত্রী ইউনুস সাহেবের গ্রান্ড হোটেলে গিয়ে উঠলেন তাঁরা। এই হোটেলেই বেঙ্গল মুসলিম লীগের তরফে মাওলানা রাগীব আহসান সাহেব একটি অফিস খুলেছেন।

বিহার সরকারের এক আই. সি. এস. অফিসার জনাব আকমল সাহেবকে দৃঢ়ভাবে মুজিব বললেন, বাংলার প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব বলে দিয়েছেন, ট্রেন ভরে যদি সরকার শরণার্থীদের আসানসোল পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে তাহলে বাংলার সরকার তাদের দায়িত্ব নিতে রাজি আছে। মুজিবুরের এই কথা শুনে বিহার সরকার ঐ দিন থেকেই শরণার্থীদের আসানসোল পর্যন্ত পাঠাতে শুরু করেন। পাটনার এই দাঙ্গায় সেদিন কলকাতা থেকে ছাত্র, ডাক্তার ন্যাশনাল গার্ড মিলে প্রায় এক হাজার লোক পাটনায় গিয়েছিল দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে।

শেষ পর্যন্ত মুজিবুর নিজেই একটি ট্রেনে কয়েক হাজার দুর্গত মানুষ নিয়ে আসানসোল পর্যন্ত আসেন। আসানসোলে আগে থেকেই শরণার্থীদের গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন আসানসোলের মুসলিম লীগ নেতা মওলানা ইয়াসিন সাহেব। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সব ব্যবস্থাই করলেন শরণার্থীদের জন্য। আসানসোলে দুটি ক্যাম্প খোলা হয়েছিল। একটি ক্যাম্প-এর নাম ছিল 'নিগাহ' এবং অন্যটির নাম হিজরতগঞ্জ। এই হিজরতগঞ্জ ক্যাম্পটির নাম মুজিবুর নিজেই দিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে মুজিবুর আসানসোলে একটি হাসপাতাল গড়ে তোলেন। এই হাসপাতালে শরণার্থীদের চিকিৎসা করেছিলেন

ময়মনসিংহের চিকিৎসক ডা. আব্দুল হামিদ এবং গফরগাঁওয়ের ডা. হজরত আলি।

পরবর্তীকালে আসানসোলেই আরো দুটি ক্যাম্প খুলতে হয়েছিল মনরা ও মাধাইগঞ্জে। শেখ মুজিবুর রহমান এই প্রতিটি ক্যাম্পেই জনকল্যাণ কাজ করতে শুরু করেন। জনগণের সেবায় সারাদিন শুধু কাজ আর কাজ। ক্যাম্পেই খাওয়া-দাওয়া করতেন মুজিবুর। থাকতেন ক্যাম্পের পাশেই। সরকারের লোকদের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রাখতেন। প্রায় দেড় মাস পাটনা এবং আসানসোলে কাটিয়ে মুজিবুর এলেন কলকাতা। এই দেড় মাস অনিদ্রা, অনিয়ম ইত্যাদি কারণে তাঁর শরীর খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কলকাতা ফিরে তাঁর অসুস্থতা আরো বেড়ে গিয়েছিল।

বি. এ. পাস করলেন শপথ নিয়ে

প্রায় দু' মাস দাঙ্গাবিধ্বস্ত মানুষের পাশে থেকে, তাদের নিরাপত্তা, খাদ্যের যোগান এবং অন্যান্য সমস্যার সমাধান করতে করতে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েন মুজিব। প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে বেকার হোস্টেলে কাটালেন কয়েকটি দিন। তাঁর শরীর এতই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি প্রায় পনেরো দিন ছিলেন হাসপাতালে। মুজিবুর তখন ছাব্বিশ বছরের যুবক। নানা ধরনের ঝামেলা, রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন বলে তাঁর বি. এ. পরীক্ষায় সময়মতো বসাই আর হচ্ছিল না। এবার তিনি মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলেন যে, বি. এ. পরীক্ষাতে বসবেনই। কিন্তু বিধি বাম। এমন অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারছিলেন না।

বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সাহেব এই ছাত্র যুব নেতাটিকে যে কত ভালোবাসতেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল মুজিবুর অসুস্থ হওয়াতে। তিনি যখনই শুনলেন যে বেকার হোস্টেলে মুজিবুর অসুস্থ তখনই নির্দেশ পাঠালেন তাঁকে যেন কলকাতার ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিনের ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডে ভর্তি করানো হয়। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে হাসপাতালে এ খবর এলো শেখ মুজিবুর রহমানের নামে যেন একটি সিট বুক করা হয়। মুজিবুর এত কথা জানতেন না। কলেজের অধ্যক্ষ যখন দু' দিন পরই তাকে দেখতে আসলেন তখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। পরে জেনেছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সাহেব নিয়মিত অধ্যক্ষকে ফোন করে মুজিবুরের খোঁজ নিয়েছিলেন। দিন পনেরো পর মুজিবুর সুস্থ হয়ে হোস্টেলে ফিরে এসেছিলেন।

আর সময় নষ্ট করতে চাইলেন না। এবার যে করেই হোক পরীক্ষায় তিনি বসবেনই। দেখা করলেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. জুবেরীর সঙ্গে। তিনি মুজিবুরকে বলেছিলেন–

"তুমি যথেষ্ট কাজ করেছো পাকিস্তান অর্জন করার জন্য। তোমাকে আমি বাধা দিতে চাই না। তুমি যদি ওয়াদা করো যে, এই কয়েক মাস লেখাপড়া করবা এবং কলকাতা ছেড়ে বাইরে কোথাও চলে যাবা এবং ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বেই এসে পরীক্ষা দিবা তাহলে তোমাকে আমি অনুমতি দিব।" তিনি যখন মুজিবুরকে এই কথাগুলি বলছিলেন তখন তাঁর ঘরে বসা ছিলেন প্রফেসর তাহের জামিন, প্রফেসর সাইদুর রহমান এবং প্রফেসর নাজির আহমেদ।

মুজিবুর তাঁদের সামনে ওয়াদা করেছিলেন যে মন দিয়ে পড়াশুনা করে পরীক্ষায় বসবেন।

অধ্যক্ষের কথামতো মুজিবুর বইপত্র নিয়ে শাহাদাত হোসেন নামে তাঁর এক বাল্যবন্ধু এবং সহপাঠীর বাড়িতে চলে গেলেন। তাঁর বাড়িতে বসেই কিছুদিন মন দিয়ে পড়াশুনা করেন। পরীক্ষার ঠিক কয়েক দিন পূর্বেই চলে এলেন কলকাতা। বেকার হোস্টেলে তিনি আর উঠলেন না। কেননা তা ছেড়ে দিয়েছেন বেশ কয়েক দিন আগেই। উঠলেন পার্ক সার্কাসে। সেখানে মুজিবুরের ছোট বোনের স্বামী বরিশালের আইনজীবী আবদুর রব সেরনিয়াবাত থাকতেন। মুজিবুরের বোনও থাকতেন সেখানে। পরীক্ষার সময় মুজিবুরের সহধর্মিণী রেণুও সেখানে এসেছিলেন স্বামীকে সাহায্য করার জন্য। পরীক্ষা দিয়েছিলেন ভালোই। মাস তিনেক পর যখন ফল প্রকাশ হলো দেখা গেল মুজিবুর বি. এ. পাস করলেন অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে।

১৯৪৭ : বাংলা ভাগকে অন্তর থেকে মানতে পারেননি

১৯৪৬ সাল থেকেই ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছিল। দিল্লির মুসলিম লীগ নেতৃত্ব দেশ ভাগ সংক্রান্ত কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল। কিন্তু বাংলার মুসলিম লীগ নেতৃত্ব বহু বিষয়ে ছিল অন্ধকারে। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগকে নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। এ নিয়ে জটিলতা যেমন হয়েছিল তেমনি জল ঘোলা হয়েছিল অনেক। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাস। শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে বড়লাট লর্ড ওয়েভেনের দীর্ঘ আলোচনা হয়। শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগের পক্ষে পাঁচজন সদস্য এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দেন। এঁরা হলেন লিয়াকত আলী খান, আই আই চুন্দ্রিগড়, আবদুর রব নিশতার, রাজা গজনফর আলী খান এবং যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল।

এলো ১৯৪৭ সালের জুন মাস। ব্রিটিশ সরকার দিল্লিতে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে দেশকে ভাগ করার যে গভীর চক্রান্ত করছে তা বাংলার মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ স্পষ্ট করে বুঝে উঠতে পারেননি। বিশেষ করে পাঞ্জাব এবং বাংলার উপর দিয়ে যে ছুরি চালানো হবে সেটা অনেকের মতোই সেদিন মুজিবুরও আঁচ করতে পারেননি। যখন ঘোষণা করা হলো যে বাংলাকে ভাগ করা হবে, মুজিবুর তখন তীব্র ক্ষোভ এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। মওলানা আকরম খাঁ সাহেব এবং মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করলেন। প্রকৃত সত্য এটাই ছিল যে, বাংলা যে ভাগ হবে তা বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ এবং পাঞ্জাব ভাগের সিদ্ধান্তকে নত মস্তকে মেনে নিয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান গঠনের পক্ষে ছিলেন বটে, কিন্তু বাংলাকে দু' ভাগ করে একটা ভাগ পাকিস্তানে যাবে তা কিন্তু অন্তর থেকে মেনে নিতে পারেননি। খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব ১৯৪৭ সালের ১১ এপ্রিল ঘোষণা করেছিলেন "যুক্ত বাংলা হলে হিন্দু মুসলমানের মঙ্গলই হবে।" মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরাম খাঁ সাহেব বলেছিলেন : "আমার রক্তের উপর দিয়ে বাংলাদেশ ভাগ হবে। আমার জীবন থাকতে বাংলাদেশ ভাগ করতে দেব না।" এদিকে মুজিবুরও কলকাতা শহরটাকে এত বেশি ভালোবেসে ফেলেছিলেন যে, কলকাতা থেকে তাঁকে চলে আসতে হবে এটা যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। অথচ দেশ ভাগ হলো। জিন্নাহ সাহেব হলেন পাকিস্তানের গভর্নর।

সিলেটের গণভোটে শেখ মুজিবুর রহমান

দেশ ভাগ হলো। তৈরি হলো পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তান। লোকসংখ্যায় অনেক এগিয়ে রইল পূর্ব পাকিস্তান। কিন্তু পাকিস্তান তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিল জঘন্যতম চক্রান্ত। এই চক্রান্তের মূল কারণ হলো সোহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রখর ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ রাজনৈতিক জ্ঞান, বিচক্ষণতা কর্মক্ষমতা ইত্যাদি। অসংখ্য মানুষের ধারণা ছিল এই যে, বাংলার প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী হবেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। শহীদ সাহেবের বিরুদ্ধে এই চক্রান্তের মূল কথাই ছিল নাজিমুদ্দীন সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করা। দিল্লিতে যেমন এই ষড়যন্ত্র হয়েছিল তেমনি ষড়যন্ত্র হয়েছিল কলকাতাতে। এই ষড়যন্ত্রের পেছনে যেমন কংগ্রেস ছিল তেমনি ছিল মুসলিম লীগ।

এই রকম একটা পরিস্থিতিতে দিল্লি থেকে নির্দেশ এলো যে, বাংলাদেশে পুনরায় নেতা নির্বাচন করতে হবে। যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছিল যে, তিনি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাই পূর্ববঙ্গের বা পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে গেলে তাকে পুনরায় নেতা হিসেবে মনোনীত বা নির্বাচিত হতে হবে। যদিও লিয়াকত আলী খান ভারতবর্ষের মানুষ হয়েও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন বা নবাব সামদোত পূর্ব পাঞ্জাবের লোক হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী হতে কোনো বাধা নেই। ঠিক এই সময়েই এলো সিলেটের গণভোট। সিলেট কোন দিকে যাবে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব সিলেটকে হাতছাড়া করতে চাইলেন না। তিনি মুজিবুরকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন সিলেট। এই গণভোটে মুজিবুর যখন ব্যস্ত তখন সোহরাওয়ার্দী সাহেবও করিমগঞ্জ এসেছিলেন নির্বাচনী বক্তব্য রাখার জন্য। করিমগঞ্জের ঐ জনসভায় সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে মুজিবুরও বক্তব্য রেখেছিলেন। এই সময় মুজিবুরের সহযোগী হিসেবে ছিলেন মওলানা তর্কবাগীশ, ইত্তেফাকের সম্পাদক মানিক ভাই, ফজলুল হক প্রমুখ। শামসুল হক সাহেবও ঢাকা থেকে বহু কর্মী নিয়ে সিলেটে গিয়েছিলেন। এই গণভোটে শহীদ সাহেবকে সবচাইতে বেশি সাহায্য করেছিলেন দানবীর রায়বাহাদুর আর. পি. সাহা। তিনি ছিলেন শহীদ সাহেবের ব্যক্তিগত বন্ধু। তিনি বেশ কয়েকটি লঞ্চ সেদিন সিলেটে পাঠিয়েছিলেন। নির্বাচনী কাজে সাহায্য করার জন্য। গণভোটে

সিদ্ধান্ত হয় যে, সিলেট থাকবে পূর্ব বাংলাতে। যদিও গণভোটে পাস হওয়া সত্ত্বেও সিলেটের করিমগঞ্জ জেলাটি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যদিকে মুসলিম অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও নদীয়ার কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দিনাজপুর-বালুরঘাট ইত্যাদি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এদিকে দেশভাগের পর 'মিল্লাত' পত্রিকার প্রেসটিকে বিক্রি করে দিতে চেয়েছিলেন হাশিম সাহেব। মুজিবুর রহমান তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলিম লীগের মুখপত্র 'মিল্লাত' বিক্রি রুখে দিলেন এবং পত্রিকার প্রেসটিকে কলকাতা থেকে এনে ঢাকার লীগ অফিসে ১৫০ নম্বর মুগলটুলিতে বসান।

ব্যারাকপুরে গান্ধিজি মুজিবুরকে আপেল দিলেন খেতে

দেশ ভাগ হয়ে গেল। হলো হিন্দুস্তান, পাকিস্তান। মুজিবুরের মন কিন্তু পড়ে রইল কলকাতাতেই। কেননা গত বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি কলকাতাতেই ছিলেন। অসংখ্য স্মৃতি তাঁর কলকাতাতে। ইসলামিয়া কলেজ, বেকার হোস্টেল থেকে সর্বত্র। এই সময়ে তিনি প্রায় রোজ দিনই যাচ্ছেন শহীদ সাহেবের বাড়ি। মাঝেমধ্যে শহীদ সাহেবের সঙ্গে কোনো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সভায়। এছাড়াও বিশেষ বিশেষ স্থানে তিনি যাচ্ছিলেন শহীদ সাহেবের সঙ্গে। এই সয়ে মহাত্মা গান্ধী এসেছিলেন কলকাতাতে। শান্তির বার্তা, অহিংসার বার্তা নিয়ে তিনি এসেছিলেন। যাতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনোরকম দাঙ্গা সৃষ্টি না হয় সেই আবেদন নিয়েই তিনি এসেছিলেন।

সেদিন ছিল রবিবার। সোহরাওয়ার্দী সাহেব মুজিবুরকে বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে ব্যারাকপুরে যাওয়ার জন্য। কারণ তখনো গোলমাল চলছিল। শহীদ সাহেব মুজিবুরকে বলেছিলেন মহাত্মা গান্ধীরও ব্যারাকপুরে যাওয়ার কথা রয়েছে। মুজিবুর শহীদ সাহেবের প্রস্তাব শুনে দ্রুত প্রস্তুত হয়ে গেলেন। শহীদ সাহেবের গাড়ি করে প্রথমে এলেন নারাকেলডাঙ্গা। সেখানেই ছিলেন গান্ধিজি, মনু গান্ধী, আভা গান্ধী ও তাঁর সেক্রেটারি। কংগ্রেস দলের কিছু নেতাও ছিলেন সঙ্গে। সকলে মিলে গেলেন ব্যারাকপুর। ব্যারাকপুরে সেদিন গান্ধিজিকে স্বাগত জানানোর জন্য ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছিল। জনসমাবেশেরও ব্যবস্থা হয়েছিল। সেদিন ছিল রবিবার। গান্ধিজি ছিলেন মৌন। গান্ধিজি তাঁর বক্তৃতাটি লিখে দিলেন। সমবেত জনতার উদ্দেশ্য সেই বক্তৃতাটি পাঠ করে শোনানো হলো।

সমাবেশে আওয়াজ উঠল হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই। কয়েক দিন পরেই ছিল ঈদের নামাজ। মুসলমানরা ছিলেন ভয়ের মধ্যে। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে মুজিবুর লিখেছেন–

"মহাত্মাজী ঘোষণা করলেন, যদি দাঙ্গা হয় এবং মুসলমানদের উপর কেউ অত্যাচার করে তবে তিনি অনশন করবেন। মহল্লায় মহল্লায় বিশেষ করে হিন্দি ভাষাভাষী লোকেরা শোভাযাত্রা বার করে শ্লোগান দিতে লাগলো মুসলমানকে মাত মারো, বাপুজী অনশন করে গা। হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই।"

মুজিবুরের সঙ্গে সেই সময় ইয়াকুব নামে একজন ফটোগ্রাফার বন্ধু ছিলেন। তাঁরা দুজনে মিলে ঠিক করলেন বিহারের দাঙ্গাবিধ্বস্ত কিছু ভয়ংকর ছবি একটি প্যাকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে গান্ধিজিকে উপহার দেবেন। নারকেলডাঙ্গায় দুজনে মিলে গিয়ে সেই ছবির প্যাকেটটি তাঁকে উপহার দিলেন। গান্ধিজিও কুশল বিনিময় করে দুজনকে দুটি আপেল খেতে দিলেন। গন্ধিজিও হাসিমুখে প্যাকেটটি গ্রহণ করলেন। এর কয়েক দিন পরেই মুজিবুর কলকাতা ছেড়ে চলে আসেন।

গণতান্ত্রিক যুবলীগ : পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবুরের প্রথম সংগঠন

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস। অশ্রুসজলচিত্তে পাকাপাকিভাবে মুজিবুর কলকাতা থেকে চলে এলেন ঢাকাতে। ঢাকার রাস্তাঘাট তাঁর ভালো করে জানা ছিল না। ঢাকাতে এসে তিনি প্রথম উঠলেন ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে। এটাই ঢাকার মুসলিম লীগ অফিস। এই অফিসেই থাকেন মুসলিম লীগের পুরনো দুই কর্মী শওকত মিয়া এবং শামসুল হক সাহেব। দেশভাগ-উত্তর পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগ কর্মীদের কী করা উচিত এ নিয়ে কতাবার্তা বলার জন্য শওকত সাহেব এবং শামসুল হক সাহেব মুসলিম লীগের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। ঠিক হলো সম্মেলন হবে ঢাকা মিউনিস্টিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাসানাত সাহেবের বাড়িতে।

এই সম্মেলনেই মুজিবুর প্রস্তাব দিলেন যে, তরুণ এবং যুব কর্মীরা যাতে ছত্রভঙ্গ হয়ে না যায় সে জন্য একটি যুব সংগঠন করা উচিত। তিনি বলেছিলেন, এটা কোনো রাজনৈতিক সংগঠন নয়। এই যুব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক না রাখাই উচিত। এককথায় এই প্রতিষ্ঠানটি একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা হিসেবেই কাজ করবে। সম্মেলনে বক্তব্য রেখেছিলেন মোট পাঁচজন। এঁরা হলেন শামসুল হক সাহেব, শওকত সাহেব, জনাব আতাউর রহমান, কামরুদ্দিন সাহেব এবং শেখ মুজিবুর রহমান।

সম্মেলন থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে, যার নাম হবে 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ'। যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাজনীতির খুব একটি সম্পর্ক থাকবে না। এই নতুন সংগঠনের কাজকর্ম বা নতুন কর্মসূচি কী হবে এই নিয়ে সম্মেলনে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বলেন, নতুন সংগঠনটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মেলবন্ধন গড়ে তোলার জন্য কাজ করবে। বিশেষ করে হিন্দুরা যাতে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে না যায় সে জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজনকে বোঝাতে হবে।

নতুন সংগঠন গণতান্ত্রিক যুবলীগে বেশ কয়েকজন কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন সদস্য ছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন যে, নতুন সংগঠনটিতে অর্থনৈতিক কর্মসূচি থাকা প্রয়োজন। শেখ মুজিবুর তখন তাঁদের বুঝিয়েছিলেন যে, দেশ স্বাধীন

স্মরণীয় ঘটনা–৫

হয়েছে মাত্র দু' মাস হলো। এরই মধ্যে যদি অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তাহলে জনগণ এই সংগঠনকে বিশ্বাস এবং পছন্দ কোনোটাই করবে না। সকলেই শেষ পর্যন্ত মুজিবুরকেই সমর্থন জানালেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা বিষয়ক কাজকর্ম করার মধ্য দিয়ে কলকাতার মধ্যেই ঢাকাতেও ধীরে ধীরে মুজিবুর পরিচিত এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন আইন পড়ার জন্য

এই সময় সোহরাওয়ার্দী সাহেবও তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচি অব্যাহত রাখলেন। তিনি ইতিমধ্যেই পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লি, জয়পুর, আলোয়ার ইত্যাদি স্থান ঘুরে কলকাতা ফিরেছেন। তাঁর কর্মসূচি তখন মূলত ছিল একটাই। কী করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দীর্ঘদিনের সম্প্রীতি এবং মেলবন্ধনকে টিকিয়ে রাখা যায়। কারণ দেশের বহু স্থানেই চলছে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। সেই সময় সোহরাওয়ার্দী সাহেবই ছিলেন একমাত্র নেতা, যার গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা ছিল প্রশ্নাতীত। এই সময় মুজিবুরও ঢাকা থেকে কলকাতায় এলেন। কলকাতাতে এসেই তিনি দেখা করলেন শহীদ সাহেবের সঙ্গে। অনেক দিন পর মুজিবুরকে দেখে তিনি দারুণ খুশি হলেন। এই সময় তিনি মুজিবুরকে বলেছিলেন–

"সত্যিই পূর্ব বাংলার মুসলমানরা কত সভ্য ও ভালো, কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা হচ্ছে না। তবে হিন্দুরা চলে আসছে, এরাই বিপদ ঘটাবে। আমি শীঘ্রই যাব পূর্ব বাংলায় এবং কয়েকটা সভা করব, যাতে হিন্দুরা না আসে।"

ঠিক এমন সময়ই শহীদ সাহেবের কর্মসূচি ঠিক হলো বরিশাল শহরে। বরিশালে আয়োজিত হলো একটি বড় জনসভা। কংগ্রেস দলের পক্ষে জননেতা প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ উপস্থিত ছিলেন এই সভায়। এই সভাতে শেখ মুজিবুর রহমানও বক্তব্য রেখেছিলেন। এই জনসভাতেই তিনি খবর পেয়েছিলেন যে, তাঁর পিতা মারাত্মকভাবে অসুস্থ। শহীদ সাহেব মুজিবুরের পিতার অসুস্থতার খবর পেয়ে মুজিবুরকে জনসভা থেকেই দ্রুত বাড়িতে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুজিবুর দ্রুত চলে এলেন স্টিমার ঘাটে। এসে দেখেন স্টিমার ছাড়ার জন্য প্রস্তুত। এই স্টিমারটিতে উঠতে না পারলে মুজিবুরকে পরের দিন যেতে হতো। যাই হোক সারা রাত মুজিবুর স্টিমারে বসে বসে শুধু ভেবেছিলেন তাঁর পিতার কথা, সংসারের কথা। একধরনের অপরাধবোধও কাজ করছিল তাঁর মনে। কারণ বাড়ির বড়ো ছেলে হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোনোদিনই সংসারের জন্য কোনো দায়িত্ব পালন করেন নাই। ভোরবেলা স্টিমার এসে পৌঁছাল পাটগাতি স্টেশনে। মালপত্র স্টেশন মাস্টারের কাছে রেখে মুজিবুর হেঁটেই রওয়ানা হলেন। মাঝখানে মধুমতী নদী

পার হয়ে মাঠের উপর দিয়ে তিনি সোজা বাড়ি গিয়ে পৌঁছলেন। সেই সময় তাঁর পিতার কলেরা হয়েছিল। ডাক্তাররা আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। সন্তানকে কাছে পেয়ে তিনি যেন পুনর্জীবন লাভ করলেন। বাড়িতে মুজিবুর এই যাত্রায় ছিলেন কিছুদিন। পরে ঢাকাতে আসেন আইন পড়বেন বলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিনে নিলেন আইনের কিছু বই-পুস্তক।

গড়ে তুললেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ

এই সময় গণতান্ত্রিক যুবলীগের নেতৃত্ব থেকে চক্রান্ত করে মুজিবুরকে সরানোর চেষ্টা হয়। দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য থাকায় শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক যুবলীগ থেকে মুজিবুর নিজেকে সরিয়ে আনলেন। এই সময় থেকেই তিনি ঢাকাতে স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করেন। ঢাকায় চলতে গেলে প্রতি মাসে খরচাপাতি যথেষ্ট। মুজিবুরের বয়স তিরিশের কাছাকাছি। এই বয়সে বাড়ি থেকে তাঁর অর্থ আনা উচিত নয় ভেবে তিনি কিছুদিন সাংবাদিকতাও করেন ইত্তেহাদ কাগজে। তিনি ছিলেন ইত্তেহাদ কাগজের পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি। মাসে পেতেন প্রায় তিনশ' টাকা।

এই সময় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ-এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। এর পূর্ব নেতৃত্বকে আর মানতে চাইলেন না মুজিবুর ও তাঁর সহযোগীরা। এই সময় মুজিবুরের সহযোগী হিসেবে ছিলেন আজিজ আহমেদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, আলি আহাদ, আবদুল হামিদ চৌধুরী, দবিরুল ইসলাম, নইমউদ্দিন, মোল্লা জালালউদ্দিন, আবদুর রহমান চৌধুরী, আবদুল মতিন খান চৌধুরী, সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ আরো অনেক।

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি। সকলের সঙ্গে আলোচনা করে মুজিবুর একটি সভা আহ্বান করেন–ফজলুল হক মুসলিম হলের এ্যাসেম্বলি হলে। এই সভাতেই স্থির হলো যে একটি ছাত্র সংগঠন তৈরি করা হবে। এর নাম হবে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। আহ্বায়ক করা হলো নইমউদ্দিনকে। সংগঠনের নামের মধ্যে মুসলিম শব্দটি না রাখার পক্ষে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেন। এর উত্তরে মুজিবুর বলেন–

"এখনও সময় আসে নাই। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও দেশের আবহাওয়া চিন্তা করতে হবে। নামে কিছুই আসে যায় না। আদর্শ যদি ঠিক থাকে। তবে নাম পরিবর্তন করতে বেশি সময় লাগবে না। কয়েক মাস হলো পাকিস্তান পেয়েছি। যে আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান পেয়েছি, সেই মানসিক অবস্থা থেকে জনগণ ও শিক্ষিত সমাজের মত পরিবর্তন করতে সময় লাগবে।"

১৫০ নম্বর মোগলটুলীতেই সংগঠনের অফিস করা হলো। এই অফিস করতে গিয়েও মুজিবুরদের সমস্যা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে মুজিবুরকে যিনি সবচাইতে বেশি সাহায্য করেছিলেন তিনি হলেন শওকত মিয়া। ঢাকাতে মুজিবুরের থাকার জায়গা ছিল না। শওকত মিয়ার তত্ত্বাবধানে তিনি এই

মোগলটুলীতেই থাকতে শুরু করেন। এই নতুন ছাত্র সংগঠনটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছাত্রদের মধ্যে বিরাট সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। মুজিবুর পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই এই নতুন ছাত্র সংগঠনটি গড়ে তোলেন। পূর্ব পাকিস্তানের সরকার নতুন এই ছাত্র সংগঠনটিকে ভালো মনে গ্রহণ করতে পারেনি। বরং তারা পৃষ্ঠপোষকতা করত নিখিল পূর্ব পকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগকে।

এদিকে খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড ভেঙে দেওয়ার কথা বললেন। এতে দেশব্যাপী তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। তখন মুজিবুর সহযোগী জহিরুদ্দিন এদের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তাদের নিয়ে সংগ্রাম করতে উদ্যোগী হলেন। তখন সরকার ঐ মোগলটুলী অফিস থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে। নতুন এই পূর্ব পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কী খুবই স্পষ্টভাবে অনুভব করলেন মুজিবুর। মাস দুয়েক পর মুক্তি পেয়েছিলেন জহিরুদ্দিন। ন্যাশনাল গার্ড এবং মুসলিম লীগ কর্মীরা দেশের জন্য যে অবদান রেখেছেন তা আসলে জাতীয় নেতারা বুঝতে পারেন নাই। একেবারে সূচনাতে পূর্ব পাকিস্তানের শাসকবর্গের চরিত্র এবং দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুজিবুর বললেন–

"যাদের কাছে ক্ষমতা এল তারা জনসাধারণের উপর আস্থা রাখতে পারেন নাই। কারণ জনসাধারণের সাথে এদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। যে কয়েকজন লোক এদেশের শাসন ক্ষমতা হাতে পেলেন, তারা সকলই প্রায় ইংরেজি ঘেঁষা নেতা ছিলেন। ইংরেজকে তেল দিয়ে স্যার, খান বাহাদুর, খান সাহেব উপাধি নিয়েছেন। এরা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে শুরু করলেন ইংরেজ আমলের আমলাতন্ত্রের উপর।"

এদিকে মুসলিম লীগের অবস্থা হলো আরো শোচনীয়। দেশভাগের পর মুসলিম লীগও ভাগও হয়ে গেল। ভারতবর্ষ মুসলিম লীগের নাম হলো নিখিল ভারত মুসলিম লীগ। অন্যদিকে 'পাকিস্তান মুসলিম লীগ'। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যেহেতু পাকিস্তানের বড়লাট হয়ে গেলেন সেহেতু তিনি মুসলিম লীগের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন। দায়িত্ব গ্রহণ করলেন চৌধুরী খালিকুজ্জামান সাহেব। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম লীগকে ভেঙে দিয়ে একটি এডহক কমিটি গঠন করেন। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ভেঙে দেওয়ার বড় কারণ ছিল সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সমর্থকদের কোণঠাসা করা এবং নাজিমুদ্দীন সাহেবের সমর্থকদের নিয়ে মুসলিম লীগ গঠন করা। সেই সময় চিফ অর্গানাইজার করা হয়েছিল মওলানা আকরাম খাঁ সাহেবকে। এভাবেই খুব কৌশলে শেখ মুজিবুর রহমানদেরকে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ থেকে বিতাড়িত করা হলো।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ : ভাষা আন্দোলনে গ্রেপ্তার বরণ

পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৮ সালের প্রথম দিক থেকেই বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান গঠনের ছয় মাসের মধ্যেই যে পূর্ব বাংলার বা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বৃহত্তর সংগ্রামে সামিল হতে হবে তা মুজিবুররা বুঝতে পারেননি। ১৯৪৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি করাচিতে বসেছিল পাকিস্তান সংবিধান সভার বৈঠক। সেই বৈঠকে ভাষা ছিল অন্যতম এজেন্ডা। সেখানে দেখা গেল যে, মুসলিম লীগ সদস্যরা উর্দু ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী। অথচ সেই সময়ে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা কিন্তু ছিল বাংলা। করাচিতে সেই সভায় কুমিল্লা জেলা থেকে কংগ্রেসের নির্বাচিত সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই সভায় স্পষ্ট করে দাবি করলেন যে, বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা করা হউক। কেননা সমগ্র পাকিস্তানে বাংলা ভাষাতেই সবচাইতে বেশি মানুষ কথা বলেন। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয়ের এই প্রস্তাব বা দাবি কিছুতেই সেদিন মানতে চাননি মুসলিম লীগ সদস্যরা।

তখন থেকেই বাংলা ভাষাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার একটা জঘন্য চক্রান্ত পাকিস্তানে শুরু হয়েছিল। মুজিবুরের হাতে সৃষ্ট ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এই চক্রান্তকে ধরতে পারে এবং প্রথম থেকেই এর প্রতিবাদে শামিল হয়। এই সংগঠন দাবি করে যে, কোনো একটি ভাষা নয়, উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। মুজিবুর অনুভব করলেন যে, অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে অতি দ্রুত আন্দোলন শুরু করা উচিত। তৈরি করা হলো 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ'। সহযোগী সংগঠন হিসেবে ছিল তমদ্দুন মজলিস নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা। এই সংগঠনের নেতা ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাশেম সাহেব। মুজিবুরের নেতৃত্বে যখন লড়াই সংগ্রামের একটা ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছিল তখন পুরনো লীগ কর্মীদের পক্ষ থেকে অনেক নেতা-কর্মী মুজিবুরের সংগঠনে এসে যোগ দিলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শামসুল হক সাহেব এবং কামরুদ্দিন সাহেব। সিদ্ধান্ত হলো ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ দিবসটি উদ্‌যাপিত হবে 'বাংলা ভাষা দাবি' দিবস হিসেবে।

মুজিবুরের হাতে সময় বেশি ছিল না। তিনি দ্রুত জেলাগুলিতে সফর করতে শুরু করলেন। বিশেষ করে ফরিদপুর, যশোর, দৌলতপুর, খুলনা এবং বরিশালে সভা করলেন মুজিবুর। দৌলতপুরে মুসলিম লীগ সমর্থকরা মুজিবুরের সভার উপর আক্রমণ করল। যদিও মুজিবুর অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে

প্রতিটি সভার কাজ শেষ করে দাবি দিবসের তিন দিন আগেই ঢাকা ফিরে এলেন।

এলো ১১ মার্চ। ঐদিন ভোরবেলা থেকেই পিকেটিং শুরু হলো। এর আগে প্রায় সমগ্র ঢাকা শহরেই করা হয়েছিল পোস্টারিং। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ কলেজ, মিটফোর্ড মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নব্বই শতাংশ ছাত্র সংগ্রামে যোগদান করল। পিকেটিং হলো ইডেন বিল্ডিং, জেনারেল পোস্ট অফিস ইত্যাদি স্থানে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব একটা পিকেটিং করার প্রয়োজন হয়নি। বেশিরভাগ দোকানপাটও ছিল বন্ধ। দু'দিন সকাল আটটাতেই জেনারেল পোস্ট অফিসের সামনে পিকেটিংরত ছাত্রদের উপর নির্বিচারে লাঠি চালায় নতুন সরকারের পুলিশ। সকাল নয়টায় লাঠিচার্জ হলো ইডেন বিল্ডিং-এর সামনে। শেখ মুজিবুরের উপরও পুলিশ লাঠি চালিয়েছে। ঐ সময় বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীকে গ্রেপ্তার করে ত্রিশ-চল্লিশ কিলোমিটার দূরে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল এবং বেশ কিছু ছাত্রকে জেলে পাঠিয়ে দিল। সেদিন শেখ মুজিবুর রহমানসহ প্রায় কয়েকটা ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ১১ মার্চের সংগ্রামে যারা আহত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন খালেক নেওয়াজ খান, শহর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ. ওয়াদুদ, কাজী গোলাম মাহাবুব, শওকত মিয়া, শামসুল হক এবং অবশ্যই শেখ মুজিবুর রহমান। এই ঘটনার প্রতিবাদে এর পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই শোভাযাত্রা বা বিক্ষোভ মিছিল বের হয়েছিল। বেশ কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল।

এই ঘটনার প্রতিবাদে সেদিন যারা মুখ খুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শেরে বাংলা, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, তোফাজ্জল আলী, ডা. মালেক, সবুর সাহেব, খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন প্রমুখ। আন্দোলন দিন দিন তীব্র হচ্ছে দেখে নাজিমুদ্দিন সাহেব কিছুটা ঘাবড়িয়ে গেলেন এবং সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করতে রাজি হলেন। মুজিবুর তখন জেলে ছিলেন বলে আলোচনায় অংশ নিতে পারলেন না। সেই সময় সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে কামরুদ্দিন সাহেব জেলে এসে মুজিবুরের সঙ্গে দেখা করে বললেন যে, নাজিমুদ্দীন সাহেব দাবিসমূহ মেনে নিতে রাজি হয়েছেন এবং এখনই পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাকে অফিশিয়াল ভাষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

এই সময় মুজিবুরদের রাখা হয়েছিল জেলখানার চার নম্বর ওয়ার্ডে। জেলখানাটি ছিল একটি তিনতলা বাড়ি। শেখ মুজিবুররা এই জেলে ছিলেন মোট পাঁচ দিন। ১৫ মার্চ তাঁদেরকে জেলখানা থেকে ছাড়া হয়েছিল। জেলখানার পাশেই ছিল একটি মুসলিম গার্লস স্কুল। এঁরা এই পাঁচ দিনই ছাদে উঠে স্লোগান দিয়েছিল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'।

১৯৪৮ সালের ১৬ মার্চ : ভাষা আন্দোলনে আহত মুজিবুর

পাঁচ দিন জেল খাটার পর ১৯৪৮ সালের ১৬ মার্চ মুজিবুরদের ছেড়ে দেয়া হলো। পরের দিন ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সাধারণ সভা আহ্বান করা হলো। মুজিবুর এই সভায় উপস্থিত হলে তাঁকে ঐ সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য তাঁর নাম প্রস্তাব হলো এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থিত হলো। সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিখ্যাত আমতলায়। আমতলায় এই প্রথম মুজিবুর কোনো সভায় সভাপতিত্ব করলেন। এই সভায় অনেক ছাত্রই বক্তৃতা করলেন। প্রত্যেক বক্তাই বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেবার ব্যাপারে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বললেন। একই সঙ্গে ছাত্রদের উপর পুলিশের জুলুমবাজির বিরুদ্ধে তদন্তের কথাও বলা হলো। কিন্তু খাজা নাজিমুদ্দীন সরকার মৌখিকভাবে তদন্তের যে আশ্বাস দিয়েছে তাতে প্রায় সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এর কারণ হলো খাজা নাজিমুদ্দীন একই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই সভা থেকেই সিদ্ধান্ত হলো যে, শোভাযাত্রা করেই দাবিসনদ পেশ করা হবে আইনসভার কাছে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শোভাযাত্রা করেই খাজা সাহেবের অফিসে দাবিসনদ পেশ করা হলো। মুজিবুর সকলকে এই অঞ্চল ত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু কিছু অতি-উৎসাহী ছাত্র যারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য এম. এল. এ.-দেরকে পদত্যাগ করার কথা বলছে অথবা দুই-একজন এম. এল. এ.-কে ধরে নিয়ে আসছে মুসলিম হলে। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে মুজিবুর আবার যখন আইনসভার দিকে গেলেন তখনই পুলিশ লাঠিচার্জ এবং কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করতে শুরু করে। এই সময়ে কাঁদানে গ্যাসের জন্য মুজিবুর শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এই সময়ে পুলিশের লাঠিচার্জ এবং কাঁদানে গ্যাসের জন্য বেশ কিছু ছাত্র আহত হয়, মুজিবুর যখন শুনলেন যে, শওকত মিয়াও আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তখন মুজিবুর শারীরিক অসুস্থতা নিয়েই হাসপাতালে গেলেন এবং গ্রেপ্তার এড়াতে সকলেই যেন একটু সুস্থ হলে হাসপাতাল ত্যাগ করেন সেই অনুরোধই করে এলেন। এই পরিস্থিতিতে বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন শুধু ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ রইল না। ফরিদপুর, যশোর, খুলনা দিনাজপুরেও আন্দোলন হলো এবং কয়েক শত ছাত্র গ্রেপ্তার বরণ করেন। এই সময়

থেকেই ছাত্রদের এই দাবির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সরকারি কর্মচারীবৃন্দ। অর্থাৎ কিছুদিনের মধ্যেই এই দাবি জনগণের একটি জরুরি দাবি হিসেবে পরিগণিত হয়।

মাতৃভাষা বাংলার জন্য এই সংগ্রাম প্রসঙ্গে মুজিবুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বলেছেন–

"বাংলা পাকিস্তানের শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ লোকের মাতৃভাষা। তাই বাংলাই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। তবুও আমরা বাংলা ও উর্দু দুইটা রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করেছিলাম। পাঞ্জাবের লোকেরা পাঞ্জাবী ভাষা বলে, সিন্ধুর লোকেরা সিন্ধি ভাষায় কথা বলে। সীমান্ত প্রদেশের লোকেরা পশতু ভাষায় কথা বলে, বেলুচরা বেলুচি ভাষায় কথা বলে। উর্দু পাকিস্তানের কোনো প্রদেশের ভাষা নয়। তবুও যদি পশ্চিম পাকিস্তানের ভায়েরা উর্দু ভাষার জন্য দাবি করে, আমরা আপত্তি করবো কেন? যারা উর্দু ভাষা সমর্থন করে তাদের একমাত্র যুক্তি হল উর্দু ইসলামিক ভাষা। উর্দু কি করে ইসলামিক ভাষা হল আমরা বুঝতে পারলাম না।"

১৯৪৮-এর ১৯ মার্চ : জিন্নাহ বললেন উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা

ভাষা নিয়ে এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যেই ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর তথা সর্বময় কর্তা জিন্নাহ সাহেব এলেন পূর্ব পাকিস্তানে। তাঁর বিমান এসে অবতরণ করেছিল তেজগাঁ বিমানবন্দরে। সেদিন খুব বৃষ্টি হয়েছিল। এই বৃষ্টির মধ্যেই মুজিবুর প্রায় পাঁচ শত ছাত্র নিয়ে বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিলেন জিন্নাহ সাহেবের বিমানের জন্য। তাঁর জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল ঘোড়ারদৌড়ের মাঠে। মুজিবুরসহ প্রায় সকল ছাত্রই সেদিন বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিলেন। এই ভেজা কাপড় নিয়েই মুজিবুরসহ এই কয়েক শত ছাত্র সেই জনসভায় গিয়েছিলেন জিন্নাহ সাহেবের কথা শোনার জন্য। সেই সভায় দাঁড়িয়ে জিন্নাহ সাহেব ঘোষণা দিলেন 'উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।' এই সভাতেই মুজিবুররা হাত তুলে এর প্রতিবাদ করেছিলেন। এই জনসভার পরেই তিনি গিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ দিতে। সেখানেও যখন তিনি একই মন্তব্য করেন তখন ছাত্ররা তাঁর সামনে বসেই চিৎকার করে বলেছিল, 'আমরা তা মানি না'। এই প্রথম বাংলার ছাত্ররা তার সামনে বসে এর প্রতিবাদ করে। এই প্রতিবাদ দেখে তিনি কিছুক্ষণ সময় বক্তৃতা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

অত্যন্ত স্পর্শকতার এই বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ আঁচ করতে পেরে জিন্নাহ সাহেব ছাত্রনেতাদের ডাকলেন তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য। এই সময় মুজিবুর বিভিন্ন স্থানে যে বক্তৃতাগুলি করেছেন তাতে তিনি বলেছেন–

"কোনো নেতা যদি অন্যায় কাজ করতে বলেন, তার প্রতিবাদ করা এবং তাকে বুঝিয়ে বলার অধিকার জনগণের আছে। বাংলা ভাষা শতকরা ছাপ্পান্নজন লোকের মাতৃভাষা, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সংখ্যাগুরুদের দাবি মানতেই হবে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাবো। তাতে যাই হোক না কেন, আমরা প্রস্তুত আছি।"

এইভাবেই সংগ্রাম পরিষদ এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল। বিশেষ করে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার স্লোগানে এই জনপ্রিয়তা দারুণভাবে বৃদ্ধি পায়। বাংলা ভাষাভাষী জনগণ দৃঢ়তার সঙ্গে এই দাবিকে সমর্থন জানাতে লাগলেন। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছতে লাগল যে, খাজা নাজিমুদ্দীন সরকারের এম. এল. এ.রাও অন্তর থেকে এই দাবিকে

সমর্থন জানাতে লাগলেন। যদিও প্রকাশ্যে তখনো জিন্নাহ সাহেবের বিরোধিতা করতে পারছিলেন না। এদিকে ছাত্র সংগঠন এবং ভাষা পরিষদ এই দুই সংগঠনের কর্মসূচিকে সামনে রেখে মুজিবুর সারা দেশব্যাপী পরিক্রম করতে শুরু করেন। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা যে প্রকৃত স্বাধীনতা নয় তা যেমন জনগণকে বোঝাতে লাগলেন তেমনি জনগণকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিতে আহ্বান জানান। ব্যক্তিগতভাবে মুজিবুর সমগ্র বাংলাদেশে একজন দেশপ্রেমিক ছাত্রনেতা বা জননেতা হিসেবে জনগণের কাছে সমাদৃত হতে লাগলেন।

তীব্র খাদ্য সংকট : ক্ষেত মজুরদের পাশে মুজিবুর

এই সময় অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি থেকেই ফরিদপুর, কুমিল্লা, ঢাকা ইত্যাদি জেলায় দেখা দিয়েছিল তীব্র খাদ্য সংকট। মূলত সরকারের কর্ডন প্রথা খাদ্য সংকটককে আরো তীব্র করে তুলেছিল। এই কর্ডন প্রথা অনুযায়ী এক জেলা থেকে অন্য জেলায় খাদ্যশস্য পাঠানো যেত না। সেই সময় ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার ক্ষেত মজুররা ধান কাটবার মৌসুমে চলে যেত খুলনা ও বরিশালে। এরা আসলে দিনমজুর। এরা কৃষকদের বা জমিদারদের ধান কেটে একেবারে ঘরে তুলে দিয়ে আসত সেই ধান। আসার সময় এই সব শ্রমিকরা ধানের একটা অংশ পেত। শ্রমিকরা সারা বছর আশায় আশায় থাকত। যাতে এই মৌসুমে তারা কাজ করতে পারে। এই সব কৃষি মজুরদের বলা হতো ধাওয়াল। শ্রমিকরা এক জেলা থেকে অন্য জেলায় নিজেদের নৌকা করেই যেত এবং আসার সময় নিজেদের নৌকা করেই তারা ধান নিয়ে বাড়ি ফিরে আসত। মাস দুই-একের জন্য তারা বাড়ির পরিবার-পরিজনদের কাছ থেকে দূরে অর্থাৎ অন্য জেলায় চলে যেত। ধান নিয়ে তবে বাড়ি ফিরত। এই দু' মাস যাতে তাদের সংসারটা কোনো রকমে চলে সে জন্য তারা মহাজনদের কাছ থেকে ধার-দেনা করত। ধান নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে তা শোধ করত। যে সমস্ত ক্ষেত মজুরের নৌকা ছিল না, তারাও একটা নৌকার ব্যবস্থা করত। এভাবেই চলে আসছে বহু বছর ধরে।

ঐ বছর ফরিদপুর, কুমিল্লা বা ঢাকা জেলার কৃষি শ্রমিকরা যখন অন্য জেলায় যায় তখন সরকার কোনো বাধা দেয় নাই। কিন্তু ধান নিয়ে যখন তারা বাড়ি যাচ্ছে তখনই বাধা দেওয়া হলো। ধান আটকে রেখে শ্রমিকদের চলে যেতে বলা হলো। অত্যন্ত মর্মান্তিক এই খবর যখন মুজিবুরের কাছে যায় তখন মুজিবুর আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না। কেননা শ্রমিকদের সন্তান-সন্ততিরা তাদের পিতার ঘরে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছে। মুজিবুর এই ঘটনার প্রতিবাদে সভা করলেন, সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু কোনো ফল হলো না। দুই মাস শরীরের রক্ত জল করে যে শ্রমিকরা খেটেছে তারা কার্যত খালি হাতে ফিরে গেল। জমিদারদের দেনা শোধ করতে না পেরে বাড়িঘর ছাড়তে হলো।

মুজিবুররা যখন তীব্র আন্দোলন শুরু করেন কৃষি শ্রমিকদের স্বার্থে, তখন সরকার তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করে কিছুটা সংশোধন করলেন মাত্র।

বলা হলো এক জেলা থেকে অন্য জেলায় কিছুতেই ধান নেয়া যাবে না। তবে যেটুকু ধান তার পাওয়ার কথা তা সে পাবে তার নিজের জেলা থেকেই। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো এই যে, ধাওয়ালরা সব সময় ধান সংগ্রহ করতে পারত না নিজের জেলা থেকে। সরকারি কর্মীরা তাদের কাছে সরকারি কাগজপত্র দাবি করত। যা তারা দিতে অক্ষম ছিল। এইভাবেই সর্বস্বান্ত হয়ে যায় ধাওয়ালরা। খুলনা, কুমিল্লা, ফরিদপুরে সর্বত্র মুজিবুর ধাওয়ালদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এইভাবে তিনি দেশব্যাপী শ্রমিকদের অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের গভর্নর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রয়াত হন। তিনি প্রয়াত হলে তাঁর জায়গায় গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন জনাব নূরুল আমিন সাহেব।

জিন্নাহ ফান্ড : গড়ে তুললেন গোপালগঞ্জ কলেজ

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রয়াণের পর সমগ্র পাকিস্তান জুড়েই একটি প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছিল। প্রকল্পটির নাম ছিল জিন্নাহ ফান্ড। এটি যদিও একটি সরকারি প্রকল্প কিন্তু দেশের জনগণ এই ফান্ডে অর্থ জমা দেবে এই ছিল এই ফান্ডের বৈশিষ্ট্য। এই ফান্ডে জনগণ স্বেচ্ছায় এবং সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ জমা দেবে এটা ছিল মূল কথা। কিন্তু এই ফান্ডে অর্থ জমা দেয়াটা প্রায় বাধ্যতামূলক করে ফেলেছিল পূর্ব পাকিস্তানের সরকার। এই ফান্ডে অর্থ জমা দেয়ার জন্য কোনো কোনো জায়গায় জুলুমবাজিও শুরু হয়েছিল। সরকারি অফিসারদের মধ্যে ছিল এ নিয়ে দারুণ উৎসাহ। কোন মহকুমা থেকে কত টাকা ওঠানো যাবে এটা যেন ছিল একটি প্রতিযোগিতা।

সবচাইতে বাড়াবাড়ি হয়েছিল শেখ মুজিবুরের মহকুমা গোপালগঞ্জেই। গোপালগঞ্জের জনগণ বিষয়টিকে ভালোভাবে গ্রহণ করেননি। যদিও এই বাড়াবাড়ির কারণও ছিল একটা। প্রশাসনিকভাবে ঠিক হয়েছিল যে, খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব আসবেন গোপালগঞ্জে। এজন্য মহকুমা শাসককে প্রধান করে গঠিত হয়েছিল একটি অভ্যর্থনা কমিটি। সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, মহকুমায় বসবাসরত প্রত্যেকেই দেবেন এক টাকা। তাহলে উঠে আসবে ছয় লক্ষ টাকা। কেননা গোপালগঞ্জে এই বছরে ছয় লক্ষ লোকের বাস ছিল। এছাড়াও যারা সম্ভ্রান্ত বা অবস্থাসম্পন্ন তাদেরকে দিতে হবে আরো বেশি হারে। এই অর্থ তুলতে গিয়ে শুরু হলো জুলুম। জোর করে টাকা তোলা হচ্ছিল।

শেখ মুজিবুর তখন গোপালগঞ্জে ছিলেন না। ছিলেন খুলনায়। খবর পেয়ে তিনি দ্রুত পৌঁছলেন গোপালগঞ্জে। মুজিবুর বাড়িতে এসেছে শুনে চারদিক থেকে দলে দলে লোক আসতে শুরু করলেন। সবাইকে নিয়ে মুজিবুর একটি সভা করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, টাকা তোলার নামে জুলুমবাজি বন্ধ করতে হবে। যে টাকা তোলা হয়েছে তা এখান থেকে নিতে দেওয়া হবে না। খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের অভ্যর্থনার জন্য যা ব্যয় হবে তা বাদে বাকি সব টাকা দিয়ে গোপালগঞ্জে একটা মসজিদ এবং একটা কলেজ গড়ে তুলতে হবে। মুজিবুর বললেন, যদি এর ব্যতিক্রম হয় তাহলে বাধা দেয়া হবে। প্রয়োজনে সভায় গোলমাল হবে। এর জন্য দায়ী থাকবে সরকার। এই খবর পৌঁছে গেল সমস্ত মহকুমায়। এবং আশ্চর্যজনকভাবে বন্ধ হয়ে গেল জোর করে অর্থ আদায়।

খাজা নাজিমুদ্দীন যেদিন গোপালগঞ্জে আসবেন তার দু'দিন আগে জেলা প্রশাসন থেকে মুজিবুরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো। প্রথমে পরিকল্পনা করা হয়েছিল মুজিবুরকে গ্রেপ্তার করে নেওয়া। তাতে যদি হিতে বিপরীত হয় সেই ভয়ে মুজিবুরকে গ্রেপ্তার করার রাস্তা থেকে প্রশাসন পিছিয়ে এলো। ব্যক্তিগতভাবে জেলাশাসক গোলাম কবির মুজিবুরকে চিনতেন আগে থেকেই। তিনি নিজেই কথা বললেন মুজিবুরের সঙ্গে। তিনি মুজিবুরকে বলেছিলেন যে,

"গভর্নর জেনারেল রাজনীতিবিদ নন। তিনি এখন রাষ্ট্রপ্রধান। কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি জড়িত নন। তিনি তো অতিথি, তাঁকে অসম্মান করা কি উচিত হবে?"

জেলা শাসকের এই আন্তরিক কথার উত্তরে মুজিবুর তাঁকে বলেছিলেন–

"কে বলেছে আপনাকে যে তাঁকে অসম্মান করতে চাই। তাঁকে সকলেই অভ্যর্থনা করবে, শুধু এটুকু কথা তাঁর সাথে আলোচনা করে আমাকে জানিয়ে দেন যে, তিনি হুকুম দিবেন এই অত্যাচার করে টাকা তোলার ব্যাপারে তদন্ত করবেন এবং দোষীকে শাস্তি দিবেন। দ্বিতীয়ত, টাকা তাঁকে দেওয়া হবে, আমরা কোনো দাবি করবো না, শুধু তিনি টাকাটা কলেজ করতে দিয়ে দিবেন। তিনিই আমাদের কলেজ করে দেবেন।"

পরের দিন যথারীতি পাকিস্তানের সম্মাননীয় গভর্নর খাজা নাজিমুদ্দীন এলেন গোপালগঞ্জে। তিনি একটি মসজিদের উদ্বোধন করেন এবং গোপালগঞ্জে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সাহেবের নামে একটি কলেজ করার আদেশ দিয়ে গেলেন। গোপালগঞ্জে আজও কলেজটি চলছে। মুজিবুর যদি সেদিন জুলুমবাজির খবর পেয়ে গোপালগঞ্জে না আসতেন তাহলে সেদিন ঐ অত্যাচারও বন্ধ হতো না এবং কলেজও প্রতিষ্ঠিত হতো না।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শিল্পী আব্বাসউদ্দিনের সঙ্গে মুজিবুর

এই সময় মুজিবুর দারুণ দক্ষতার সঙ্গে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ'-এর সংগঠন গড়ে তোলার জন্য মনোযোগী হলেন। বিভিন্ন জেলার স্কুল-কলেজে এই ছাত্র সংগঠনটি গড়ে উঠেছিল। এজন্য মুজিবুরকে প্রচুর সময় দিতে হয়েছে। দেশভাগের পর নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। এই সময় কোনো বিরোধী দল বা সংগঠন বলতে কিছুই ছিল না। একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগই একমাত্র বিরোধী সংগঠন। ফলে সরকার ধীরে ধীরে একনায়কতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জনাব লিয়াকত আলী খান সাহেব। কোনো সমালোচনাই তার সহ্য হতো না।

১৯৪৯ সালের জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাস। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহী কলেজ, দিনাজপুর কলেজসহ আরো দুই একটি কলেজে মুসলিম ছাত্রলীগের উপর পুলিশি নির্যাতন হয়। ঐ সময় জেলের ভেতর ছাত্রনেতা দবিরুল ইসলামকে এমনভাবে অত্যাচার করা হয়েছিল যে, তাঁর জীবনীশক্তিই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ছাত্ররা এই সময় শেখ মুজিবুরকে আহ্বায়ক করে জুলুম প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালন করেছিল। ঐ বিশেষ দিনটিতে মুজিবুরকে বিখ্যাত আমতলায় সভা করার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। বাধ্য হয়ে মুজিবুর সেদিন সভা করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের মাঠে।

এই সময়েই কৃষ্ণনগর হাই স্কুলের দ্বারোদ্ঘাটন করার আয়োজন করা হলো। এই কৃষ্ণনগর ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার নবীনগর থানার অন্তর্গত। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ছিলেন এই অঞ্চলের জনাব রফিকুল হোসেন। বিদ্যালয় উদ্বোধনের এই অনুষ্ঠানে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন তিনজন বিশিষ্ট শিল্পী। এঁরা হলেন বিখ্যাত গায়ক আব্বাসউদ্দিন আহমেদ, সোহরাব হোসেন এবং বেদারউদ্দিন আহমেদ। শেখ মুজিবুর রহমানকেও এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, পাকিস্তান হওয়ার আগে এই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মহকুমা শাসক ছিলেন জনাব এম. এন. খান। তিনিও এসেছিলেন ঐ অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে। আব্বাসউদ্দিন সেই সময় ছিলেন গ্রামবাংলার অত্যন্ত জনপ্রিয় শিল্পী। গ্রামবাংলার মানুষের হৃদয়ের কথা ব্যক্ত হতো তাঁর গানে। এই অনুষ্ঠানে মুজিবুরকেও বক্তৃতা করতে হয়েছিল। তিনি তাঁর বক্তৃতায় মূলত ধাওয়ালদের সমস্যার কথাই ব্যক্ত করেছিলেন। অনুষ্ঠানের পর সন্ধ্যায়

বসেছিল গানের আসর। এতে অংশ নিয়েছিলেন জনাব আব্বাসউদ্দিন, জনাব সোহরাব হোসেন ও জনাব বেদারুদ্দিন। পরের দিন সবাই নৌকা করে গিয়েছিলেন আশুগঞ্জ বন্দরে মূলত ট্রেন ধরতে। এই প্রসঙ্গে মুজিবুর বলেছেন–

"পরের দিন নৌকায় আমরা রওয়ানা করলাম, আশুগঞ্জ স্টেশনে ট্রেন ধরতে। পথে পথে গান চলল। নদীতে বসে আব্বাসউদ্দিন সাহেবের ভাটিয়ালি গান তাঁর নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটা দিক অপূর্ণ থেকে যেতো। তিনি যখন আস্তে আস্তে গাইতেছিলেন তখন মনে হচ্ছিল নদীর ঢেউগুলি যেন তাঁর গান শুনছে।"

সেই দিন আব্বাসউদ্দিন সাহেব মুজিবুরকে বলেছিলেন–"মুজিব, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে বাংলার কৃষ্টি সভ্যতা সব শেষ হয়ে যাবে। আজ যে গানকে তুমি ভালোবাস, এর মাধুর্য ও মর্যাদা নষ্ট হয়ে যাবে। যা কিছু হোক, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের ধর্মঘটের পাশে

পাকিস্তান গঠন হওয়ার দুই-এক বছর পর থেকেই দিকে দিকে বিভিন্ন স্তরে নতুন সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভের আগুন প্রজ্বলিত হতে শুরু করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার নবীনগর থানার কৃষ্ণপুরে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানপর্ব সম্পন্ন করে মুজিবুর যখন ঢাকা পৌঁছোলেন, তখনই শুনতে পেলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচাইতে কম বেতনভোগী কর্মচারীরা তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট শুরু করেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও তাদের সমর্থনে ধর্মঘট শুরু করেছে। প্রকৃতপক্ষে যারা সেই সময় নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারী ছিলেন তারা সকলেই নানাভাবে বঞ্চিত ছিলেন। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, সর্বস্তরেই ছিল এই অবস্থা। মুজিবুর প্রথম থেকেই এই সমস্ত কর্মচারীদের সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। আসলে এদের চাকরির কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। একদিকে জিনিসপত্রের অসম্ভব দাম, অন্যদিকে খুবই সামান্য বেতন, ফলে তাদের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। ধর্মঘটে যাওয়া ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিল না।

মুজিবুর এই ধর্মঘটের কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের কোনো দাবিই মানে নাই। বাধ্য হয়েই তারা ধর্মঘটে গেছে। মুজিবুর পরের দিন সকালেই ছুটে গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। গিয়ে দেখেন পরিস্থিতি খুবই জটিল। ছাত্ররা এই ধর্মঘটে কর্মচারীদের পাশে থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সবকিছু অগ্রাহ্য করতে পারছেন না। মুজিবুর প্রথমেই কয়েকজন ছাত্রনেতাকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করলেন। উপাচার্যকে সবকিছু বুঝিয়ে বললেন। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন যে, ধর্মঘটকারী কর্মচারীদেরকে বরখাস্ত করে দেবেন। পরিস্থিতি যথেষ্ট জটিল হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতেও শেখ মুজিবুর রহমান আবার তার জাত চেনালেন। তাঁর মধ্যে যে অসাধারণ নেতৃত্বের ক্ষমতা রয়েছে তা তিনি দেখালেন। পর পর সভা করলেন কর্মচারী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে, ছাত্রনেতৃবৃন্দের সঙ্গে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। কর্মচারীদের আর্থিক অবস্থা এতটাই দুর্বল ছিল যে, সত্যিই সত্যিই যদি তাদেরকে বরখাস্ত করা হয় তাহলে তারা তাদের ছেলেপুলে নিয়ে না খেয়ে মারা যাবে। তখন সমস্যা আরো ভয়াবহ হবে। মুজিবুর সমগ্র পরিস্থিতি অনুভব করে বারবার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন, শেষপর্যন্ত একটা সমাধানে পৌঁছাতে সমর্থ

হয়েছিলেন। মুজিবুর উপাচার্যকে বলেছিলেন যে, "আপনি আশ্বাস দেন, তাদের ন্যায্য দাবি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আদায় করে দিতে চেষ্টা করবেন এবং কাউকেও চাকরি থেকে বরখাস্ত করবেন না এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কারও বিরুদ্ধে গ্রহণ করবেন না।" এর উত্তরে উপাচার্য মুজিবুরকে বলেছিলেন, "আগামীকাল ধর্মঘট প্রত্যাহার করে চাকরিতে যোগদান করলে কাউকেও কিছু বলা হবে না এবং আমি কর্তৃপক্ষের কাছে ওদের ন্যায্য দাবি মানাতে চেষ্টা করব।"

মুজিবুর ভেবেছিলেন যে সমস্যার বুঝি আপাত সমাধান হলো। কিন্তু পরের দিন সকাল এগারোটার মধ্যে সকল কর্মচারী কাজে যোগ দিতে পারেন নাই। এই অজুহাতে উপাচার্য অনুপস্থিত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এই ধরনের সংবাদে মুজিবুর রহমানও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। এই পরিস্থিতিতে ছাত্র এবং কর্মচারীদের যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত হলো যে, উপাচার্য যখন শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই গ্রহণ করলেন তখন ধর্মঘট করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন, "বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হলো। বিভিন্ন হল থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সকলকে চলে যেতে হবে।" আর যে সমস্ত কর্মচারী ধর্মঘটে যোগদান করেছে তাদের বরখাস্ত করা হলো। কর্তৃপক্ষের এই ঘোষণায় ধর্মঘটী কর্মচারীরা সত্যিই সত্যিই আর্থিক সমস্যায় পড়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটী কর্মচারীদের পরিবার-পরিজনদেরকে সাহায্য করার জন্য রাস্তায় নেমে অর্থসংগ্রহ করতে হয়েছিল। এইভাবে কিছুদিন সাহায্য করার পর দেখা গেল এক একজন করে কর্মচারী বন্ড দিয়ে কাজে যোগ দিতে শুরু করলেন। এক মাসের মধ্যেই যেহেতু প্রায় সব কর্মচারী কাজে যোগদান করলেন সেহেতু ধর্মঘট এইভাবেই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এই ধর্মঘটের প্রভাব পড়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর।

ছাত্র ধর্মঘটের জের : গ্রেপ্তার মুজিবুর

১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাস। মুজিবুরের বয়স তখন ২৯ বছর। এই জীবনসীমার মধ্যে তৃতীয়বারের জন্য গ্রেপ্তার হলেন শেখ মুজবিুর রহমান। এবারের গ্রেপ্তারের কারণ ছাত্র ধর্মঘট এবং কর্মচারী ধর্মঘটকে নেতৃত্ব দেওয়া। যখন ভয়-ভীতি দেখিয়ে এবং নানা রকম কৌশল করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের ধর্মঘট ভেঙে দিয়েছিলেন তখন কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই ছাত্রদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে লাগলেন। ১৯৪৯ সালের মার্চ এবং এপ্রিলে টাঙ্গাইলে উপনির্বাচন হবে বলে সরকারিভাবে জানানো হয়। এই নির্বাচনে মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্যরা মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, মুসলিম লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে শামসুল হক সাহেবকে প্রার্থী করা হবে। সে জন্য ছাত্ররা নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রি করেও কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

এদিকে ধর্মঘটের কারণে বহু ছাত্রনেতাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৭ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় চালু হলো পঠন-পাঠন। কিন্তু ঐ দিনই ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদ দিবস পালন করল। তাদের একটাই দাবি, ছাত্রদের উপর থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে হবে। একদিকে টাঙ্গাইলে উপনির্বাচন আর অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলন। মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন ছাত্রসমাজ দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। কেউ কেউ টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে তাদের প্রার্থীকে জয়ী করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। আবার অন্যদিকে কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়ে গেল। ১৭ এবং ১৮ এপ্রিল ধর্মঘট হলো। সব ছাত্র ধর্মঘটে যোগ দিল না। অনেকেই ক্লাস করতে চায়নি। মুজিবুর বললেন, যারা ক্লাস করতে চান তারা করতে পারেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাড়িতে রাতদিন ধরনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষও ছাত্রদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত আদেশ নিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। বিশেষ করে সলিমুল্লাহ হলের প্রভোষ্ট ড. ওসমান গণি সাহেব এক্সিকিউটিভ কমিটির সভায় ছাত্রদের উপর থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করার অনুরোধ করেন। তাঁকে সমর্থন করেছিলেন প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ। যদিও কমিটির অন্যান্য সদস্য এই আদেশ প্রত্যাহার করার পক্ষে ছিলেন না। এই পরিস্থিতিতেও মুজিবুর রহমান ছাত্রদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের গণভবনের সামনে

ধরনা অব্যাহত রাখলেন। ১৯ এপ্রিল বিকেল তিনটায় ধরনা স্থলে এলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং এস. পি.। এসেই তারা মুজিবুরকে গ্রেপ্তার করে জেলখানায় নিয়ে যান।

পুলিশ ভেবেছিল যে, মুজিবুরকে গ্রেপ্তার করলেই বুঝি আন্দোলন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা গেল পরেও দিনও আন্দোলন চলল এবং গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন আরও প্রায় পঁয়ত্রিশ জন ছাত্র। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন খালেক নেওয়াজ খান, কাজী গোলাম মাহাবুব, আজিজ আহমেদ, আলি আহাদ, আবুল হাসানাত, আবুল বরকত, কে. জি. মোস্তফা, বাহারুদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ। সকল ছাত্রকে রাখা হয়েছিল জেলের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের দোতলায়। এই সময় প্রফেসর সুনীল চৌধুরীর বোন নাদিরা বেগম ছাত্রীদের মধ্যে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন।

প্রতিষ্ঠিত হলো পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ

১৯৪৯ সালের এপ্রিলে টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী হয়েছিলেন করটিয়ার বিখ্যাত জমিদার খুররম খান পন্নী। অন্যদিকে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছিলেন শামসুল হক সাহেব। মাত্র দু'বছরের মধ্যে মুসলিম লীগের গণভিত্তি প্রায় শূন্যে নেমে এসেছিল। যার ফলে এই উপনির্বাচনে শামসুল হক নির্বাচিত হয়ে এম. এল. এ. হয়েছিলেন। মুসলিম লীগ প্রথমবারের মতো পরাজিত হলো পাকিস্তানে। বলা চলে মুসলিম লীগের পরাজয়ের সূচনা হলো। এদিকে মুজিবুর তখনো জেলে। শামসুল হক সাহেবের এই জয়ী হওয়ার মধ্যদিয়ে এই প্রথম অনুভূত হলো যে, মুসলিম লীগের বিকল্প হিসেবে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা জরুরি। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিশেষ করে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করার জন্য ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন একটি কর্মী সভা আহ্বান করা হলো। শামসুল হক সাহেব যখন বিজয়ী হয়ে টাঙ্গাইল থেকে ঢাকায় এলেন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রারা তাঁকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে সমগ্র ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করেছিল। মুজিবুর এই সময় জেলে ছিলেন বলে এই শোভাযাত্রায় অংশ নিতে পারেননি। জেলে বসেই জয়ের আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

এই ঐতিহাসিক কর্মী সম্মেলন করার জন্য ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে অফিস খোলা হয়েছিল। এই কর্মী সম্মেলনকে সার্বিক সফল করে তোলার জন্য অর্থ এবং অন্যান্য নানা দিক থেকে যাঁরা সেদিন সাহায্য করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলো শওকত মিয়া, ইয়ার মোহাম্মদ খান, অ্যাডভোকেট আতাউর রহমান খান, আলী আমজাদ খান, আনোয়ারা খাতুন প্রমুখ। শেখ মুজিবুর রহমান জেলে থাকায় তাঁর মতামত নেওয়া হয়েছিল। মুজিবুর জেল থেকে যা বলেছিলেন তার মূল কথা হলো–"আর মুসলিম লীগের পেছনে ঘুরে লাভ নাই। এ প্রতিষ্ঠান এখন গণবিচ্ছিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এরা আমাদের মুসলিম লীগে নিতে চাইলেও যাওয়া উচিত হবে না। কারণ এরা কোটারি করে ফেলেছে। একে আর জনগণের প্রতিষ্ঠান বলা চলে না। এদের কোনো কর্মপন্থাও নেই।" মুজিবুরকে তখন বলা হয়েছিল যে, তিনি ছাত্র রাজনীতি করবেন না, নতুন রাজনৈতিক দলে কাজ

করবেন। মুজিবুর তখন বলে দিয়েছিলেন যে, তিনি নতুন রাজনৈতিক দলেই কাজ করবেন। কারণ যদি বিরোধী দল গঠন করা না যায় তাহলে দেশে একনায়কত্ব চলবে।

শেষ পর্যন্ত অন্য কোথাও সম্মেলনের জায়গা না পেয়ে সম্মেলন করা হয়েছিল হুমায়ুন সাহেবের রোজ গার্ডেন বাড়িতে। যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আল্লামা মওলানা রাজীব আহসান, এম. এল. এ.-দের ভেতর থেকে জনাব খয়রাত হোসেন, বেগম আনোয়ারা খাতুন, আলী আহমেদ খান, হাবিবুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ। এছাড়াও যোগ দিয়েছিলেন বিভিন্ন জেলার প্রধান নেতৃবৃন্দ। সকলে মিলে সেদিন গঠন করা হয়েছিল নতুন একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ'। এই নতুন দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হয়েছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক করা হয়েছিল জনাব শামসুল হক এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে।

এই নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন করার কিছুদিন পরেই শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাহারুদ্দিনকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। সেদিন বিরাট জনতা মুজিবুরকে জেল গেটেই অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। ছেলেকে দেখতে সেদিন মুজিবুরের পিতাও এসেছিলেন গোপালগঞ্জ থেকে। জেল গেটেই সেদিন ধ্বনি উঠেছিল আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ। ধীরে ধীরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ পরিচিত হয়ে গেল শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ নামে। এর পরেই আওয়ামী লীগের প্রথম ওয়ার্কিং কমিটির সভায় অনুষ্ঠিত হয় ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে। এই সভা থেকে কয়েকজনকে সহ-সভাপতি করা হয়েছিল। এঁরা হলেন–জনাব আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খান, আলী আহমেদ খান, আলী আমজাদ খান প্রমুখ। এ সভা থেকেই একটি গঠনতন্ত্র সাব-কমিটি এবং একটি কর্মপন্থা সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

আওয়ামী লীগের প্রথম জনসভা আহ্বান করা হয়েছিল আরমানিটোলা ময়দানে। সেই সভার বক্তৃতা করেছিলেন মওলানা ভাসানী সাহেব এবং শামসুল হক সাহেব। কিন্তু মুসলিম লীগ এই সভাটি বানচাল করার জন্য বাদশা মিঞা নামে একজন প্রভাবশালী লোককে দায়িত্ব দিয়েছিল। যদিও বাদশা মিঞা পরে তার ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চেয়ে নেয় এবং আওয়ামী লীগের হয়ে কাজ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়।

গোপালগঞ্জে সভা : চতুর্থবারের জন্য গ্রেপ্তার হলেন মুজিবুর

বহুদিন ধরে মুজিবুর বাড়ির বাইরে ছিলেন। সে জন্যই পিতা শেখ লুৎফর রহমান ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য জেল গেটে এসেছিলেন। মুজিবুর পিতাকে কথা দিয়েছিলেন যে তিনি দ্রুত বাড়ি যাবেন। তিনি নিজেও মা, স্ত্রী এবং কন্যা হাসিনাকে দেখতে চাইছিলেন। তাছাড়া মুজিবুরের হাত একদম খালি ছিল। বাড়িতে না গেলে টাকা-পয়সাও আনা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই গোপালগঞ্জে আওয়ামী লীগের সংগঠন তৈরি হয়ে গেছে। মুজিবুর গোপালগঞ্জে একটি সভা করবেন বলে স্থির করলেন। সভার বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন ফরিদপুরের সালাম সাহেবকে।

১৯৪৯ সালের জুলাই মাস। জুলাই মাসের ১৬ তারিখ এই সভাটি আয়োজিত হয়েছিল। সভা শুরুর আগেই প্রশাসন থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মুজিবুর সমবেত প্রায় এক হাজার জনতাকে জানিয়ে দিলেন যে সভা হবে মসজিদের ভেতর। মসজিদের ভেতর যখন সভাটি শুরু হলো ঠিক তখনই গোপালগঞ্জের মহকুমা শাসক মসজিদের ভেতর ১৪৪ ধারা জারি করেন। মুজিবুররা এই ধারা মানতে অস্বীকার করলে মসজিদের ভেতরই পুলিশ লাঠিচার্জ করতে শুরু করে। এই ঘটনায় জনগণ এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, মসজিদের চারদিকে পুলিশকে ঘেরাও করে রেখেছিল। মহকুমা শাসক ভুল করেছেন সেটা পুলিশ বুঝতে পেরেছিল। পরিস্থিতি যেকোনো সময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে বুঝে পুলিশ মুজিবুরকে বলেছিল যে মুজিব যেন জনগণকে এটা বলেন যে তাঁকে কিছুক্ষণ পরেই জামিনে মুক্তি দেওয়া হবে। আসলে জনগণ মসজিদটিকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছিল যে, পুলিশের পক্ষে কিছুতেই এখান থেকে বাইরে বেরিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। তখন মহকুমা পুলিশ অফিসার মুজিবুর রহমান এবং সালাম সাহেবের কাছে এসে অনুরোধ করে বললেন–

"গোলমাল হলে অনেক লোক মারা যাবে। আপনারা তো এমনি জামিন পেয়ে যাবেন। এদের বলে দেন চলে যেতে এবং রাস্তা ছেড়ে দিতে। আমরা আপনাদের কোর্টে নিয়ে যাব এবং এখনই জামিন দিয়ে দেব।" সেই মতো মুজিবুরকে বক্তৃতা করে সমগ্র পরিস্থিতি জনগণকে বোঝাতে হয়েছিল।

মুজিবুরের বক্তৃতা শুনে জনগণ শান্ত হলেন এবং রাত আটটার সময় মুজিবুরদের জামিন দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। গোপালগঞ্জের এই সভাটিই ছিল আওয়ামী লীগের মফস্বলকেন্দ্রিক প্রথম সভা এবং এই সভা উপলক্ষে ১৪৪ ধারা জারি। এদিনের এই ঘটনার পর থেকে মুজিবুরের জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে যায়। পরের দিনই গোপালগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের কমিটি গঠিত হয়। প্রথম কমিটির কনভেনর হয়েছিলেন কাজী আলতাফ হোসেন এবং চেয়ারম্যান করা হয়েছিল মুসলিম লীগ সভাপতি অ্যাডভোকেট কাজী মোজাফফর হোসেনকে।

নৌকোয় মুজিবুর : ডাকাতরা পালিয়ে গিয়েছিল

এই কদিন মুজিবুর বাড়িতেই ছিলেন। স্ত্রী রেণুর শরীরটাও ভালো ছিল না। বাড়ির সবাইকে ফেলে দ্রুত ঢাকায় চলে আসতে পারছিলেন না। বিশেষ করে প্রথম কন্যা হাসিনা সবসময়ই তাঁর আব্বার সঙ্গে। পুত্রকে খুব কাছে পেয়ে পিতা শেখ লুৎফর রহমান বলেছিলেন যদি ঢাকাতে আইন পড়া না হয় তাহলে তিনি মুজিবুরকে বিলেতে পাঠাতেও প্রস্তুত। তিনি জমি বিক্রি করে পুত্রকে বার এট ল' ডিগ্রি নিয়ে আসতে বলেছিলেন। মুজিব তখন পিতাকে বুঝিয়েছিলেন তিনি দেশের জন্য কাজ করতে চান। প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করতে চান। কেননা মুসলিম লীগ নেতারা দেশটাকে শেষ করে দেবে। দেশ স্বাধীন হয়েছে তবুও দেশের মানুষের দুঃখ-কষ্ট, খাদ্যাভাব ইত্যাদি কিছুই দূর হয়নি। দেশের রাজধানী করাচিতে। পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প, কল-কারখানা সবকিছুই হচ্ছে, অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান শুকিয়ে যাচ্ছে। এর পরিবর্তন হওয়া দরকার। পিতা শেখ লুৎফর রহমান সেদিন তাঁর প্রিয় পুত্রকে বলেছিলেন, "আমাদের জন্য কিছু করতে হবে না। তুমি বিবাহ করেছো, তোমার মেয়ে হয়েছে, তাদের জন্য তো কিছু একটা করা দরকার।"

মুজিবুর তখন পিতাকে বলেছিলেন, "আপনি তো আমাদের জন্য জমিজমা যথেষ্ট করেছেন, যদি কিছু না করতে পারি বাড়ি চলে আসবো। তবে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া চলতে পারে না।"

এই সময়েই একদিন মুজিবুর এবং কাজী আলতাফ হোসেন সাহেব যাচ্ছিলেন লালবাগ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মওলানা শামসুল হক সাহেবের বাড়িতে। রাত তখন দশটা। মধুমতী নদী দিয়ে ছোট্ট একটি নৌকা করে এঁরা দুজন যাচ্ছেন। মধুমতীর একদিকে ফরিদপুর অন্যদিকে যশোর ও খুলনা জেলা। নৌকোর মাঝি একজনই। নদীটার এক জায়গায় খুবই চওড়া। মাঝেমধ্যে এখানে ডাকাতি হয়। নৌকোর দুই বিশিষ্ট যাত্রী তখন প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছেন। এমন সময় একটি ছিপ নৌকো করে চার ডাকাত মুজিবুরের নৌকায় আক্রমণ করে। মাঝিকে ডাকাতরা বলেছিল নৌকা কোথা থেকে আসছে এবং নৌকায় কে আছে। মাঝি যখনই টুঙ্গিপাড়া এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নাম বলেছে তখনই ডাকাতরা মাঝিকে আঘাত করে বলে, "শালা আগে বলতে পার নাই যে শেখ সাহেব নৌকায়!"

মুজিবুর নৌকোর মধ্যে ছিলেন গভীর ঘুমে। হৈচৈ শুনে উঠে জিজ্ঞেস করলেন কী হয়েছে তখন কাজী সাহেব মুজিবুরকে বলেছিলেন–"ডাকাতরা আপনাকে শ্রদ্ধা করে। আপনার নাম করেই বেঁচে গেলাম। না হলে উপায় ছিল না।" শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে গরিব সাধারণ মানুষ যে খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিল তা প্রথম থেকেই বোঝা গিয়েছিল। কিছুদিন পরেই মুজিবুর ঢাকায় চলে এলেন। ঢাকায় এসেই ছাত্রলীগের বার্ষিক সম্মেলন যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার ব্যবস্থা করলেন।

পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেবার দাবি

ছাত্র সংগঠন ছেড়ে মুজিবুর পূর্ণ সময়ের জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন আওয়ামী লীগ সম্প্রসারণের কাজে। ঢাকার তাজমহল সিনেমা হলে ছাত্রলীগের একটি সভায় ছাত্রনেতা হিসেবে শেষবারের মতো তিনি বক্তব্য পেশ করেন। এই সভায় তিনি বলেছিলেন–

"আজ থেকে আমি আর আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে থাকবো না। ছাত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকার আর আমার কোনো অধিকার নাই। আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। কারণ আমি আর ছাত্র নই। তবে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ যে নেতৃত্ব দিয়েছে, পূর্ব বাংলার লোক তা ভুলতে পারবে না। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার আপনারা করেছেন, এদেশের মানুষ চিরদিন তা মনে রাখবে। আপনারাই এদেশে বিরোধী দল তৈরি করেছেন। শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র চলতে পারে না।"

এই সময়ে ছাত্রলীগের সভাপতি এবং সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন ছাত্রনেতা দবিরুল ইসলাম এবং খালেক নেওয়াজ খান। পরবর্তীকালে ছাত্রলীগের সম্পাদক হয়েছিলেন আবদুল ওয়াদুদ। কোনো পদে না থাকলেও মুজিবুর সবসময়েই ছাত্র নেতৃবৃন্দকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। এককথায় ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি সকলের কাছেই ছিলেন আদরণীয়।

আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র এবং ম্যানিফেস্টোর খসড়া তৈরি করেছিলেন শামসুল হক সাহেব। এ নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যে দীর্ঘ আলোচনাও হয়। অনেক তর্ক-বিতর্ক-আলোচনার পর এই খসড়া গ্রহণ করা হলো। এই সময়েই–একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হলো যা জনগণের অন্যতম প্রধান দাবি হিসেবে গৃহীত হলো। সেই প্রস্তাব বা দাবিটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। বলা হয়েছিল, "কেবলমাত্র দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।"

এদিকে মুজিবুর পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছেন আওয়ামী লীগের সংগঠনকে পুরো পূর্ব পাকিস্তানজুড়ে সম্প্রসারিত করার কাজে। এই সময়ই ঠিক হলো যে, ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমায় হবে আওয়ামী লীগের প্রথম জনসভা। জামালপুরের আইনজীবী হায়দর আলী মল্লিক সাহেব

জনসভার অন্যতম আহ্বায়ক। ছাত্র নেতা হাতেম আলী তালুকদার যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিল এই সভাকে সার্থক করার জন্য। সভার সভাপতি ছিলেন শামসুল হক সাহেব এবং প্রধান বক্তা মওলানা সাহেব। জনসভায় নেতৃবৃন্দের কথা শোনার জন্য বেশ কয়েকশো মানুষের সমাগম হয়েছিল। কিন্তু জনসভা শুরুর ঠিক দশ মিনিট আগে পুলিশ এসে বলে ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে, সভা করা যাবে না। এই কথা শুনে মুজিবুর তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, "১৪৪ ধারা আমি মানি না। আমি বক্তৃতা করবো।" এই পরিস্থিতিতে মওলানা সাহেব বলেছিলেন, "১৪৪ ধারা জারি হয়েছে। আমাদের সভা করতে দেবে না। আমি বক্তৃতা করতে চাই না। তবে আসুন আপনারা মোনাজাত করুন, আল্লাহ আমিন।"

বিচক্ষণ নেতা মওলানা সাহেব মোনাজাত করার নামে আধঘণ্টা ধরে প্রায় বক্তৃতাই করলেন। সব কথাই প্রায় বললেন। কোনো কিছুই আর রাখলেন না। পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে মুজিবুর কী ভাবতেন সে সম্পর্কে তিনি তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বলেছেন–

"আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, এদেশে রাজনীতি করতে হলে ত্যাগের প্রয়োজন আছে এবং ত্যাগ আমাদের করতে হবে পাকিস্তানের জনগণকে সুখী করতে হলে। মুসলিম লীগ সরকার নির্যাতন চালাবে এবং নির্যাতন ও জুলুম করেই ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করবে। নির্যাতনের ভয় পেলে বেশি নির্যাতন ভোগ করতে হয়। এখনও মুসলিম লীগের নামে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে কিছুটা; কিন্তু বেশিদিন ধোঁকা দেওয়া চলবে না। মুসলিম লীগ নামের যে মোহ এখনও আছে, জনগণকে বোঝাতে পারলে এবং শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে পারলে মুসলিম লীগ সরকার অত্যাচার করতে সাহস পাবে না।"

পুলিশের লাঠির আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে নর্দমায় মুজিবুর

১৯৪৯ সালের শেষ দিক। পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল তীব্রভাবে। ঐ বছরেরই ১১ অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খান। তার আগে মুজিবুর সভা ডাকেন আরমানিটোলা ময়দানে। মুসলিম লীগ সেই সভায় গোলমাল বাধানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মওলানা ভাসানী সাহেব। বক্তব্য রাখেন আতাউর রহমান খান, শামসুল হক সাহেব এবং শেখ মুজিবুর রহমান। আরমানিটোলা ময়দানে এত বড় সভা এই প্রথম হলো। বোঝা গেল মুসলিম লীগ সম্পর্কে জনগণের মোহ কাটতে শুরু করেছে। এই সভায় মওলানা ভাসানী ঘোষণা করলেন–

"জনাব লিয়াকত আলী খান ঢাকায় আসছেন অক্টোবর মাসে। আমরা তাঁর সাথে খাদ্য সমস্যা ও রাজবন্দিদের মুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই। যদি তিনি দেখা না করেন আমাদের সাথে তাহলে আমরা আবার সভা করব এবং শোভাযাত্রা করে তাঁর কাছে যাব।"

সোহরাওয়ার্দী সাহেবের যত অনুগামী ছিল পূর্ব পাকিস্তানে তারা ধীরে ধীরে মুসলিম লীগ ছেড়ে আওয়ামী লীগের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। এই কঠিন সময়ে যে কজন মানুষ আওয়ামী লীগকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বেগম আনোয়ারা খাতুন, আতাউর রহমান সাহেব, আবদুল কাদের সর্দার প্রমুখ। এই সময়ের মধ্যে চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের সংগঠন গড়ে উঠেছিল মূলত এমএ আজিজ এবং জহুর আহমদ চৌধুরীর নেতৃত্বে। যশোরে সংগঠন গড়ে উঠেছিল মূলত খড়কীর পীর সাহেব এবং অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে। অন্যদিকে ফরিদপুরে সংগঠন গড়ে উঠেছিল সালাম খান সাহেবের নেতৃত্বে। এদিকে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান যেদিন ঢাকায় আসবেন সেদিনই অর্থাৎ ১১ অক্টোবর পুনরায় আরমানিটোলা ময়দানে আওয়ামী লীগের সভা আহ্বান করা হলো। এই সময়ে যখন আওয়ামী লীগের কর্মীরা সভার প্রচার করছিল তখনই মুসলিম লীগ কর্মীরা আক্রমণ করে মাইক্রোফোন ছিনিয়ে নেয়। এ নিয়ে অশান্তি হয়।

এলো ১১ অক্টোবর। বড় মাপের জনসভা হলো আরমানিটোলায়। শামসুল হক এবং মওলানা ভাসানীর পর শেখ মুজিবুর এক অসাধারণ বক্তৃতা করলেন। তিনি বললেন–

"আমি বক্তৃতা করতে উঠে যা বলার বলে জনগণকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম। যদি কোনো লোককে কেউ হত্যা করে, তার বিচার কী হবে?" জনগণ উত্তর দিল ফাঁসি হবে। আমি আবার প্রশ্ন করলাম–"যারা হাজার হাজার লোকের মৃত্যুর কারণ, তাদের কী হবে?" উত্তরে জনগণ বলল– "তাদেরও ফাঁসি হওয়া উচিত।" আমি বললাম না, তাদের গুলি করে হত্যা করা উচিত।" কথাগুলি আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। তারপর বক্তৃতা শেষ করে বললাম–

"চলুন আমরা মিছিল করি এবং লিয়াকত আলী খান দেখুক পূর্ব বাংলার লোক কী চায়!"

শোভাযাত্রা শুরু হলো। মওলানা ভাসানী, শামসুল হক এবং শেখ মুজিবুর সকলের সামনে। যদিও এটা কোনো আইন অমান্য আন্দোলন ছিল না। তবুও পুলিশ দাঁড়িয়ে যায় নবাবপুর রেল স্টেশনের কাছে। আগেই ঠিক করা ছিল যে মিছিল যাবে নাজিরাবাজার রেললাইন পার হয়ে নিমতলী, ঢাকা মিউজিয়াম এবং নাজিমুদ্দীন রোড হয়ে পুনরায় আরমানিটোলায়। কিন্তু নাজিরাবাজারেও পুলিশ পথ আটকে দেয়। এরই মধ্যে কোনোরকম কারণ ছাড়াই পুলিশ টিয়ারগ্যাস ছেড়ে দেয়। ফলে জনগণও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ইট, পাটকেল ছুড়তে থাকে পুলিশকে লক্ষ্য করে। শুরু হলো পুলিশের লাঠিচার্জ। মওলানা ভাসানী এবং শামসুল হক আহত হলেন। পুলিশের লাঠির আঘাত সবচাইতে বেশি পড়েছিল মুজিবুরের উপর। বেশ কিছু কর্মী আহত হলেন মারাত্মকভাবে। শেখ মুজিবুর রহমানকে পুলিশ এমনভাবে আহত করল যে তিনি একসময় অজ্ঞান হয়ে পাশের এক নর্দমায় পড়ে যান। বেশ কয়েকজন কর্মী মুজিবুরকে এই অবস্থায় রিকশা করে মোগলটুলী নিয়ে আসে। তাঁর পা দিয়ে রক্ত পড়ছিল। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার এসে তাঁকে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয় ব্যথার যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। সেদিন পুলিশ সব মিলিয়ে প্রায় তিরিশ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল। সেদিন মুজিবুরের পাশে ছিলেন তাঁরই আত্মীয় সূর্য মিয়া। যিনি প্রায় সারারাত মুজিবুরকে সেবা করেছিলেন। তাঁর প্রকৃত পরিচয় হলো তিনি ফরিদপুরের দত্ত পাড়ার জমিদার বংশের সাইফুদ্দিন চৌধুরী। রাত তখন দুটোর বেশি। এমন সময় মোগলটুলির অফিস ঘিরে ফেলল পুলিশ। উদ্দেশ্য শেখ মুজিবুরকে গ্রেপ্তার করা।

সবাই প্রায় গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন। এই অবস্থায় মুজিবুর যেন গ্রেপ্তার না হন সেই খবরই পাঠিয়েছিলেন ভাসানী সাহেব। এদিকে মুজিবুর আহত এবং অসুস্থ। পুলিশ চারদিক ঘিরে রেখেছে। দরজায় কড়া নাড়ছে দরজা খোলার জন্য। মুজিবুর শুয়েছিলেন তিনতলার ঘরে। কিন্তু তিনি পালাবেন কীভাবে?

তিনতলা থেকে তাঁকে লাফিয়ে পড়তে হবে পাশের বাড়ির দোতলার ছাদে। আবার দুটো দালানের মধ্যে কয়েক হাত ফারাকও আছে। মুজিবুর চোখ বন্ধ করে তিনতলা থেকে দোতলায় লাফ দিয়ে পড়লেন। একটা বালতি লেগে শব্দ হলো ভীষণ। এদিকে পুলিশ তিনতলার দরজা ভাঙার কাজে ব্যস্ত। ফলে কেউ টের পায়নি। রাত তখন তিনটা। কাজী গোলাম মাহবুব এবং মফিজ নামে দুই কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে মুজিবুর পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে মৌলভীবাজার পার হয়ে এক বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। বন্ধু বলতে আবদুল মালেক সর্দারের বাড়ি। সেখান থেকে মুজিবুর পরের দিন চলে গেলেন ক্যাপ্টেন শাহজাহানের বাড়িতে। তাঁর স্ত্রী বেগম নূরজাহান মুজিবুরকে ভাইয়ের মতোই স্নেহ করতেন। তিনি মুজিবুরকে সেবা-যত্ন করলেন। ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে এলেন। মুজিবুরও ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু মুজিবুরকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশের লোক এই বাড়িতেও চলে আসে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে মুজিব আবার পালিয়ে গেলেন। ছদ্মবেশে এবার গিয়ে ওঠেন ইয়ার মোহাম্মদ খানের বাড়িতে। মওলানা ভাসানী এখানেই বিশ্রামে ছিলেন। ভাসানী সাহেবকে পেয়ে মুজিবুর জিজ্ঞাসা করেন কেন গ্রেপ্তার এড়িয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবেন। এর উত্তরে ভাসানী সাহেব তাঁকে বলেছিলেন, তিনি গ্রেপ্তার হয়ে গেলে আওয়ামী লীগের সংগঠনে চরম ক্ষতি হয়ে যাবে।

স্মরণীয় ঘটনা–৭

প্রথম বারের জন্য লাহোরের মাটিতে

সমগ্র পাকিস্তানের পরিস্থিতি তখন অত্যন্ত ভয়াবহ। গণতন্ত্রের লেশমাত্র নেই। পুরোপুরি স্বৈরতান্ত্রিক পথে এগুচ্ছে দেশ। যিনি দেশের প্রধান সেই নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান যে মনে-প্রাণে একজন স্বৈরশাসক তা প্রমাণ হয়ে গেছে। মুসলিম লীগ ছাড়া কেউ অন্য দল করুক তা তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি লীগ সভায় বলেছিলেন– "জো আওয়ামী লীগ করে গা, উসকো শের হাম কুচাল দে গা"। ১৯৫০ সালে মুসলিম লীগ কাউন্সিল সভায় তিনি বলেছিলেন–

"I have always said, rather it has always been my firm belief that the existence of the league not only the existence of the league, but it strength is equal to the existence and strength of Pakistan. So far, as I am concerned, I had dicided in the very beiginning, and I reaffirm it today, that I have always considered myself as the Prime Minister of the league. I never regarded myself as the Prime Minister chosen by the members of the constituent assembly."

লিয়াকত আলীর উক্তি একটি সভ্যতাবিরোধী এবং নজিরবিহীন উক্তি। তিনি প্রকাশ্যে বলছেন আমি দেশ বা জনগণের প্রধানমন্ত্রী নই। বরং আমি একটি দলের প্রধানমন্ত্রী হতে চাই। পাকিস্তান ভবিষ্যতে কোন পথে এগুবে এই উক্তির মধ্য দিয়েই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে মওলানা ভাসানী মুজিবুরকে বললেন লাহোরে গিয়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য। তাঁর পরামর্শ এই সময়ে খুবই প্রয়োজন।

এদিকে মুজিবুরের বিরুদ্ধে চলছে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, অন্যদিকে লাহোরে যাওয়ার মতো টাকা-পয়সাও ছিল না মুজিবুরের হাতে। তবু তাঁকে যেতে হবে লাহোর।

শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে শীতের মধ্যে লাহোরে এসে পৌঁছলেন শেখ মুজিবুর রহমান। প্রথমবার লাহোর পৌঁছেই তিনি যে সমস্যায় পড়েছিলেন তা তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে।

"লাহোরে তখন ভীষণ শীত। আমার তা সহ্য করা কষ্টকর হচ্ছিল। কোনোদিন লাহোর যাই নাই। মিয়া ইফতিখারউদ্দিন সাহেব ছাড়া কেউ আমাকে চিনত না। সোহরাওয়ার্দী সাহেব নবাব মামদোরের বাড়িতে থাকতেন

এ কথা আমি জানি। এক দোকানের সামনে মালপত্র রেখে আমি নবাব সাহেবের বাড়িতে ফোন করলাম। সেখান থেকে উত্তর এল, সোহরাওয়ার্দী সাহেব লাহোরে নাই, বাইরে গেছেন, দুই দিন পরে ফিরবেন। আমার কাছে মাত্র দুই টাকা আছে, কী করব? কোথায় যাব ভাবছিলাম, মালপত্রই বা কোথায় রাখি? বেলা তখন একটা। ক্ষিদেও লেগেছে। সকাল থেকে কিছুই পেটে পড়ে নাই। দুই টাকা মাত্র। কিছু খেলেই তো শেষ হয়ে যাবে। অনেক চিন্তা করে মিয়া সাহেবের বাড়িতে ফোন করলাম। মিয়া সাহেব লাহোরে আছেন তবে বাড়িতে নাই। আমি একটা টাঙ্গা ভাড়া করে মিয়া সাহেবের বাড়ির দিকে রওয়ানা করলাম। ঠিকানা লেখা ছিল। আমি যখন সুটকেস ও সামান্য বিছানা নিয়ে তাঁর বাড়ির সামনে নামলাম, দারোয়ান বলল সাহেব বাড়িতে নাই। একটা বাইরের ঘরে বসতে দিল। সুটকেশটা বাইরেই একপাশে রেখে দিলাম। আমার নাম ও ঠিকানা কাগজে লিখে দিলাম। মিয়া সাহেব আসলে তাঁকে দিতে। মিয়া সাহেব এসেই কাগজটা দেখেই বের হয়ে এলেন, আমাকে চিনলেন এবং খুব আদর করলেন।"

মুজিবুরের কাছ থেকে পূর্ববঙ্গের খবরাখবর, বিশেষ করে নতুন সরকারের কার্যাবলি, মুসলিম লীগের অবস্থা, আওয়ামী লীগের আন্দোলন ইত্যাদি সবকিছুই প্রায় তিনি জেনে নিয়েছিলেন। এদিকে ঠাণ্ডা লেগে মুজিবুরের তীব্র জ্বর এসে যায়। মিয়া সাহেব ওষুধপত্র দিলেন। দুই-এক দিনের মধ্যে জ্বর কমে গেল। এরই মধ্যে সোহরাওয়ার্দী সাহেবও লাহোরে ফিরে এলেন। মুজিবুরও জিনিসপত্র নিয়ে চলে এলেন নবাবের বাড়িতে। শহীদ সাহেব মুজিবুরকে দেখেই জড়িয়ে ধরলেন, আদর করলেন আর সমস্ত খবরাখবর নিলেন। মুজিবুরও পূর্ব পাকিস্তানের যাবতীয় খবরাখবর দিলেন শহীদ সাহেবকে। লাহোরের শীত মুজিবুর সহ্য করতে পারবেন না বুঝতে পেরে সবার আগে শহীদ সাহেব মুজিবুরকে নিয়ে গেলেন কাপড়ের দোকানে। কিনে দিলেন সোয়েটার, কম্বল, মোজাসহ প্রয়োজনীয় সব কিছু। এরই মধ্যে শহীদ সাহেবের বাড়িতে মুজিবুরের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় খান গোলাম মোহাম্মদ খান লুন্দখোর এবং পীর সালাউদ্দিনের সঙ্গে। খান গোলাম মোহাম্মদ খান সীমান্ত আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক। আর পীর সালাউদ্দিন লাহোরের ছাত্র নেতা। মুজিবুরকে পেয়ে এঁরা দুজনই খুশি হলেন। শহীদ সাহেবের কথা মতো এরাই মুজিবুরের জন্য অল্প খরচের হোটেল দেখে দিলেন। শহীদ সাহেবের দেওয়া কম্বল এবং সোয়েটার প্রসঙ্গে মুজিবুর বলেছেন–

"গরম ফুল হাতার সোয়েটার ও কম্বলটা পেয়ে আমার জানটা বাঁচল। কারণ, শীতে আমার অবস্থা কাহিল হতে চলেছিল।"

লাহোর হাইকোর্টের কাছে আক্রান্ত হলেন মুজিবুর

লাহোরে গিয়েও মুজিবুর কিছু কিছু কর্মসূচিতে অংশ নিতে শুরু করেন। লাহোরে গিয়ে মুজিবুর প্রায় প্রতিদিনই শহীদ সাহেবের সঙ্গে হাইকোর্টে যেতেন। অনেকের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় ঘটছিল। বন্ধুত্ব তৈরি হয় নবাব সাহেবের ভাইয়ের সঙ্গেও। এদিকে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করা এবং প্রদেশের আওয়ামী লীগকে নিয়ে একটি নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠন করার ব্যাপারেও মুজিবুর বেশ কিছুদিন ধরেই চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। এই সময়েই ক্যাম্বেলপুরে ছিল সীমান্ত আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সভা। সেই সভায় মুজিবুরকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন লুন্দখোর সাহেব। সেখানে গেলে পীর মানকী শরীফ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। সব শুনে সোহরাওয়ার্দী সাহেব বলেছিলেন, "যাও আলাপ করে এসো। হলে তো ভালোই হয়। আমিও পাঞ্জাবে নবাব সাহেবের সাথে আলাপ করছি।" অর্থাৎ মুজিবুর লাহোরে এসেও সাংগঠনিক কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন।

এই সময়ে মুজিবুর লাহোরে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের ভয়াবহ অবস্থা, শামসুল হক, মওলানা ভাসানীসহ অসংখ্য মানুষকে গ্রেপ্তার করা ইত্যাদি বিষয়কে উল্লেখ করে তিনি এই বিবৃতিটি দিয়েছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই বিবৃতিটি প্রকাশ করেছিল পাকিস্তান টাইমস, ইমরোজ ইত্যাদি কাগজে। এই দুটি কাগজ স্পস্টভাবে লিখেছিল যে বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। যাইহোক ঐ সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য মুজিবুর রাত দশটায় লুন্দখোর সাহেবের সঙ্গে মোটরগাড়িতে করে রওয়ানা হলেন। গাড়ি চালিয়েছিলেন লুন্দখোর সাহেব নিজেই। ভোরের দিকে তাঁরা পৌঁছলেন রাওয়ালপিন্ডি। দুপুর বারোটার মধ্যে তাঁরা পৌঁছে গেলেন পাঞ্জাবের ক্যাম্বেলপুরে। এই সভায় এসে মুজিবুর বেশ কিছু নেতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পীর মানকী শরীফ, সর্দার আবদুল গফুর, সর্দার সেকেন্দার, প্রাক্তন মন্ত্রী শামীম জং প্রমুখ। মুজিবুরকে আলোচনায় অংশ নিতে অনুরোধ করলে তিনি ইংরেজিতে বক্তৃতা করেন। তাঁর ঐদিনের ভাষণের মূল কথাই হলো নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সংগঠনকে সুদৃঢ় করা। তাঁর ইরেজি ভাষণ পশতু

ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। এই সফরে মুজিবুর সীমান্ত প্রদেশের আটক ব্রিজ ও আটক ফোর্ট প্রত্যক্ষ করেন খুব কাছে থেকে। ফেরার পথে আবার লুন্দখোর সাহেবই গাড়ি চালান। প্রথমে রাওয়ালপিন্ডি এবং পরে লাহোর ফিরে আসেন।

এই সময়ে মুজিবুর শহীদ সাহেবের সঙ্গে সারগোদা জেলায় একটি জনসভাতে যোগ দেন। জনসভায় মুজিবুরকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছিল। এই সময় পাকিস্তানের গার্ডিয়ান পত্রিকার প্রতিনিধি মুজিবুরের একটি সাক্ষাৎকার নিয়ে তা প্রকাশ করেছিল। এই সময় মুজিবুর একটি অল পাকিস্তান ছাত্র সংগঠন গঠন করার জন্যও চেষ্টা করেছিলেন। সে জন্য তিনি পাঞ্জাব মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের একজন প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিশেষ করে ছাত্র নেতা ফাহমী এবং নূর মোহাম্মদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রত্যেকেই মুজিবুরের প্রস্তাবে ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন। এমনকি মুজিবুর তাদের আইন কলেজে গিয়েও তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "যদিও আমি এখন আর ছাত্র প্রতিষ্ঠানে নাই তবুও আপনারা যদি রাজি হন অল পাকিস্তান ছাত্র প্রতিষ্ঠান করতে, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগকে রাজি করাতে পারব।" লাহোরের ছাত্রনেতারা একটি গঠনতন্ত্র লিখে মুজিবুরকে দিয়েছিলেন। শুধু পূর্ব পাকিস্তানই নয়, সমগ্র পাকিস্তান নিয়েই ছিল মুজিবুরের ভাবনা-চিন্তা।

লাহোরে থাকাকালীন একদিন মুজিবুর লাহোর হাইকোর্টে যাচ্ছিলেন সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। এমন সময় তিন-চারজন লোক মুজিবুরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে পাকিস্তানের দুশমন হিসেবে গালাগালি দিল এবং তাঁকে মারধোর করল। তারা হান্টার, ছোরা ইত্যাদি নিয়ে এসেছিল। মুজিবুরের বয়স তখন তিরিশ বছর। ভরা যৌবন তাঁর। শক্তিও ছিল শরীরে। একাই তিনি যতটা পারেন প্রতিরোধ করেন। শেষ পর্যন্ত কাছাকাছি দোকান থেকে লোকজন বেরিয়ে আসতে ওরা পালিয়ে গিয়েছিল। মুজিবুর সবাইকে ঘটনাটা জানালেন। পরে জানতে পেরেছিলেন যে, মুসলিম লীগের কর্মীরাই তাকে আক্রমণ করে। এই ঘটনার পর মুজিবুর যথেষ্ট সতর্ক হয়ে চলাফেরা করেছেন লাহোরে। এই সময়ে পাঞ্জাবে প্রগতিশীল লেখকদের একটা সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে মুজিবুর রহমানও অংশগ্রহণ করেন।

লাহোর থেকে ফিরে পঞ্চমবারের জন্য গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন

প্রায় এক মাস লাহোরে ছিলেন মুজিবুর। তিনি যে লাহোরে শহীদ সাহেবের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন তা একেবারে শীর্ষ মহলেও জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। কেননা পূর্ব পাকিস্তানের সরকারও এই খবরটুকু পৌঁছে দিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারের কাছে। তাছাড়া মুজিবুরের বিবৃতিও দু-তিনটে কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। একটি কাগজে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর একটি সাক্ষাৎকারও। ফলে সব মিলিয়ে মুজিবুরের পক্ষে লাহোরে থাকা আর নিরাপদ ছিল না। তিনি যেকোনো সময়ে গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারেন। তাই আর দেরি না করে লাহোর থেকে দিল্লি পৌঁছান ট্রেনে করে। অন্যদিকে দিল্লি থেকে আর একটা ট্রেনে করে কলকাতা চলে এলেন। কলকাতাতে পৌঁছে পার্ক সার্কাস এলাকায় প্রিয় বন্ধু নূরুল আলমের বাড়িতে উঠলেন।

এদিকে পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল শেখ মুজিবুরকে গ্রেপ্তার করার জন্য। সকাল এগারোটায় খুলনার ট্রেন ছাড়ে। প্রায় ছদ্মবেশ ধারণ করলেন মুজিবুর। নানা রকম কৌশল করে গোয়েন্দা বিভাগের লোকজনদের বোকা বানিয়ে যশোরে পৌঁছালেন মুজিবুর। যশোরেও তিনি নিজেকে গোপনেই রাখলেন। রাত দশটায় তিনি পৌঁছে গেলেন খুলনা। খুলনায় পৌঁছেই তাঁকে আরো বেশি ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়েছিল। তিনি নিজের পাঞ্জাবি খুলে লুঙ্গিটাকে উপরের দিকে তুলে মাথায় সুটকেশ নিয়ে কুলির মতো দৌড়াতে থাকলেন জাহাজ ঘাটের দিকে। গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন মুজিবুরকে চিনতেই পারল না। জাহাজ ঘাট থেকে অন্য পথে বেরিয়ে তিনি একটি রিকশায় উঠে চলে গেলেন তাঁর এই ভাইয়ের বাড়ি। রাতটা ভাইয়ের বাড়ি কাটিয়ে ভোরের জাহাজে উঠবেন। একটি হাফ প্যান্ট, কোট, মাথায় টুপি ইত্যাদি পরে এখানেও পুলিশের ছোখে ধুলো দিয়ে জাহাজে এসে উঠলেন। জাহাজটি যাবে গোপালগঞ্জ-বরিশাল হয়ে নারায়ণগঞ্জ। ট্রেনের মধ্যে বহু পরিচিত মানুষ। এই মধ্যে মুজিবুর নিজেকে যতটা সম্ভব আড়াল করে রাখলেন। এরই মধ্যে ভাইজান ভাইজান বলে কেউ কেউ চিৎকারও দিয়েছিল। মুজিবুর সবাইকেই ইশারা দিয়ে নিষেধ করেছেন। গোপালগঞ্জ থেকেও প্রায় দু'ঘণ্টা সময় লাগে মুজিবুরের বাড়ির নিকটবর্তী জাহাজ ঘাটে

যেতে। যাই হোক পাটগাতি পৌঁছতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। সেখান থেকে ঘণ্টাখানেক নৌকা করে গিয়ে মুজিবুর বাড়িতে পৌঁছলেন।

এই পর্বে সাত-আট দিন মুজিবুর ছিলেন বাড়িতে। তিনি যে মা, বাবা, স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে একেবারে ঘরোয়া পরিবেশে বাড়িতেই রয়েছেন তা পুলিশ আন্দাজই করতে পারেনি। তাঁকে ঢাকা যেতেই হবে। সিদ্ধান্ত নিলেন গ্রেপ্তার এড়াতে হলে গোপালগঞ্জ এবং বরিশাল হয়ে ঢাকা যাওয়া সম্ভব নয়। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে মুজিবুর লিখেছেন এইভাবে : " আমি গোপালগঞ্জের দুই ঘাট পরে জাহাজে উঠব। তারপর কবিরাজপুর থেকে নৌকায় মাদারীপুর মহকুমার শিবচর থেকে জাহাজে উঠব। তাই একদিন আমার বড় বোনের বাড়িতে বেড়িয়ে যাব। বড় বোনের বাড়ি শিবচর থেকে মাত্র পাঁচ মাইল পথ। রেণু বলল কত দিন দেখা হবে না বলতে পারি না। আমিও তোমার সাথে বড় বোনের বাড়িতে বেড়াতে যাব। সেখানেও তো দুই একদিন থাকবা। আমি ও ছেলে-মেয়ে দুইটা তোমার সাথে থাকব। পরে আব্বা যেয়ে আমাকে নিয়ে আসবেন। আমি রাজি হলাম কারণ আমি তো জানি এবার আমাকে বন্দি করলে সহজে ছাড়বে না।"

বড় বোনের বাড়িতে মুজিব ছিলেন সাত দিন। ছেলে-মেয়ে এবং স্ত্রীকে নিয়ে যেন গভীর মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছেন। মুজিবুর তাঁর অনুভব ব্যক্ত করেছেন এইভাবে : "আমরা বোনের বাড়িতে পৌঁছিলাম, একদিন দুইদিন করে সাতদিন সেখানে রইলাম। ছেলেমেয়েদের জন্য যেন একটি বেশি মায়া হয়ে উঠেছিল। ওদের ছেড়ে যেতে মন চায় না। তবুও তো যেতে হবে। দেশ সেবায় নেমেছি, দয়া মায়া করে লাভ কি? দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবাসলে ত্যাগ তো করতেই হবে এবং সে ত্যাগ চরম ত্যাগও হতে পারে।...আমি রেণুকে বললাম, এতদিন একলা ছিলে, এখন আরও দু'জন তোমার দলে বেড়েছে। আমার দ্বারা তো কোনো আর্থিক সাহায্য পাবার আশা নাই। তোমাকেই চালাতে হবে। আব্বার কাছে তো সকল সময় তুমি চাইতে পার না, সে আমি জানি। আর আব্বাই কোথায় এত টাকা পাবেন? আমার টাকার বেশি দরকার নাই। শীঘ্রই গ্রেপ্তার করে ফেলবে। পালিয়ে বেড়াতে আমি পারব না। তোমাদের সাথে কবে আর দেখা হয় ঠিক নাই।"

একটা মানসিক কষ্ট নিয়ে মুজিবুর বিদায় নিলেন রাতের বেলায়। যাতে হাসিনা ঘুমিয়ে থাকে। তা না হলে তো ছাড়বেই না। বিদায় বেলায় শুধু চোখের পানি ফেলেছেন রেণু। বড় বোনের দেবর এবং মুজিবুরের বন্ধু সাইফুদ্দিন চৌধুরী সাহেব মুজিবুরকে ঢাকায় পৌঁছে দেবেন বলে স্থির হলো। রাতে নৌকো করে এসে তাঁরা চান্দেরচর স্টেশনে পৌঁছোলেন সকালে।

সেখান থেকে ভারপাশা গেলেন। সেখানে গিয়ে শুনলেন গোয়ালন্দ-নারায়ণগঞ্জ মেল স্টিমার ছেড়ে দিয়েছে কিছুক্ষণ আগে। ফলে সারাদিন এভাবে গোপনে কাটিয়ে রাতে উঠলেন স্টিমারে এবং পরের দিন সকালে পৌঁছলেন মুন্সিগঞ্জ। মুন্সিগঞ্জ থেকে এঁরা হেটে চলে আসেন মীরকাদিম পর্যন্ত। সেখানে এক আত্মীয়ের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া সেরে নৌকো করে রওয়ানা দিলেন নারায়ণগঞ্জের উদ্দেশে। সন্ধ্যার পর নারায়ণগঞ্জ পৌঁছে রিকশা করে গিয়ে ওঠেন খান সাহেব ওসমান আলীর বাড়িতে। এই বাড়িটিই ছিল একসময়ে মুজিবুরদের আস্তানা। এই বাড়ির আতিথেয়তা ছিল অপরিসীম। যাই হোক এখানে কিছুটা খাওয়া-দাওয়া করে ট্যাক্সি করে পৌঁছলেন ঢাকা এবং রিকশা করে চলে গেলেন ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে। শওকত মিয়া দৌড়ে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে সব খবরাখবর নিলেন। লাহোর যাত্রা পর্ব শুনলেন মুজিবুরের মুখ থেকে। মুজিবুরও মওলানা ভাসানী, শামসুল হকসহ সকলের খোঁজ খবর নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

শওকত মিয়ার কাছ থেকে মুজিবুর জানলেন পুলিশি নির্যাতনের ভয়েই মূলত অনেকেই আর যোগাযোগ রাখছেন না। তবুও এই সময়ে যাঁরা গোপনে আওয়ামী লীগের কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মওলানা ভাসানী, শামসুল হক, আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খান, এম. এল. এ. আনোয়ারা খাতুন, এম. এল. এ. খয়রাত হোসেন, এম. এল. এ. আলী আহমেদ খান, খোন্দকার মোশতাক আহমেদ, ইয়ার মোহাম্মদ খান, নারায়ণগঞ্জের আবদুল আওয়াল, আলমাস আলী, শামসুজ্জোহাসহ বেশ কয়েকজন। পুলিশের চোখে আর ধুলো দেওয়া সম্ভব হলো না। এরই মধ্যে গোয়েন্দা পুলিশ খবর পেয়ে গেছে যে মুজিবুর ঢাকাতে এসেছেন। মুজিবুর আর পালাতে চাইলেন না। তিনি যেখানে ছিলেন সেই বাড়িটি একদিন পুলিশ ঘেরাও করে ফেলল। মুজিবুর সহকর্মী সহযোদ্ধাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পুলিশের গাড়িতে উঠলেন। নিরাপত্তা আইনে সেদিন পূর্ব পাকিস্তানের সরকার মুজিবুরকে গ্রেপ্তার করে। শুরু হলো আবার শেখ মুজিবুর রহমানের বন্দি জীবন।

জেলের মধ্যে তিনি একটি সুন্দর বাগান তৈরি করেছিলেন

জেলে মুজিবুরকে সাধারণ কয়েদিদের সঙ্গেই রাখা হয়েছিল। সাধারণ কয়েদিদের সঙ্গে খেতে হবে। মানতে পারছিলেন না মুজিবুর। জেলের ভেতর যারা সাধারণ কর্মচারী ছিলেন, তারাও এই বিষয়টিকে মানতে পারছিলেন না। জেলে আরো যে কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন তাঁরাই মুজিবুরকে তাদের কাছে নিলে গেলেন। মুজিবুর তাঁদের সঙ্গে খেলেন এবং থাকলেন। জেলের মধ্যে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে ছিলেন মওলানা ভাসানী এবং শামসুল হক। তাঁরা অবশ্য রাজনৈতিক বন্দিদের মর্যাদা পেয়েছিলেন। যদিও পরের দিনই কর্তৃপক্ষ মুজিবুরকে রাজবন্দির মর্যাদা দিয়ে মওলানা সাহেব এবং শামসুল হক সাহেবের কাছে নিয়ে এসেছিল। দুই দেশপ্রেমিক নেতাকে একেবারে কাছে পেয়ে মুজিবুর বিস্তারিতভাবে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। জেলখানার ভেতরে সময়ের অভাব নেই। দীর্ঘ সময় ধরে মুজিবুর আলোচনা করলেন তাদের সঙ্গে। এই সময়ের আলোচনার বিষয় ছিল আওয়ামী লীগের পরবর্তী কর্মসূচি, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের পরামর্শ, নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠন ইত্যাদি।

শামসুল হক সাহেব বিয়ে করেছেন মাত্র দেড় মাস হয়েছে। এরই মধ্যে তাঁকে জেলে আসতে হয়েছে। তাঁর স্ত্রী বেগম আফিয়া খাতুন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তিনিও মাঝেমধ্যে জেল গেটে আসতেন স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে। মুজিবুর অনুভব করতেন বিষয়টা। যেদিন তিনি আসবেন স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে সেদিনই মুজিব ফুলের তোড়া বানিয়ে বেগম আফিয়া খাতুনকে দিতেন। ফুলের প্রতি মুজিবুরের ছিল দারুণ আকর্ষণ। জেলখানায় ফুলের বাগানের অবস্থা দেখে তাঁর কষ্ট হতো। তিনি নিজেই হাত লাগালেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি জেলখানার মধ্যে একটি সুন্দর ফুলের বাগান তৈরি করে ফেললেন। এদিকে মুজিবুররা যখন জেলের ভেতর তখন ঢাকা এবং কলকাতায় নতুন করে আবার দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। কলকাতায় মারা গেল নিরপরাধ মুসলমান আর ঢাকা ও বরিশালে মারা গেল নিরপরাধ হিন্দু। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেবকে কলকাতায় হত্যা করা হয়েছে বলে কে বা কারা রটিয়ে দিয়েছিল। তার পরেই এই ভয়ংকর অবস্থা। দাঙ্গার খবর শুনে গভীর উদ্বেগে মুজিবুর জেলের ভেতর মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। সেই সময়ে ঢাকার অনেক দাঙ্গাবাজকে গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে

আসা হয়েছিল। দাঙ্গা করে যে কোনো লাভ হয় না, দাঙ্গায় যে দোষীরা শাস্তি পায় না, কেবল নির্দোষ মানুষ মারা যায় তা মুজিবুর জেলের ভেতরে বসেই এদের বুঝিয়ে দিলেন।

শেখ মুজিবুরদের পক্ষে সেই সময় মামলা লড়েছিলেন আইনজীবী আতাউর রহমান সাহেব। লিয়াকত আলী খান তখনো ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জনাব নূরুল আমিন। এদিকে জেলের ভেতর তখন অনশন করছেন বন্দিরা। ইংরেজ আমলের সুযোগ-সুবিধা প্রদানই ছিল অবস্থানরত রাজনৈতিক বন্দিদের দাবি। এই অনশনে শিবেন রায় নামে একজন ধর্মঘটী মারাও গিয়েছিলেন। এই সময়ই ঘটেছিল আরেকটি মর্মান্তিক ঘটনা। ১৯৫০ সালের প্রথম দিকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের খাপড়া ওয়ার্ডের কামরায় রাজনৈতিক বন্দিদের উপর গুলি করে সাতজনকে হত্যা করা হয়। মুজিবুর জেলের ভেতর থেকেই গর্জে উঠেছিলেন এর প্রতিবাদে।

মামলায় মুজিবুরকে দেয়া হলো তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড

১৯৪৯-৫০ সাল। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে কায়েম হয়েছে এক ভয়াবহ রাজত্ব। বিরোধী কোনো কণ্ঠস্বরই সহ্য হচ্ছে না শাসকগোষ্ঠীর। সর্বত্র এক স্বৈরাচারী দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে দমন করো। মুজিবুর জেলে। তাঁর মামলা চলছে। মোহাম্মদ আলী জিন্নার প্রয়াণের পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এক স্বৈরশাসকে রূপান্তরিত হলেন। তিনি যখন শুনেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সদ্য প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ দল তাদের ম্যানিফেস্টো কর্মসূচি ইত্যাদি প্রকাশ করেছে এবং পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন দাবি করছে তখন থেকেই তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে দমন করার পথ ধরেছিলেন। তিনি এতটাই সংকীর্ণ ছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে শুকিয়ে সমগ্র শিল্প-কলকারখানা ইত্যাদি পশ্চিম পাকিস্তানে নির্মাণ করার জন্য অনুমোদন দেন।

এই রকম একটা পরিস্থিতিতে ১৯৫০ সালের প্রথম দিকে ঢাকাতে আহ্বান করা হয় একটি গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন। এই কনভেনশনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট সদস্য আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দিন আহমেদ, প্রাক্তন মন্ত্রী জনাব হামিদুল হক চৌধুরী প্রমুখ। এই কনভেনশন থেকে পূর্ব বাংলার জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়। শুধু তা-ই নয়, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী যখন ঢাকা এলেন তখন তাঁকে এই দাবি নিয়ে ডেপুটিশনও দেয়া হয়েছিল।

মুজিবুর, মওলানা ভাসানী এবং শামসুল হক রয়েছেন জেলের ভেতর। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে। এদিকে এই সময় শামসুল হকের স্বাস্থ্য খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল। মুজিবুর এই প্রিয় বন্ধুটিকে নিয়ে জেলের ভেতর খুবই সমস্যায় ছিলেন। শেষ পর্যন্ত নানা রকম কৌশল করে তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা হলো। জেলে আসার আগে মওলানা ভাসানী সাহেব যে সাপ্তাহিক ইত্তেফাক কাগজটি প্রকাশ করেছিলেন সেটি অর্থের অভাবে বন্ধ হয়ে গেল। যদিও পরবর্তীকালে ভাসানী সাহেব এবং শেখ মুজিবুরের অনুগামী মানিক ভাই এই কাগজটি চালাতে রাজি হলেন। পত্রিকাটি নতুন করে প্রকাশিত হলো।

কিছুদিনের মধ্যেই কাগজটি জনপ্রিয় হয়ে উঠল। আওয়ামী লীগ কর্মীরাই জেলায় জেলায় কাগজটিকে চালাতে সাহায্য করে। জনগণ ধীরে ধীরে এই কাগজটিকেই আওয়ামী লীগের কাগজ হিসেবে গ্রহণ করল।

মুজিবুরদের বিরুদ্ধে যে মামলা চলছিল সেই মামলার রায় বেরোল ১৯৫০-এর শেষের দিকে। মামলায় মওলানা ভাসানী ও শামসুল হককে মুক্তি দেয়া হলো এবং আবদুর রউফ, ফজলুল হক এবং শেখ মুজিবুরকে দেয়া হলো তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড। এর কিছুদিন পরেই মুজিবুরকে ঢাকা জেল থেকে নিয়ে যাওয়া হলো গোপালগঞ্জে সাব-জেলে। সেখানে মুজিবুরের নামে চলছিল অন্য আরেকটি মামলা। মুজিবুর এক বছরের মতো ছিলেন ঢাকা জেলে। পরে তাঁকে নারায়ণগঞ্জ হয়ে খুলনা-বরিশাল দিয়ে গোপালগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

গোপালগঞ্জে সাব-জেলে মুজিবুর তাঁকে দেখতে লোকারণ্য

ঢাকার জেল। মুজিবুরের যেন দিন আর শেষ হচ্ছিল না। জেলে ফুলের বাগান তিনি নিজের থেকেই করেছিলেন। সেটা কোনো আরোপিত বিষয় ছিল না। মুজিবুর একদিকে নিরাপত্তা বন্দি আবার অন্যদিকে সাজাও ভোগ করেন। জেলের ভেতর প্রত্যেককেই কোনো না কোনো কাজ করতে হতো। সেই হিসেবে মুজিবুরকে দেয়া হয়েছিল সুতো কাটার কাজ। জেলে বসে থাকাটা সময়ের অপচয় বলে তাঁর মনে হতো। পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য কোনো কাজ করতে পারছেন না বলে তাঁর মনটাও খারাপ থাকত কোনো কোনো সময়।

এরই মধ্যে নির্দেশ এলো মুজিবুরকে ঢাকা থেকে গোপালগঞ্জ সাব-জেলে নিয়ে যাওয়া হবে। কারণ মুজিবুরের নামে অন্য আরেকটি মামলা চলছিল গোপালগঞ্জ থানায়। মুজিবুরকে খুলনা মেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। খুলনা মেল যায় নারায়ণগঞ্জ এবং বরিশাল হয়ে। এই সময় ঘটল আরেকটি ঘটনা। প্রায় এক বছর ধরে মুজিবুর রয়েছেন জেলে। বাড়ির সঙ্গেও যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন। সেই সময় মুজিবুরের মা, বাবা, স্ত্রী, সন্তানদের নিয়ে ঢাকা এসেছিলেন মুজিবুরের সঙ্গে দেখা করার জন্য। ঠিক একই সময় মুজিবুরও রওয়ানা হয়েছে গোপালগঞ্জের উদ্দেশে। গোপালগঞ্জে এসে মুজিবুর জানতে পারেন যে তাঁর পিতা বাড়ির সবাইকে নিয়ে ঢাকায় গেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। মুজিবুরকে গোপালগঞ্জের পুলিশ লাইনে নিয়ে যাওয়া হলো।

পরের দিন দশটায় মুজিবুরকে কোর্টে তোলা হবে। সকাল থেকেই থানা এবং কোর্ট চত্বরে ব্যাপক লোক সমাগম হতে থাকে। একটা সময় লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় কোর্ট চত্বর। সকলেই একটি বারের জন্য মুজিবুরকে দেখতে চায়। থানা থেকে কোর্ট। দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার। এই পথটুকু মুজিবুরকে নিয়ে হেঁটেই যেতে হয়েছে। গোপালগঞ্জের প্রতিটি মানুষের সঙ্গেই মুজিবুরের পরিচয় ছিল। দোকানপাট, বাড়িঘর থেকে প্রতিটি মানুষ রাস্তায় চলে আসেন তাদের প্রিয় মানুষটিকে একটি বারের জন্য দেখতে। গোপালগঞ্জের প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে মুজিবুরের নাড়ির সংযোগ। তাই তিনি প্রত্যেকটি মানুষকে আলাদা আলাদাভাবে তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করেন। গোপালগঞ্জের এই আদালতের কাছেই ছিল মুজিবুরের মামার বাড়ি। তাঁর নাম ছিল আবদুর রাজ্জাক খান। তিনি ছিলেন আবদুস সালাম খানের ভাই।

নামকরা মোক্তার ছিলেন তিনি। তাঁর বাড়ি থেকেই দুপুরের খাবার এলো। এই অঞ্চলে তিনি ছিলেন রাজা মিয়া নামে পরিচিত। মুজিবুর তাঁকে ডাকতেন রাজা মামা বলে। ঢাকার জেলে মুজিবুর যত দিন ছিলেন তত দিন প্রকৃতিকে অনুভব করতে পারেননি। রাতের আকাশ দেখতে পাননি, লক্ষ-কোটি নক্ষত্র দেখতে পাননি। কারণ সন্ধের আগেই জেলের কুঠরিতে ঢুকে যেতে হতো।

গোপালগঞ্জে এসে প্রাণভরে রাতের আকাশ দেখলেন মুজিবুর। অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করলেন। দেখা করতে এসেছিলেন অনেকেই। নিরাপত্তা কর্মীরাও এই গল্পগুজবে যোগ দিলেন। পরের দিনও মুজিবুর কোর্টে হাজিরা দিলেন। কিন্তু সরকারি উকিল ছিলেন অনুপস্থিত। সরকারি উকিলের নাম ছিল রায় বাহাদুর বিনোদ ভদ্র। দুই-একদিনের মধ্যেই মুজিবুর জানতে পেরেছিলেন যে, মামলাটিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ফরিদপুর কোর্টে। গোপালগঞ্জ থেকে ফরিদপুরের দূরত্ব কম নয়। মুজিবুরকে পুনরায় নিরাপত্তা রক্ষীরা জাহাজে করে নিয়ে রওয়ানা হলো। প্রথমে গোপালগঞ্জ থেকে জাহাজে করে মাদারীপুর। মাদারীপুর থেকে সিন্ধিয়াঘাট। সেখানে রাত কাটিয়ে পরের দিন লঞ্চে করে ভাঙ্গা নামক একটি স্থানে এবং সেখান থেকে গাড়ি করে ফরিদপুর পৌঁছালেন মুজিবুর। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়াতে পুলিশ লাইনে নিয়ে যাওয়া হলো মুজিবুরকে। মুজিবুরকে নিয়ে ঢাকা থেকে গোপালগঞ্জ হয়ে ফরিদপুর পর্যন্ত এই যে পরিক্রমা তাতে নিরাপত্তাকর্মীরা মুজিবুরের সঙ্গে অমায়িক ব্যবহার করে বলে পরবর্তীকালে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই জানিয়েছেন তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে। ফরিদপুর জেলের হাসপাতালের দোতলায় একটি রুমে মুজিবুরকে রাখা হয়েছিল।

হাসিনা আমার গলা ধরল আর ছাড়তে চায় না

শেখ মুজিবুর রহমান যে মানুষকে কতটা ভালোবাসতেন তা আবারও দেখা গেল ফরিদপুর জেলে। ১৯৩৮-৩৯ সালে যে ডাকাত মুজিবুরের বাড়ি ডাকাতি করে সোয়াশো' ভরি সোনার গহনা এবং মুজিবুরের মায়ের কয়েক হাজার টাকা চুরি করেছিল, সেই রহিম ডাকাতের সঙ্গে মুজিবুরের দেখা হয়ে গেল–ফরিদপুরের জেলে। সেই ডাকাতের সঙ্গে মুজিবুর জেলে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন, জেনে নেন তাঁর সমস্যা। ফরিদপুর জেলে তখনো কয়েদিদের দিয়ে ঘানি ঘুরিয়ে তেল তৈরি করা হচ্ছিল। যা দেখে মুজিবুর অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। এক মাস ফরিদপুর জেলে কাটানোর পর মুজিবুরকে কর্তৃপক্ষ আবার নিয়ে গেলেন গোপালগঞ্জে। জেল গেট থেকে ট্যাক্সি করে ভাঙ্গা, সেখান থেকে সিন্ধিয়াঘাট, মাদারীপুর, হরিদাসপুর হয়ে মুজিবুরকে নিয়ে নিরাপত্তারক্ষীরা গোপালগঞ্জে পৌঁছোয়।

মুজিবুরের গ্রামের বাড়ি ছিল গোপালগঞ্জ থেকে চৌদ্দ মাইল দূর। এই চৌদ্দ মাইল নৌকা করে এসে গোপালগঞ্জের ঘাটে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন মুজিবুরের মা, বাবা, স্ত্রী আর দুটি সন্তান–হাসিনা এবং কামাল। প্রায় এক বৎসর হয়ে গেল তাঁদের সঙ্গে দেখা নেই মুজিবুরের। গোপালগঞ্জের ঘাটেই দেখা হয়ে গেল সকলের সঙ্গে। মুজিবুর বর্ণনা করছেন এইভাবে–

"এক বৎসর পরে আজ ওদের সাথে আমার দেখা। হাসিনা আমার গলা ধরল আর ছাড়তে চায় না। কামাল আমার দিকে চেয়ে আছে, আমাকে চেনেও না আর বুঝতে পারে না আমি কে? মা কাঁদতে লাগল। আব্বা মাকে ধমক দিলেন এবং কাঁদতে নিষেধ করলেন।"

মায়ের কান্না দেখে মুজিবুরও নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না। মুজিবুরকে আদালতে তোলা হলো। কোর্টচত্বর ভিড়ে ছয়লাব। মুজিবুরের পরিবারের লোকজন যাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন আদালত সেই আবেদনটুকুও মঞ্জুর করেন। বাড়ির সবাই থানায় এসেই মুজিবুরের সঙ্গে মিললেন। পরের দিন আবার তাঁকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকেই সরাসরি ফরিদপুরের জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ফরিদপুর থেকে গোপালগঞ্জে আসা-যাওয়া ছিল তখনকার সময়ে ভীষণ কষ্টকর। তা সত্ত্বেও বারবার তারিখ পড়াতে এই সময় মুজিবুরকে বেশ কয়েকবার গোপালগঞ্জ এবং ফরিদপুরের মধ্যে আসা-যাওয়া করতে হয়েছে।

মুজিবুর ভেবে দেখলেন যে, তিনি যদি খুলনা জেলে থাকেন তাহলে গোপালগঞ্জে অনেক সহজেই যাওয়া-আসা করতে পারবেন, কষ্ট কিছুটা কম হবে। তিনি আবেদন করলে তাঁর আবেদন মঞ্জুর হয়। মুজিবুরকে খুলনা জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। রাজশাহী-যশোর হয়ে মুজিবুরকে খুলনা জেলে পাঠানো হলো। খুলনা জেলে এসেই মুজিবুরের শরীর খারাপ হতে লাগল। খুলনা জেলের অবস্থা সম্পর্কে মুজিবুর বলেন–

"অন্য কোনো রাজনৈতিক বন্দি তো এ জেলে নাই। আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কর্তৃপক্ষ আমাকে পাঠাল কেমন করে এখানে! বোধহয় ছয়টা সেল, সেলগুলোর সামনে চৌদ্দ ফিট দেওয়াল। একদিকে ফাঁসির ঘর, অন্যদিকে বত্রিশটা পায়খানা। সমস্ত কয়েদিরা ঐখানেই পায়খানা করে। যে তিন-চার হাত জায়গা আছে সামনে সেটাতেও দাঁড়াবার উপায় নাই দুর্গন্ধে।"

খুলনা জেলে যে মুজিবুর বাস করতে পারবেন না সেটা বুঝতে পেরে তিনি জেলার সাহেবকে উপরে লেখার জন্য অনুরোধ করেন। এদিকে অনিয়ম, কম খাওয়া, কম ঘুম ইত্যাদি কারণে মুজিবুরের শরীর একেবারে ভেঙে পড়ে। তিনি লিখেছেন এভাবে–

"এই অন্ধকূপের মধ্যে থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। জানালা নাই, একটা মাত্র দরজা, তার সামনেও আবার দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। রাজশাহীর একজন সিপাহীর ডিউটি প্রায় ওখানে পড়ত। চমৎকার গান গাইত। সে আসলেই তার গান শুনতাম।"

এই অবস্থায় গোপালগঞ্জের কোর্টে হাজিরা দিতে হচ্ছে মুজিবুরকে। দিন দিন তাঁর শরীর আরো খারাপ হতে লাগল। তিনি বলেছেন–"এক মাসে শরীর আমার একদম ভেঙে গিয়েছে। চোখের অবস্থা খারাপ। পেটের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে। বুকে ব্যথা অনুভব করতে শুরু করেছি। রেণু আমাকে সাবধান করল এবং বলল, ভুলে যেও না, তুমি হার্টের অসুখে ভুগছিলে এবং চক্ষু অপারেশন হয়েছিল। ওকে বোঝাতে চেষ্টা করতাম, আর কি করা যায়। হাচু আমাকে মোটেই ছাড়তে চায় না। আজকাল বিদায় নেওয়ার সময় কাঁদতে শুরু করে। কামালও আমার কাছে এখন আসে। হাচু আব্বা বলে দেখে কামালও আব্বা বলতে শুরু করেছে। গোপালগঞ্জ থানা এলাকার মধ্যে থাকতে পারি বলে কয়েক ঘণ্টা ওদের সাথে থাকতে সুযোগ পেতাম।"

খুলনা জেলে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল শেখ মুজিবুরের জীবন

মুজিবুর ভেবেছিলেন যে, খুলনা জেলে থাকলে গোপালগঞ্জের কোর্টে তাঁর পক্ষে যাওয়া-আসা করা সহজ হবে। কিন্তু খুলনা জেলের পরিবেশ যে এতটা অস্বাস্থ্যকর তা তাঁর জানা ছিল না। খুলনা জেলের পরিবেশ এতটাই অস্বাস্থ্যকর যে, কয়েক দিন থাকলে সুস্থ লোকও অসুস্থ হয়ে পড়বে। মুজিবুরের শরীর-স্বাস্থ্য এতটা খারাপ ছিল না। কিন্তু খুলনা জেলে কয়েক দিন থেকেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। একই সঙ্গে তিনি পেটের সমস্যা, চোখের সমস্যায় আক্রান্ত হলেন। একই সঙ্গে তাঁর হার্টের সমস্যাও বেড়ে গিয়েছিল। খুলনা জেলেই নূরুন্নবী নামে রাজশাহীর একজন রাজনৈতিক বন্দির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল মুজিবুরের। তাঁর সঙ্গে কথা বলে মুজিবুর বেশ কষ্ট পেয়েছিলেন। ছেলেটির একটি পা ছিল না। একটি পায়ের উপর ভিত্তি করেই সে চলাফেরা করত। রাজশাহীতে যখন রাজবন্দিদের উপর গুলি চালিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ, তখন তাঁর পায়ে গুলি লেগেছিল এবং চিকিৎসকরা তাঁর একটি পা কেটে বাদ দিয়েছিল। এই জেলেই মুজিবুরের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল কৃষকনেতা বিষ্ণু চ্যাটার্জির। তাঁকে দেখেও মুজিবুরের বড়ই কষ্ট হয়েছিল। কারণ তাঁকে একজন ডাকাতির মামলায় সাধারণ কয়েদি হিসেবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, তার পায়ে ডান্ডা বেড়ি দেয়া হয়েছিল।

এই বন্দিদের কাছ থেকেই মুজিবুর শুনেছিলেন রাজশাহী হত্যাকাণ্ডের কথা। দেশ স্বাধীন হবার পরেও কীভাবে রাজশাহী জেলে গুলি করে সাতজন স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজবন্দিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল তা মুজিবুর জেনেছিলেন তাদের মধ্যদিয়ে। এই হত্যাকাণ্ডে যারা আহত হয়েছিলেন তারাও প্রায় সকলেই প্রতিবন্ধী হয়েই বেঁচে ছিলেন। এদিকে মুজিবুরের এই পর্বের জেল জীবন আঠারো মাস হয়ে গেছে। খুলনা জেলেও অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তিন মাস। এই তিন মাসে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল মুজিবুরের জীবন। তাঁর শরীর এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি আর বাঁচবেন না বলেই তাঁর মনে হয়েছিল। তাঁর শরীর খারাপ হয়ে গেছে বটে কিন্তু কোনো ধরনের হতাশা তাঁকে গ্রাস করতে পারে নাই। ভবিষ্যতে একদিন না একদিন সুন্দর সকাল আসবে বলে এক বুক আশা নিয়েই তিনি অতিক্রম করেছেন খুলনা জেলের তিন মাসের জীবন।

সেই সময় নিয়ম ছিল যে, রাজবন্দিদের ক্ষেত্রে সরকার ছয় মাস পর পর নতুন করে নির্দেশ দেবে। কিন্তু মুজিবুরের নামে কোনো নির্দেশ না থাকায় খুলনা জেল কর্তৃপক্ষ তাকে পুনরায় গোপালগঞ্জের আদালতে পাঠিয়ে দেয়। গোপালগঞ্জে এসে মুজিবুর যেন নতুন জীবন পেলেন। এদিকে গোপালগঞ্জের আদালতও মুজিবুরকে জামিনে মুক্তি দিয়ে দেন। গোপালগঞ্জের মানুষ একটি বড়ো শোভাযাত্রা করে সেদিন মুজিবুরকে থানা থেকে নিয়ে এসেছিলেন। একটা খুশির বন্যা যেন বইছিল চারদিকে। মুজিবুরের বাড়িতেও একটা আনন্দের বাতাবরণ। সবাই প্রস্তুত মুজিবুরকে নিয়ে নৌকা করে বাড়িতে যাওয়ার জন্য। ঠিক এমন সময়ই এলো সেই দুঃসংবাদ। পুলিশ ইন্সপেক্টর এবং গোয়েন্দা কর্মচারীরা এসে মুজিবুরকে বললেন–এইমাত্র রেডিওগ্রাম এসেছে যে নিরাপত্তা আইনে মুজিবুরকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হবে। আকাশ ভেঙে পড়ল সকলের মাথার উপর। খবর চলে গেল মুজিবুরের বাড়িতে। আবার শুরু হলো কান্না। এমনিতেই মুজিবুর অসুস্থ। তার উপর আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করার অর্ডার। সাধারণ মানুষ যেমন এই ঘটনা মানতে পারছিলেন না, তেমনি সরকার প্রশাসন ও পুলিশের লোকরাও মানতে পারছিলেন না। সবাই ভাবছিলেন যে, আঠারো মাস জেল খাটার পর আবার কেন গ্রেপ্তার!

জেল থেকে মুক্ত হয়েই ষষ্ঠবারের জন্য গ্রেফতার

প্রথমে ঢাকা জেল, পরবর্তীকালে গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর এবং খুলনা জেলে প্রায় আঠারো মাস নিরাপত্তা আইনে জেল খাটার পর জেল থেকে মুক্ত হয়ে ষষ্ঠবারের জন্য গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন বাংলাদেশের জনগণের প্রিয় মানুষ শেখ মুজিবুর রহমান। কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিলেন মুজিবুরকে এবার রাজবন্দি হিসেবে রাখা হবে ফরিদপুর জেলে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুজিবুরকে ফরিদপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হলো। মুজিবুরকে জেলের যে ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেখানে তিনি দুজন পরিচিত মানুষকে পেয়েছিলেন। এদের একজন হলেন গোপালগঞ্জের বাবুচন্দ্র ঘোষ এবং মাদারীপুরের বাবু ফণি মজুমদার। ফণি মজুমদার ছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা। ইংরেজ আমলে জেল খেটেছেন আট-নয় বছর। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই ফণি মজুমদারকে শ্রদ্ধা করেন।

অন্যদিকে একজন স্বনামধন্য সমাজসেবী হিসেবে সুপরিচিত মানুষ হলেন চন্দ্রঘোষ। তিনি সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। গোপালগঞ্জে অনেক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। তাঁকেও সমাজের সব অংশের মানুষ শ্রদ্ধা করতেন। তিনি একটি চক্রান্তের শিকার হয়ে জেল খেটেছেন। মুজিবুরকে পেয়ে জেলের কমিউনিস্ট, অ-কমিউনিস্ট সকল রাজনৈতিক বন্দিরাই খুশি হয়েছিলেন। ফরিদপুরের জেলে এসেই মুজিবুরের তীব্র জ্বর হয়েছিল। জ্বরের সঙ্গে ছিল মাথার যন্ত্রণা, বুকে ব্যথা ইত্যাদি। জেলের মধ্যে অসুস্থ মুজিবুরকে প্রতিদিন সেবা-যত্ন করেছেন এই চন্দ্র ঘোষ এবং ফণি মজুমদার।

এঁদের দুজনের কথা বলতে গিয়ে মুজিবুর তাঁর গ্রন্থে বলেছেন–

"রাতভর চন্দ্রবাবু আমার মাথার কাছে বসে পানি ঢেলেছেন। যখনই আমার হুঁশ হয়েছে দেখি চন্দ্রবাবু বসে আছেন। ফণিবাবুও অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতেন আমার জন্য। তিন দিনের মধ্যে আমি চন্দ্রবাবুকে বিছানায় শুতে দেখি নাই। আমার মাথা টিপে দিয়েছেন। কখনো পানি ঢালছেন, কখনো ওষুধ খাওয়াচ্ছেন। কখনো পথ্য খেতে অনুরোধ করেছেন। না খেতে চাইলে ধমক দিয়ে খাওয়াতেন। আমি অনুরোধ করতাম, এত কষ্ট না করতে। তিনি বলতেন, জীবনভরই তো এই কাজ করে এসেছি, এখন বুড়াকালে কষ্ট হয় না।"

পুলিশ মুজিবুরকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলে চন্দ্রবাবু এবং ফণিবাবু বাধা দিয়েছিলেন। তাঁরা দৃঢ়ভাবে মনে করেছিলেন যে, হাসপাতালে নিয়ে গেলে মুজিবুরের যত্ন হবে না একেবারেই। তাঁরা নিজেরাই যত্ন করে তাঁকে সুস্থ করে তুলবেন বলে পুলিশকে জানিয়েছিলেন। বিপ্লবী চন্দ্রঘোষ মুজিবুরকে বলেছিলেন–

"ভাই, এরা আমাকে সাম্প্রদায়িক বলে বদনাম দিল। শুধু এই আমার দুঃখ মরার সময়। কোনোদিন হিন্দু-মুসলমানকে দুই চোখে দেখি নাই।"

ফরিদপুর জেল থেকে মুজিবুরকে ঢাকা জেলে পুনরায় স্থানান্তরিত করা হয়। কেননা ইতোমধ্যেই মুজিবুরের হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। চোখের সমস্যা বাড়ে এবং পায়ে রিউম্যাটিকের ব্যথা হয়। যার জন্য জেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে ঢাকা জেলে পাঠিয়ে দেয়। ফরিদপুর থেকে ট্রেনে গোয়ালন্দ এবং সেখান থেকে জাহাজে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছে সেখান থেকে ট্যাক্সি করে মুজিবুরকে জেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সময়টা ছিল ১৯৫১ সালের শেষের দিক।

১৯৫২-এর ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা জেলেই শুরু হলো তাঁর আমরণ অনশন

সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সরকার মুজিবুরকে বাইশ মাস ধরে জেলে আটক রেখেছে নিরাপত্তা আইনে। মুজিবুর যাতে কোনোভাবেই জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে না পারেন তার সব ব্যবস্থাই পাকা করে রাখে কর্তৃপক্ষ। একদিকে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি অন্যদিকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার মধ্যদিয়ে মুজিবুর মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত। ঢাকা জেলে তিনি এসেছিলেন ১৯৫১ সালের শেষের দিকে। মাসখানেক পরে নিরাপত্তা আইনে বন্দি হয়ে ঢাকা জেলে আসেন বরিশালের জেলা মুসলিম লীগ সম্পাদক মহিউদ্দিন সাহেব। ছাত্র আন্দোলনে তিনি মুজিবুরের বিরুদ্ধ দলে থাকলেও জেলের মধ্যে তিনিই হলেন মুজিবুরের সবচাইতে ভালো বন্ধু। এরই মধ্যে মুজিবুরকে ঢাকা জেল হাসপাতালে না নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁকে রাখা হলো হাসপাতালের একটি ক্যাবিনে।

চিকিৎসা শুরু হলো একসঙ্গে। চোখের চিকিৎসা এবং হার্টের সমস্যা। চোখের বিখ্যাত চিকিৎসক ডা. লস্কর চোখের চিকিৎসা শুরু করলেন। অন্যদিকে ডা. শামসুদ্দিন শুরু করলেন হার্টের চিকিৎসা। এই সময় অসংখ্য ছাত্র-যুব এবং সাধারণ মানুষ হাসপাতালে আসতেন মুজিবুরের সঙ্গে দেখা করতে। এদিকে সোহরাওয়ার্দী সাহেব এসেছেন ঢাকায়। তিনি মওলানা ভাসানীর সঙ্গে একসঙ্গে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, আরমানিটোলাতে সভা করলেন। মুজিবুর যে বছর দুয়েক ধরে জেলখানায় রয়েছেন তা তাঁরা জানতেন। শহীদ সাহেব শেখ মুজিবুর রহমানকে জেল থেকে মুক্তি দেবার দাবি তুললেন। এরই মধ্যে একদিন আতাউর রহমান সাহেব এবং শহীদ সাহেব এলেন মুজিবুরকে দেখতে। দীর্ঘ আলোচনা হলো মুজিবুরের সঙ্গে। হাসপাতালে এসেই তিনি চিকিৎসকদের ডেকে পাঠালেন এবং মুজিবুরের চিকিৎসার ব্যাপারে খোঁজখবর নিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের যে বিশাল হৃদয় তা তিনি আবার প্রমাণ করলেন হাসপাতালে বসে। তিনি শহীদ সাহেবের কাছে জেলবন্দি মহিউদ্দিন সাহেবের মুক্তির জন্যও বললেন। শহীদ সাহেব তখন মুজিবুরকে বললেন যে–

"তুমি বোধহয় জানো না, এই মহিউদ্দিনই আমার বিরুদ্ধে লিয়াকত আলী খানের কাছে এক মিথ্যা চিঠি পাঠিয়েছিল যখন বরিশাল যাই, শান্তি মিশনের জন্য সভা করতে ১৯৪৮ সালে। সে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও করেছে ১৯৫১ সালে।"

শহীদ সাহেবের মুখে এই কথা শুনে খুব স্বাভাবিক কারণেই মুজিবুর চুপ হয়ে যাবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি বললেন–

"স্যার মানুষের পরিবর্তন হতে পারে, কর্মী তো ভালো ছিল, আপনি তো জানেন, এখন জেলে আছে, আমার সাথেই আছে। আমি আপনাকে বলছি আপনি বিশ্বাস করুন, ওর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ভালো পথে আনতে পারলে দেশের অনেক কাজ হবে। আমরা উদার হলে তো কোনো ক্ষতি নেই। আমার জন্য যখন মুক্তির দাবি করবেন ওর নামটাও একটু নিবেন, সকলকে বলে দিবেন।"

এই সময় মুজিবুরের মুক্তির দাবিতে জেলের বাইরে গণস্বাক্ষর অভিযান সংগঠিত হয়েছিল। মূলত শওকত সাহেবের উদ্যোগ এবং ছাত্রলীগ কর্মীদের তৎপরতায় ঢাকার বহু বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিরা একটি আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন মুজিবুরকে মুক্তি দেওয়ার দাবিতে। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাস থেকেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার হতে শুরু করে। কারণ ঐ সময়েই প্রকাশ্য দিবালোকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়। তখন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেলের পদ ছেড়ে খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব হলেন প্রধানমন্ত্রী। ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকায় এলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব। জনসভা করলেন পল্টন ময়দানে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সাহেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনিও বললেন, "উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।" ১৯৪৮ সালে তিনি যখন পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার পুরো বিপরীত কথাই বললেন। মুজিবুরের ভাষায়–

"তিনি ১৯৪৮ সালে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে যে ওয়াদা করেছিলেন, সে ওয়াদার খেলাপ করলেন। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে চুক্তি করেছিলেন এবং নিজেই পূর্ব বাংলা আইনসভায় প্রস্তাব পেশ করেছিলেন যে, পূর্ব বাংলার অফিসিয়াল ভাষা 'বাংলা' হবে। তাছাড়া যাতে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হয়, তার জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভায় কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হবে। এ প্রস্তাব পূর্ব বাংলার আইনসভায় সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়। যে ঢাকায় বসে তিনি ওয়াদা করেছিলেন সেই ঢাকায় বসেই উল্টা বললেন।"

খাজা নাজিমুদ্দীনের এই বক্তব্যে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হলো। মুজিবুর তখন অসুস্থ। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শুয়ে শুয়েই তীব্র ক্ষোভে জ্বলছেন। খবর দিলেন কয়েকজনকে। রাত একটার পরে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখনই মুজিবুরের সঙ্গে দেখা করতে আসেন কয়েকজন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন–খালেক নেওয়াজ, কাজী গোলাম মাহাবুব, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ প্রমুখ। মুজিবুর সবাইকে পরামর্শ দিলেন দেরি না করে অতি দ্রুত সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হোক। হাসপাতালে বসে বসেই মুজিবুর এক এক করে সকলের সঙ্গে দেখা করেন। একসঙ্গে সবাই আসতে না পারলেও এক এক করে সবাই মুজিবুরের সঙ্গে দেখা করলেন। মুজিবুর তখন শারীরিকভাবে অনেকটাই সুস্থ। তিনি হাসপাতালে বসে বসেই সবাইকে বললেন যে, সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে একটা দিন ধার্য করার জন্য। সেদিনই হবে আইন অমান্য। শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে বসেই সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ২১শে ফেব্রুয়ারি পালন করা হবে রাষ্ট্রভাষা দিবস। মুজিবুরও সবাইকে বললেন যে, ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনিও জেলের ভেতর অনশন শুরু করবেন। সরকারের কাছে রিপোর্ট গেল যে, মুজিবুর হাসপাতালে বসে বসেই রাজনীতি করছেন। আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাই কর্তৃপক্ষ মুজিবুরকে পুনরায় জেলে পাঠিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যেই এই পর্বে মুজিবুর ছাব্বিশ মাস জেল খেটে ফেলেছেন।

হাসপাতাল থেকে জেলে ফিরে এসেই তিনি অনশনের ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানালেন মহিউদ্দিনকে। মুজিবুরের সঙ্গে তিনিও অনশন ধর্মঘট করবেন বলে জানিয়ে দিলেন। সেই মতো এঁরা দুজনই সরকারকে নোটিশ দিলেন ১৫ ফেব্রুয়ারি। নোটিশে বলা হলো আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাঁদের মুক্তি না দিলে তারা জেলের ভেতর আমরণ অনশন শুরু করবেন ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে। কারণ সরকার তাঁদেরকে বিনা কারণে, বিনা বিচারে জেলে আটকে রাখছেন। এই নোটিশ পেয়ে জেল কর্তৃপক্ষ মুজিবুরকে অনশন না করতে অনুরোধ করেন। এই প্রসঙ্গে মুজিবুর লিখেছেন–

"আমাকে যখন জেল কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করল অনশন ধর্মঘট না করতে তখন আমি বলেছিলাম, ছাব্বিশ সাতাশ মাস বিনা বিচারে বন্দি রেখেছেন। কোনো অন্যায়ও করি নাই। ঠিক করেছি জেলের বাইরে যাব, হয় আমি জ্যান্ত অবস্থায় না হয় মৃত অবস্থায়। Either I will go out of the jail or my deadbody will go out."

২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটি ধার্য করা হয়েছিল এই কারণেই যে, ঐদিনই পূর্ব বাংলার আইনসভা বসার কথা। মুজিবুর জেলে বসেই শুনতে পেলেন যে, সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়ে গেছে এবং কাজী গোলাম মাহাবুবকে এই সংস্থার আহ্বায়ক করা হয়েছে। ১৯৪৮ সাল থেকে যে সংগ্রাম শুরু

হয়েছিল তা ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে এসে অনেক বেশি পরিণত হবে বলে মুজিবুর অনুভব করলেন। সমগ্র পাকিস্তানের জনগণকে এই সংগ্রামের পেছনে নৈতিক সমর্থন দেয়ার জন্য বলা হলো বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা নয়, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হোক। অর্থাৎ উর্দুর পাশাপাশি বাংলাও হোক পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এদিকে শেখ মুজিবুরের অনশন করার সিদ্ধান্তের কথা উপর মহলেও জানাজানি হয়ে যায়। জেল সুপার আমীর হোসেন সাহেব এবং রাজবন্দিদের ডেপুটি জেলার মোখলেসুর রহমান সাহেব মুজিবুরকে দীর্ঘক্ষণ বোঝালেন।

এই পরিস্থিতিতে মুজিবুর এবং মহিউদ্দিনকে ১৫ ফেব্রুয়ারি কৌশল করে পাঠিয়ে দেয়া হয় ফরিদপুর জেলে। কর্তৃপক্ষ এমন ব্যবস্থা নেন যাতে কেউ টের না পায়। কিন্তু তিনি শেখ মুজিবুর রহমান। দেশের মানুষ তাঁকে জানে। তাই খবর রটে যায়। ফরিদপুর জেলে ঢুকেই মুজিবুর অনশন ধর্মঘট করতে শুরু করলেন। দু'দিন কিছুই মুখে তুললেন না। শরীর দুর্বল হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ তাঁদের দুজনকে জেল হাসপাতালে নিয়ে গেল। এমনিতেই দুজন অসুস্থ। এর মধ্যে আবার অনশন। চার-দিন এইভাবে কেটে যাওয়ার পর শরীর যখন আরো দুর্বল হয়ে গেল। নড়াচড়ার আর ক্ষমতা নেই তখন তাঁদের দুজনের নাক দিয়ে নল ঢুকিয়ে তরল খাবার ঢেলে দিল। এইভাবেই কাটে ছয় দিন। বিছানার সঙ্গে প্রায় মিশে গেছেন এই দুই বিপ্লবী। দেশের জন্য আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত। যেকোনো সময় জীবনহানি হতে পারে। মহান এই দেশপ্রেমিক বিপ্লবীর অনশনের কথা ফরিদপুর হয়ে ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ২০ ফেব্রুয়ারি মুজিবুরের যখন প্রায় অচেতন অবস্থা তখন তিনি ভাবলেন হয়তো তিনি পৃথিবীতে আর থাকবেন না, তাই তিনি খুব সংক্ষেপে চারটি কাগজের টুকরোর মধ্যে চারটি চিঠি লিখলেন। এই চিঠিগুলো লিখেছিলেন পিতা, স্ত্রী, শহীদ সাহেব এবং ভাসানী সাহেবের কাছে।

২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ঠিক কী হয়েছে বিস্তারিত খবর তিনি পান নাই। শুধু শুনেছেন ঢাকার মিছিলে পুলিশ গুলি করেছে। লোক মারা গেছে। এদিকে ফরিদপুরেও সকাল থেকে হরতাল পালিত হয়েছে। ছাত্ররা শোভাযাত্রা করে জেল গেট পর্যন্ত আসে। তারা স্লোগান দিয়েছে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, বাঙালিদের শোষণ করা চলবে না, শেখ মুজিবের মুক্তি চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই' ইত্যাদি। রাতেই তিনি খবর পেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভেঙে শোভাযাত্রা করে এবং পুলিশ গুলি ছুঁড়ে। এতে বহু মানুষ আহত হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন শহীদ হয়েছেন। আত্মবলিদান দিয়েছে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার সংগ্রামে। এদিকে জেল কর্তৃপক্ষ সবসময় লক্ষ্য রাখছে যাতে মুজিবুরদের কাছে বাইরের কোনো খবর না পৌঁছোয়। এমনিতেই ছিল মুজিবুর অসুস্থ এবং দুর্বল। এর মধ্যে কয়েকজনের

মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি যেন আরো ভেঙে পড়লেন। পরের দিন অর্থাৎ ২২ ফেব্রুয়ারি সারাদিনই শোভাযাত্রা বের হয় ফরিদপুরে। ছাত্রদের স্লোগান এবং বক্তৃতা তিনি জেলের ভেতর থেকেই শুনতে পেলেন। খবরের কাগজও পেলেন। সবকিছুই তিনি দেখতে পেলেন কাগজে।

ঢাকার ঘটনা সম্পর্কে ফরিদপুর জেল হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে তিনি ভেবেছিলেন–

"মুসলিম লীগ সরকার কত বড় অপরিণামদর্শিতার কাজ করল! মাতৃভাষা আন্দোলনে পৃথিবীতে এই প্রথম বাঙালিরাই রক্ত দিল। দুনিয়ার কোথাও ভাষা আন্দোলন করার জন্য গুলি করে হত্যা করা হয় নাই। জনাব নূরুল আমিন বুঝতে পারলেন না, আমলাতন্ত্র তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল।"

২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনায় কারা নিহত হয়েছেন তা স্পষ্টভাবে না জানলেও বরকত, জব্বার, সালাম, রফিকুল এই চারটি নাম তার কানে এসেছিল। পরের দিন তিনি খবরের কাগজে দেখলেন যে, মওলানা আবদুর রশিদ, খয়রাত হোসেন, খান সাহেব ওসমান আলী, মোহাম্মদ আবুল হোসেন, খোন্দকার মোশতাক আহমদসহ শত শত ছাত্র ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

দু-একদিন পর মুজিবুর খবরের কাগজে দেখলেন যে, মওলানা ভাসানী, শামসুল হক সাহেব, বেশ কয়েকজন অধ্যাপকসহ বহু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকাতে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীর বাড়িঘরেও আক্রমণ শুরু হয়েছে। এদিকে অনশনের জন্য মুজিবুরের শরীর দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। এরই মধ্যে ২৫ ফেব্রুয়ারি হাসপাতালের সিভিল সার্জন মুজিবুরকে পরীক্ষা করে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি সরাসরি মুজিবুরকে বলেই ফেললেন–"এইভাবে মৃত্যুবরণ করে কি কোনো লাভ হবে? বাংলাদেশ যে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে।"

মুজিবুর এতটাই অসুস্থ ছিলেন যে, তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। তিনি আস্তে আস্তে বললেন–

"অনেক লোক আছে। কাজ পড়ে থাকবে না। দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবাসি, তাদের জন্যই জীবন দিতে পারলাম, এই শান্তি।"

ঐদিনই ডেপুটি জেলার সাহেব এসে মুজিবুরকে বললেন–

"কাউকেও খবর দিতে হবে কিনা? আপনার ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রী কোথায়? আপনার আব্বার কাছে কোনো টেলিগ্রাম করবেন?"

এর উত্তরে মুজিবুর বলছিলেন, "দরকার নেই। আর তাদের কষ্ট দিতে চাই না।"

মুজিবুর তখন তাঁর চারখানা চিঠি জেলের একজন কর্মচারীকে দিয়ে বলেছিলেন এগুলো পৌঁছে দেয়ার জন্য।

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে তিনি বর্ণনা করছেন এইভাবে–

"আমার চিঠি চারখানা একজন কর্মচারীকে ডেকে তাঁর কাছে দিয়ে বললাম, আমার মৃত্যুর পরে চিঠি চারখানা ফরিদপুরে আমার এক আত্মীয়ের কাছে পৌঁছে দিতে। তিনি কথা দিলেন, আমি তাঁর কাছ থেকে ওয়াদা নিলাম। বারবার আব্বা, মা, ভাই-বোনদের চেহারা ভেসে আসছিল আমার চোখের সামনে। রেণুর দশা কি হবে? তার তো কেউ নাই দুনিয়ায়। ছোট ছেলেমেয়ে দুইটার অবস্থাই বা কি হবে? তবে আমার আব্বা ও ছোট ভাই ওদের ফেলবে না, এ বিশ্বাস আমার ছিল।

চিন্তাশক্তিও হারিয়ে ফেলছিলাম। হাসিনা-কামালকে একবার দেখতেও পারলাম না। বাড়ির কেউ খবর পায় নাই, পেলে নিশ্চয়ই আসত।"

২৭ ফেব্রুয়ারি মুজিবুরের অবস্থার অবনতি ঘটে। মহিউদ্দিনের অবস্থা আরও সংকটজনক। ঐ দিনই রাত আটটার সময় ডেপুটি জেলার দ্রুত এসে মুজিবুরের পাশে বসলেন এবং বললেন, "আপনাকে যদি মুক্তি দেয়া হয়, তবে খাবেন তো?"

মুজিবুর এর উত্তরে বললেন–"মুক্তি দিলে খাব, না দিলে খাব না। তবে আমার লাশ মুক্তি পেয়ে যাবে।"

তখন ডেপুটি জেলার বললেন–"আমি পড়ে শোনাই, আপনার মুক্তির অর্ডার এসে গেছে রেডিওগ্রামে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অফিস থেকেও অর্ডার এসেছে। দুইটা অর্ডার পেয়েছি।"

মুক্তির অর্ডার দুটো পাঠ করে শোনালেন ডেপুটি জেলার সাহেব। কিন্তু মহিউদ্দিনের কোনো অর্ডার আসেনি। তবুও মহিউদ্দিন কষ্ট করে উঠে বসে মুজিবুরকে ডাবের পানি খাইয়ে তাঁর অনশন ভাঙালেন। পরের দিন মুজিবুর একটু সুস্থ বোধ করলেন। মহিউদ্দিনকে ছেড়ে যেতে মনে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল মুজিবুরের। সকাল দশটা নাগাদ মুজিবুরের আব্বাও এসে হাজির হলেন। ছেলের এই অবস্থা দেখে তিনি কেঁদেই ফেললেন। বললেন–

"তোমার মুক্তির আদেশ হয়েছে, তোমাকে আমি নিয়ে যাব বাড়িতে। আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম তোমার মা, রেণু, হাসিনা ও কামালকে নিয়ে। দুই দিন বসে রইলাম, কেউ খবর দেয় না তোমাকে কোথায় নিয়ে গেছে। তুমি ঢাকায় নাই একথা জেল গেট থেকে বলেছে। যদিও পরে খবর পেলাম, তুমি ফরিদপুর জেলে আছ। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ। নারায়ণগঞ্জ এসে যে জাহাজ ধরব তারও উপায় নেই। তোমার মা ও রেণুকে ঢাকায় রেখে আমি চলে এসেছি।"

কয়েক দিন পরে মহিউদ্দিনকেও জেল কর্তৃপক্ষ মুক্তি দিয়েছিলেন।

"আব্বা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই"

বিনা কারণে এবং বিনা বিচারে ছাব্বিশ মাস জেলে রাখার পর শেষ পর্যন্ত সরকার বাধ্য হয়েই মুক্তি দেয় অনশনরত এবং মৃত্যুপথযাত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে। যখন মুজিবরকে মুক্তি দেওয়া হয় তখন তাঁর বিছানায় উঠে বসারও ক্ষমতা ছিল না। একটা স্ট্রেচারে করে তাঁকে জেল গেটে নিয়ে আসা হয়। আত্মীয়স্বজনসহ বহু মানুষের সমাগম হয়েছিল জেল গেটে। প্রথমে মুজিবুরকে নিয়ে যাওয়া হলো আলাউদ্দিন খান সাহেবের বাড়িতে। পরে মুজিবুরের বোনের বাড়িতে। পিতা শেখ লুৎফর রহমান সর্বক্ষণই ছিলেন ছেলের পাশে। পরের দিন একটি ট্যাক্সি করে মুজিবুরকে নেয়া হলো ডাঙ্গায়। সেখান থেকে নৌকো করে মাদারীপুর মহকুমার দত্তপাড়াতে বড়বোনের বাড়িতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো। সকলের সাহচর্যে মুজিবুর কিছুটা সুস্থ অনুভব করছেন। এই দত্তপাড়া থেকে নৌকা করে গোপালগঞ্জ পৌঁছাতে সময় লাগে একদিন এক রাত।

গোপালগঞ্জে পৌঁছে মুজিবুর লক্ষ্য করলেন শত শত মানুষ অনেক আগে থেকেই মুজিবুরের জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁরা তাঁদের প্রিয় মানুষটিকে একটি বার দেখতে চান। জনগণের উচ্ছ্বাস এত বেশি ছিল যে, তারা মুজিবুরকে নৌকা থেকে নামিয়ে শোভাযাত্রা বের করলেন। মুজিবুর খুব দুর্বল ছিলেন বলেই কিছুক্ষণ পরেই তারা মুজিবুরকে পুনরায় নৌকোতে দিয়ে গেলেন। বাড়ির সবাই গভীর উৎকণ্ঠায় রয়েছে বলে আর দেরি না করে মুজিবুরকে নিয়ে বাড়ি আসা হলো। মুজিবুরকে দেখেই মা সাহারা খাতুন কাঁদতে লাগলেন। জেলের মধ্যে আর দুই-একদিন থাকলেই মুজিবুরের জীবন জেলের কুঠুরির মধ্যেই শেষ হয়ে যেত। সত্যিই যেন তাঁর পুনর্জন্ম ঘটেছে। আব্বাকে দেখতে পেয়ে কন্যা হাসিনা দৌড়ে এসে আব্বার গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, "আব্বা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই।"

মুজিবুরকে দেখার জন্য বাড়ির সবাই গিয়েছিল ঢাকায়। কিন্তু মুজিবুরকে জেল কর্তৃপক্ষ নিয়ে চলে যায় ফরিদপুরে। ব্যর্থ হয়ে সবাই বাড়ি ফিরে আসেন। অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। মুজিবুরের জীবন সংশয় ছিল বলেই সবাই উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছিলেন। মুজিবুর এখনো দুর্বল। বাড়িতে এসেই বিছানায় শুয়ে পড়েছেন। সবার কথাবার্তা শেষ হলে স্ত্রী রেণু দেবী স্বামী শেখ মুজিবুরের প্রতি অভিমান করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন–

"তোমার চিঠি পেয়ে আমি বুঝেছিলাম, তুমি কিছু একটা করে ফেলবা। আমি তোমাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কাকে বলব নিয়ে যেতে, আব্বাকে বলতে পারি না লজ্জায়। নাসের ভাই বাড়ি নেই। যখন খবর পেলাম খবরের কাগজে, তখন লজ্জা শরম ত্যাগ করে আব্বাকে বললাম। আব্বা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাই রওয়ানা করলাম ঢাকায়, সোজা আমাদের বড় নৌকায় তিনজন মাল্লা নিয়ে। কেন তুমি অনশন করতে গিয়েছিলে? এদের কি দয়া-মায়া আছে? আমাদের কারো কথাও তোমার মনে ছিল না? কিছু একটা হলে কি উপায় হত? আমি এই দুইটা দুধের বাচ্চা নিয়ে কি করে বাঁচতাম? হাসিনা-কামালের অবস্থা কি হত? তুমি বলবা খাওয়া-দাওয়ার তো কষ্ট হবে না? মানুষ কি শুধু খাওয়া-পরা নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়? আর মরে গেলে দেশের কাজই বা কীভাবে করতা?"

মুজিবুরের শারীরিক অবস্থা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, চিকিৎসক দিন দশেকের জন্য হাঁটা-চলা বারণ করে দিয়েছিলেন। তবুও কয়েকটা দিন মুজিবুর পরিবারের সকলের সঙ্গে আনন্দেই দিন অতিবাহিত করেন। পুরো মার্চ মাস তিনি বাড়িতেই ছিলেন। মুজিবুর প্রায় সাতাশ মাস জেল খেটে মরণাপন্ন অবস্থায় জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন বটে কিন্তু এই সময় সংগ্রাম পরিষদের নেতাকর্মীবৃন্দ সকলেই প্রায় গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরাও অনেকেই জেলে বন্দি। আওয়ামী লীগের কাজকর্মও প্রায় একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ সাহস করে কথা বলছে না। মুসলিম লীগ সরকার অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়ে দিয়েছে। স্বৈরতন্ত্রের চরম রূপ দেখলেন পূর্ব বাংলার মানুষ। দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে মানুষের স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে গেল। মুজিবুরও পড়লেন গভীর চিন্তায়। কী করে পূর্ব বাংলার মানুষকে মুক্ত করা যায় এই ছিল তাঁর চিন্তার মূল বিষয়।

বন্দিমুক্তির দাবি নিয়ে মে মাসেই মুজিবুর গেলেন করাচি

মুজিবুর এখন অনেকটাই সুস্থ। তবে হার্টের দুর্বলতা রয়েছে। ইতিমধ্যেই ঢাকা থেকে ডাক আসছে বারবার। বাড়িতে আছেন পরিবারের সকলের সঙ্গে আনন্দে। সকলের মুখেই হাসি। ঢাকা যাবার কথা বললেই সকলে আপত্তি করেন। মুজিবুরকে যে ডাক্তার চিকিৎসা করছিলেন তিনিও আপত্তি করেন। মুজিবুরের আব্বা তো পুত্রকে ছাড়তেই চান না। কারণ তিনি জানেন যে মুজিবুর যদি একবার ঢাকা যেতে পারে তাহলে সে আবার গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারে। জেলের ভেতর যেমন মুজিবুর মানসিকভাবে কষ্ট পায়, তেমনি পরিবারের সদস্যদের ভোগান্তির শেষ নেই। মুজিবুরের সহধর্মিণী রেণু যেন আর স্বামীকে কিছুতেই হাতছাড়া করতে চান না। দুটি বাচ্চা নিয়ে সবচাইতে বেশি কষ্ট কিন্তু রেণুরই হয়। ইতিমধ্যেই তফাজ্জল হোসেন অর্থাৎ মানিক মিয়ার চিঠি আসে মুজিবুরের কাছে। তিনি মুজিবুরকে অতিসত্বর ঢাকা যেতে বলেছেন। ঢাকায় গিয়ে মুজিবুর ভালো চিকিৎসা করাতে পারবেন বলে লিখলেন। তিনি লিখেছেন যে, পূর্ব বাংলার সরকার জনগণের উপর দমন-পীড়নের মাত্রা এমনভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে যে, জনগণ স্বাধীনভাবে যেমন চলাফেরা করতে পারছে না, তেমনি স্বাধীনভাবে নিজের মতামতও প্রকাশ করতে পারছে না। প্রকৃতপক্ষে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি, ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগের কাজকর্ম ঢাকাতে একেবারে বন্ধই হয়ে গেছে বলে তিনি জানিয়েছেন। চিঠিখানি পাঠ করে মুজিবুর দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়লেন। তিনি তাঁর আব্বাকেও দেখালেন চিঠিখানি। চিঠিখানি পাঠ করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন শেখ লুৎফর রহমান। পরে বললেন, "দেশের কাজে যেতে চাইছ। না করি কি করে।" অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রেণু দেবীকেও রাজি করালেন মুজিবুর।

প্রায় দেড় মাস বাড়িতে কাটিয়ে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে মুজিবুর পুনরায় ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। এবার আর আওয়ামী লীগের কার্যালয় ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে উঠলেন না। কারণ ঢাকার আবদুল হামিদ চৌধুরী এবং মোল্লা জালালউদ্দিন অনুরোধ করেছেন মুজিবুর যেন তাঁতিবাজারে ওঠেন। ওখানে তাঁরা একটি বাসা ভাড়া নিয়েছেন। মুজিবুর গোপালগঞ্জ থেকে বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ হয়ে পৌঁছলেন ঢাকায়। মুজিবুর ঢাকায় পৌঁছেই সংগ্রাম পরিষদ, ছাত্রলীগ এবং আওয়াম লীগের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একে একে দেখা

করলেন। যদিও এই তিনটি সংগঠনেরই প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ ছিলেন জেলে। যাঁরা জেলের বাইরে ছিলেন তাঁদের সঙ্গেই মূলত সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি কথা বললেন। দেখা করলেন ডাক্তার নন্দীর সঙ্গে। তাঁর দেওয়া ওষুধপত্রও তিনি খেলেন। শরীরটা আরেকটু সুস্থ হলো মুজিবুরের।

এই পরিস্থিতিতে তো চুপ করে বসে থাকা যায় না। মুজিবুর সময় নষ্ট করতে চাইলে না। তিনি ঘন ঘন আওয়ামী লীগ অফিসে যাতায়াত শুরু করলেন। শামসুল হক সাহেব তখন জেলে। মুজিবুর ছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সচিব। তিনিই ডাকলেন ওয়ার্কিং কমিটির সভা। সভাতে উপস্থিত হলেন তেরো জনের মতো সদস্য। তাঁরা সবাই মিলে সর্ব-সম্মতিক্রমে মুজিবুরকেই অ্যাকটিং জেনারেল সেক্রেটারি করে আওয়ামী লীগের কাজকর্ম পরিচালনার ভার দিলেন। ঐ দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন আতাউর রহমান সাহেব।

সমগ্র ঢাকায় তখন গণতন্ত্র অবরুদ্ধ। বলা চলে ত্রাসের রাজত্ব চলছিল ঢাকায়। মানুষ ভয়ে মুখ খুলতে চায় না। আওয়ামী লীগ অফিসেও কেউ আসে না। সেই সময় ঐ অফিসে মূলত বসতেন অধ্যাপক কামরুজ্জামান এবং মুজিবুর। এই সময় মোহাম্মদ উল্লাহ নামে একজন আইনজীবী নিজের থেকেই আওয়ামী লীগ অফিসে এসে দায়িত্ব নিয়ে অনেক কাজ করে দিয়েছেন। পরবর্তীকালে তিনি আওয়ামী লীগের অফিস সম্পাদক হয়েছিলেন এবং বহু বছর ধরে কাজ করেছেন। মুজিবুর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হয়েই সাংবাদিক সম্মেলন করে সরকারের কাছে কয়েকটি দাবি উত্থাপন করলেন। বিশেষ করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা, রাজবন্দিদের মুক্তিদান, ২১শে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ হয়েছেন এমন পরিবারকে ক্ষতিপূরণ এবং অন্যায়ভাবে জুলুমবাজদের শাস্তিদান ইত্যাদি।

এ সময়েই আওয়ামী লীগের একটি সভায় সিদ্ধান্ত হলো যে, বন্দিমুক্তির দাবি জানাতে মুজিবুরকে পাঠানো হবে করাচিতে। দেশের এই পরিস্থিতিতে খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে যেমন দেখা করা প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সোহরাওয়ার্দী বা শহীদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করা। সকলের সাহায্য নিয়ে মুজিবুর করাচিতে রওয়ানা হলেন মে মাসের মাঝামাঝি। করাচিতে মুজিবুরকে অভ্যর্থনা জানালেন করাচি আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহমুদুল হক ওসমানী এবং সম্পাদক শেখ মঞ্জুরুল হক। মুজিবুরের দায়িত্ব বেড়ে গেল অনেক। করাচিতে মুজিবুর উঠেছিলেন করাচি আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহমুদুল হক ওসমানী সাহেবের বাড়িতে।

করাচিতে সাংবাদিক সম্মেলনে মুজিবুরের চ্যালেঞ্জ

করাচিতে এসে মুজিবুর এক দিনের জন্যও বিশ্রাম নেননি। কেবলই তাঁর মনের মধ্যে ভেসে আসছিল সংগ্রাম পরিষদ, ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের কথা। যারা পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলখানায় বন্দি জীবন কাটাচ্ছেন। করাচিতে পৌঁছেই আওয়ামী লীগের একটি সভাতে মুজিবুর দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন ইংরেজিতে। কারণ বাংলায় বললে ওখানে কেউই বুঝতে পারবে না। আবার উর্দুতে তিনি বলতে পারতেন না। সেই সভায় ওসমানী সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। মুজিবুর করাচিতে পৌঁছেই প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের উদ্দেশ্যে একখানি পত্র পাঠান তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চেয়ে। চিঠি পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রধানমন্ত্রী চিঠির উত্তর দিয়ে দেখা করার তারিখ ও সময় জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে।

মুজিবুরের সঙ্গে এই সময় একটি দারুণ স্মার্ট বাঙালি ছেলের পরিচয় হয়। ছেলেটি মুজিবুরকে নানাভাবে সাহায্য করে। অনেকটা মুজিবুরের আপ্তঃসহায়কের মতো সে কাজ করছিল। সে একদিকে যেমন বাংলা জানত তেমনি সে উর্দু এবং ইংরেজিও জানত। করাচি আওয়ামী লীগের এই সদস্যটির নাম ছিল আমানুল্লাহ। প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া নির্ধারিত দিনেই মুজিবুর খাজা সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে। প্রধানমন্ত্রীসহ সচিব সাজেদ আলী মুজিবুরকে অভ্যর্থনা করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই খাজা সাহেব ডেকে পাঠালেন মুজিবুরকে। ব্যক্তিগত কুশল থেকে রাজনৈতিক প্রায় সব বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হলো। কুড়ি মিনিট সময় নির্ধারিত ছিল আলোচনার জন্য। কিন্তু কুড়ি মিনিটের জায়গায় প্রায় এক ঘণ্টা আলোচনা হলো।

মুজিবুর প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করলেন, "মওলানা ভাসানী, শামসুল হক, আবুল হাশিম, মওলানা তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, খান সাহেব, ওসমান আলীসহ সমস্ত কর্মীকে মুক্তি দিতে। জুডিশিয়াল ইনকোয়ারি বসাতে, কেন গুলি করে ছাত্রদের হত্যা করা হয়েছিল?"

এর উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, "এটা প্রাদেশিক সরকারের হাতে, আমি কি করতে পারি?"

তখন মুজিবুর বলেছিলেন, "আপনি মুসলিম লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী, আর পূর্ব বাংলায়ও মুসলিম লীগ সরকার; আপনি তাদের নিশ্চয়ই বলতে

পারেন। আপনি তো চান না সে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হোক, আর আমরাও তা চাই না। আমি করাচি পর্যন্ত এসেছি আপনার সাথে দেখা করতে, এজন্য যে প্রাদেশিক সরকারের কাছে দাবি করে কিছু হবে না। তারা যে অন্যায় করেছে সেই অন্যায়কে ঢাকবার জন্য আরো অন্যায় করে চলেছে। আওয়ামী লীগ বিরোধী পার্টি। তাকে কাজ করতে সুযোগ দেয়া উচিত। বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র চলতে পারে না। আপনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, তা আমি জানি।"

মুজিবুর প্রায় এক ঘণ্টা সময় ধরে তাঁর মনের সব কথা ব্যক্ত করলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে সফল বৈঠকের কথা জেনে জনাব মাহমুদুল হক ওস্‌মানী এবং শেখ মঞ্জুরুল হক মুজিবুরকে একটি প্রেস কনফারেন্স করে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার কথাবার্তা প্রকাশ করার কথা বলেন। সেই মতো মুজিবুর দু'দিন পর করাচিতে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে মুজিবুর সমবেত সাংবাদিকদের হাতে একটি বিবৃতিসহ প্রেস নোট দেন। প্রত্যেক সাংবাদিকই সেটা প্রথমে পাঠ করে নিয়ে কিছু কিছু প্রশ্ন তাঁরা করেন। এই সাংবাদিক সম্মেলন প্রসঙ্গে তিনি 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন–

"দুই দিন পরে প্রেস কনফারেন্স করলাম। আমার লেখা বিবৃতি পাঠ করার করে প্রেস প্রতিনিধিরা আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, অনেক প্রশ্নই আমাকে করলেন। আমি তাদের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পেরেছিলাম। পূর্ব বাংলার অবস্থা তাদের বুঝিয়ে বলতে পেরেছিলাম। এখানে এক প্রশ্নের উত্তরে তাদের বলেছিলাম, প্রায় ত্রিশটা উপনির্বাচন বন্ধ করে রাখা হয়েছে। যে কোনো একটার ইলেকশন হোক, আমরা মুসলিম লীগ প্রার্থীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হব।" মুজিবুরের এই সাংবাদিক সম্মেলন ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত। মুজিবুরের বক্তব্য সমস্ত খবরের কাগজে সেই সময় প্রচারিত হয়েছিল। ধীরে ধীরে মুজিবুর পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অবিসংবাদী নেতা হয়ে উঠলেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং সাংবাদিক সম্মেলন ইত্যাদির খবর পূর্ব বাংলাতেও এসে পড়ছিল।

লাহোরে সাংবাদিক সম্মেলনে দৃপ্ত মুজিবুর

করাচিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে লাহোরেও সাংবাদিক সম্মেলন করলেন দৃপ্ত মুজিবুর। মুজিবুর পশ্চিম পাকিস্তান সফরটিকে কাজে লাগাতে চাইলেন। পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের মনের কথাকে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিতে চাইলেন। তিনি করাচি থেকে গেলেন পাকিস্তানের হায়দ্রাবাদে। ইতিমধ্যেই মুজিবুরের সঙ্গে দারুণ সখ্য হয়েছিল দিল্লির মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের শেখ মঞ্জুরুল হকের সঙ্গে। মঞ্জুরুলের গাড়িতে করেই তিনি গিয়েছিলেন মরুভূমির দেশ হায়দ্রাবাদে। হায়দ্রাবাদে গিয়ে উঠেছিলেন ওখানকার ডাকবাংলোতে। এই ডাকবাংলোতেই ছিলেন সোহরাওয়ার্দী সাহেব। তাঁর সাথে মুজিবুরের দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হলো। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বশেষ পরিস্থিতি, ২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলি চালনা, প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে কথোপকথন, করাচির সংবাদিক সম্মেলনে তাঁর বক্তব্য ইত্যাদি সবকিছু সম্পর্কেই মুজিবুর শহীদ সাহেবকে রিপোর্ট করলেন।

সোহরাওয়ার্দী সাহেব বললেন–"পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কোনো এফিলিয়েশন নেয় নাই। আমি তো তোমাদের কেউ নই।"

মুজিবুর তখন তাঁকে বললেন–"প্রতিষ্ঠান না গড়লে কার কাছ থেকে এফিলিয়েশন নেব। আপনি তো আমাদের নেতা আছেনই। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ আপনাকে তো নেতা মানে, এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণও আপনাকে সমর্থন করে।"

মুজিবুর তাঁকে আরো বললেন–'মওলানা ভাসানী সাহেব আমাকে ১৯৪৯ সালে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তখনো তিনি নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তাঁরও কোনো আপত্তি থাকবে না, যদি আপনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র মেনে নেন।"

শহীদ সাহেবের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় মুজিবুর যা যা প্রস্তাব দিয়েছিলেন তার প্রায় সবকিছুই তিনি মেনে নিয়েছিলেন। মামলা-মোকদ্দমা শেষ হলে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে আসবেন বলেও কথা দিয়েছিলেন। যাই হোক মুজিবুর শহীদ সাহেবের গাড়ি করেই পাকিস্তানের হায়দ্রাবাদ থেকে পুনরায় করাচি চলে এলেন। আসার পথে শহীদ সাহেবের গাড়িতে বসা অন্যান্য

আইনজীবীরা নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনতে চাইলে মুজিবুর এই দুই মহান কবির বেশ কয়েকটা কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন এবং শহীদ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে তার ইংরেজি অনুবাদ করে তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ওসমানী সাহেবের বাড়িতে মুজিবুরকে নামিয়ে শহীদ সাহেব নিজের বাড়িতে গেলেন।

মুজিবুরের সঙ্গে ওসমানী সাহেবের দেখা হতেই তিনি মুজিবুরকে বলেন, মুজিবুর যেন লাহোর হয়ে ঢাকা ফিরে যান। লাহোরে শুধু যাওয়াই নয়, মুজিবুর যেন করাচির মতো লাহোরেও একটি কর্মিসভা এবং একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন, সেই নির্দেশ বা অনুরোধ করেন। ওসমানী সাহেব লাহোরের বিখ্যাত বার-এট-ল খাজা আবদুর রহিম এবং রাজা হাসান আখতারকে টেলিগ্রাম করে মুজিবুর সম্পর্কে সবকিছু জানিয়ে রাখলেন। মুজিবুর করাচি থেকে লাহোর পৌঁছেছিলেন ট্রেনে। মুজিবুরকে স্টেশনে অভ্যর্থনা করেন প্রাক্তন আইসিএস খাজা আবদুর রহিম। তিনি মুজিবুরকে রাখলেন লাহোরের বিখ্যাত অঞ্চল জাভেদ মঞ্জিলে। এখানেই ছিল কবি ইকবালের বাড়ি। এখানে থাকতে পেরে মুজিবুর নিজেকে ধন্য মনে করলেন।

নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী প্রেস কনফারেন্স হলো। তখনকার দিনে লাহোরের সবগুলো খবরের কাগজ এবং সংবাদ সংস্থা থেকে প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। মুজিবুর প্রথমে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। পরে সাংবাদিকদের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দেন। সাংবাদিক সম্মেলনগুলো করে মুজিবুর পশ্চিম পাকিস্তানের সাংবাদিকদের ভুল ধারণাটা পাল্টে দেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সাংবাদিকরা এত দিন জানতেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ শুধুমাত্র বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে চাইছে এবং দীর্ঘ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মুজিবুর স্পষ্টভাবে তাদের বললেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বাংলা এবং উর্দু এই দুটো ভাষাকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে চায়। শুধু উর্দু নয়। বাংলাও হোক রাষ্ট্রভাষা। এখানেও তিনি সাংবাদিকদের বললেন যে, যখনই নির্বাচন হোক পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটবে। এই সাংবাদিক সম্মেলনের খবর খুব সুন্দরভাবে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছিল নওয়াই ওয়াক্ত, পাকিস্তান টাইমস্, ইমরোজ ও অন্যান্য কাগজ।

লাহোর থেকে ঢাকায় ফিরেই জোর দিলেন সংগঠনে

লাহোরে মুজিবুরকে থাকতে হয়েছিল আরো কয়েক দিন। কারণ লাহোর থেকে ঢাকায় প্লেন আসে সপ্তাহে মাত্র এক দিন। তিনি জানতে পারলেন যে পরের সপ্তাহেও প্লেন যাবে না। ফলে আরো সতেরো-আঠারো দিন মুজিবুরকে লাহারেই থাকতে হলো। এদিকে খাজা আবদুর রহিম এবং রাজা হাসান আকতার রাওয়ালপিন্ডি ও মারী যাবেন বেড়াতে। মুজিবুরকে তাঁদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার অনুরোধ করলে মুজিবুর রাজি হয়ে যান। রাওয়ালপিন্ডিতে গিয়ে মুজিবুর মূলত দেখলেন দুটি স্থান। একটি হলো পাকিস্তানের মিলিটারি হেড কোয়ার্টার্স এবং অন্যটি হলো বিখ্যাত সেই পার্ক, যেখানে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। রাওয়ালপিন্ডি ঘুরে দেখে তারা গেলেন মারীতে। রাওয়ালপিন্ডি থেকে মাত্র পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরত্ব। মারীর আবহাওয়া ছিল খুবই আরামপ্রদ। আসলে মারী একটি ছোট্ট শৈল শহর। ওখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য লাহোর, পাঞ্জাব, করাচি এবং রাওয়ালপিন্ডির বড় বড় জমিদার ও ব্যবসায়ীদের প্রায় সকলেরই একটা করে বাড়ি আছে মারীতে।

মারীতে এক দিন থেকে মুজিবুর আবার এলেন লাহোরে। লাহোরে আরো কয়েক দিন থেকে প্লেনে করে ঢাকায় চলে এলেন। সেই সময় লাহোর থেকে সরাসরি প্লেন আসত না। আসত দিল্লি এবং কলকাতা হয়ে। ঢাকা এসেই মুজিবুর আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সভা আহ্বান করেন। সেই সভায় তিনি লাহোর এবং করাচিতে তার কার্যক্রম উপস্থাপন করলেন। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে তার দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা, দাবি সনদ, করাচি এবং লাহোরের সাংবাদিক সম্মেলন এবং জনাব সোহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রস্তাব ইত্যাদি সবকিছুই রিপোর্ট করলেন। সেই সভাতেই সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মতামত অনুযায়ী এফিলিয়েশন নেওয়ার ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো। ঠিক এই সময়ই বন্দি অবস্থায় মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন মওলানা ভাসানী সাহেব। তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাঁর উন্নত চিকিৎসার ব্যাপারে কোনোরকম দায়িত্ব নিতে রাজি হলো না। সেই সময় ভাসানী সাহেবের চিকিৎসার ব্যাপারেও মুজিবুর দৃপ্ত ভূমিকা গ্রহণ করলেন এবং সকলের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে তিনি তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা

গ্রহণ করলেন। এমনকি মুজিবুর মাঝেমধ্যে কুমিল্লাতে গিয়ে গিয়াসউদ্দিন নামে তাঁর এক ব্যবসায়ী বন্ধুর কাছ থেকেও কিছু আর্থিক সাহায্য আনতেন।

এই সময় মুজিবুর আওয়ামী লীগের সংগঠনকে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় কর্মসূচি গ্রহণ করলেন। এই সময় আতাউর রহমান সাহেব এবং আবদুস সালাম খানকে সঙ্গে নিয়েই মুজিবুর প্রতিটি জেলায় গিয়ে আওয়ামী লীগের সংগঠন করে তুলেন। এই সময়েই আওয়ামী লীগের সংগঠন গড়ে উঠেছিল ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, নাটোর, নওগাঁ ইত্যাদি জেলাতে। সব জায়গায় যে সমানভাবে সংগঠন গড়তে পেরেছিলেন তা নয়। কোথাও বয়স্ক লোকরা এগিয়ে না এলে কম বয়সীদেরকে দিয়েই মুজিবুর কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন। কারণ তাঁর যুক্তি ছিল কম বয়সীরাই কিছুদিন পর বয়স্ক হয়ে যাবে। বহু অঞ্চলে মুজিবুর একাই চলে গিয়েছিলেন সংগঠন গড়ার জন্য। পশ্চিম পাকিস্তান সফর করে এসে ১৯৫২ সালের জুন, জুলাই, আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে শেখ মুজিবুর পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব কটি জেলায় আওয়ামী লীগের সংগঠন গড়ে তুলেন।

এই সময় মুজিবুর দারুণ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত করেছেন। মুজিবুরের বয়স তখন বত্রিশ বছর। ছোট ছোট দুটি ছেলেমেয়ে রয়েছে। স্ত্রী রয়েছেন। পরিবারকে তিনি আর্থিকভাবে কোনো সাহায্যই করতে পারছেন না। এদিকে তিনি আইনশাস্ত্র পড়া ছেড়ে দিয়েছেন অনেক দিন। মুজিবুরের আব্বাও কিছুটা বিরক্ত তাঁর প্রতি। তিনি মুখে কিছু না বললেও মুজিবুর সেটা অনুভব করতেন। তিনিই পুত্রের পরিবারের যাবতীয় ভরণ পোষণের দায়িত্ব বহন করে চলেছেন। মুজিবুরের নিজেরও কিছু টাকা-পয়সার প্রয়োজন হয় মাঝেমধ্যে। তিনিও আর আব্বার কাছে কিছু চাইতে পারতেন না। বেগম লুৎফর রহমান সেটা অনুভব করতেন এবং মুজিবুরকে টাকা-পয়সা দিতেন। মুজিবুর মাঝেমধ্যে স্ত্রী রেণুর কাছ থেকে কিছু কিছু টাকা-পয়সা নিয়ে নিতেন।

অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে গেলেও জেলায় জেলায় আওয়ামী লীগের সংগঠন গড়তে তিনি কখনোই পিছিয়ে আসতেন না। একমাত্র রাজশাহী ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব জেলাতেই তিনি সংগঠন গড়ে তুললেন। যদিও শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং আবদুর রবকে ভিত্তি করে রাজশাহীতেও আওয়ামী লীগের কমিটি গঠন করেছেন মুজিবুর। পাবনাতেও সেইভাবে প্রথম দিকে কেউ এগিয়ে আসেনি। মাইক্রোফোন ছাড়াই তিনি সেখানে বক্তৃতা করেন। খুলনা জেলাতে আবদুল আজিজকে

সভাপতি এবং মমিনুদ্দিনকে সম্পাদক করে আওয়ামী লীগের কমিটি গঠিত হয়। ময়মনসিংহ জেলায় আওয়ামী লীগের সভাপতি হয়েছিলেন জনাব আবুল মনসুর আহমেদ সাহেব। নোয়াখালী জেলায় সভাপতি হয়েছিলেন আবদুল জব্বার খদ্দর সাহেব। চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের সংগঠন সম্প্রসারণ করার দায়িত্ব পড়েছিল আবদুল আজিজ, মোজাফ্ফর আহমেদ ও জহুর আহমেদ চৌধুরী প্রমুখের উপর। কুমিল্লাতে সংগঠন গড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন আবদুর রহমান খান, লাল মিয়া এবং মোশতাক আহমেদের উপর। এভাবেই মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব জেলাতেই আওয়ামী লীগের সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন।

শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে সেপ্টেম্বরে গেলেন চীনে

১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাস। মুজিবুরের বয়স ৩২ বছর ৬ মাস। এই সময়ের মধ্যেই তিনি বলা যায় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের পরিচিত ব্যক্তিত্ব। এই সময় থেকেই তিনি আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা। আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। সমগ্র পূর্ব বাংলাতে আওয়ামী লীগকে জনপ্রিয় করার মহান দায়িত্ব মূলত তাঁর উপর বর্তেছে। শুধু তা-ই নয়, পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে শাসকগোষ্ঠীর কাছে দাবি সনদ পেশ করা, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের হৃদয়ের কথা সেখানে পৌঁছে দেয়া ইত্যাদি সমস্ত দায়-দায়িত্বই মূলত মুজিবুরের উপর। এই রকম পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক স্তরেও পূর্ব বাংলার মানুষের নানা ধরনের সমস্যার কথা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পড়ল মুজিবুরের উপর।

করাচি থেকে ঢাকায় এসেই মুজিবুর প্রথমে যোগ দেন পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কমিটির সভায়। ঠিক এমন সময় খবর এলো যে, আগামী ১৫ এবং ১৬ সেপ্টেম্বর চীনের পিকিং শহরে অনুষ্ঠিত হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশসমূহের শান্তি সম্মেলন। এই শান্তি সম্মেলনে সমগ্র পাকিস্তান থেকে অংশ নেবেন ত্রিশজন প্রতিনিধি। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাঁচজন প্রতিনিধি অংশ নেবেন। এই খবর পাওয়া মাত্রই মুজিবুর আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সভা আহ্বান করে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পাঁচজন প্রতিনিধি ঠিক করলেন। যাঁরা চীনের পিকিং শহরে যাবেন বলে স্থির হলো তাঁরা হলেন–আতাউর রহমান খান, 'ইত্তেফাক' পত্রিকার সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, উর্দু লেখক ইবন হাসান এবং শেখ মুজিবুর রহমান। তবে দেশের যা পরিস্থিতি ছিল বললেই তো আর চট করে চীন দেশে গিয়ে শান্তি সম্মেলনে অংশ নেওয়া সম্ভব নয়। ভিসা, পাসপোর্ট ইত্যাদির প্রশ্ন আছে। তাছাড়া চীন তো কমিউনিস্ট দেশ। চীন দেশে গিয়ে শান্তি সম্মেলনে যাঁরা অংশ নেবেন তাঁরা তো অবশ্যই কমিউনিস্ট। এইভাবে প্রচার করা হলো। যাই হোক সবাই মিলেই পাসপোর্ট, ভিসা পাবার জন্য চেষ্টা করলেন।

এদিকে মুজিবুরের হাতে টাকা-পয়সাও প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু চীনে তো খুবই ঠাণ্ডা। মুজিবুরের যা পোশাক-আশাক রয়েছে তা দিয়ে আর যাই হোক চীন দেশে যাওয়া এককথায় অসম্ভব। কারণ প্রয়োজন শীত বস্ত্রের। ২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকা থেকে বিমান ছাড়বে হংকং-এর উদ্দেশে। ঐ দিন

দুপুর একটায় মুজিবুর হাতে পেলেন পাসপোর্ট। সেদিন বিমান না আসাতে মুজিবুরদের ভালোই হয়েছিল। পরের দিন যথারীতি প্লেন আসে ঢাকায়। ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়ে তাঁরা প্রথম পৌঁছান রেঙ্গুনে। রেঙ্গুনের পরিস্থিতি সেই সময় ছিল খুবই বিশৃঙ্খল। ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে বটে, কিন্তু চারদিকে অরাজকতা। রেঙ্গুনে মুজিবুরদের জন্য থাকার ব্যবস্থা হলো বিওএসি'র বিশ্রামাগারে। আতাউর রহমান সাহেবের প্রস্তাবমতো যোগাযোগ করা হলো রেঙ্গুনে বসবাসরত ব্যারিস্টার শওকত আলীর বড় ভাই আমজাদ আলীকে। তিনি রেঙ্গুনের অন্যতম একজন ব্যবসায়ী। তিনি আপ্লুত হয়ে সবাইকে নিয়ে রেঙ্গুন শহর দেখালেন। তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। রেঙ্গুন শহরে বড় বড় বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। হাতে সময় নেই। অল্প সময়ের মধ্যে যা যা দেখার তারা খুব দ্রুত দেখে নিলেন।

পরের দিন মুজিবুররা পৌঁছলেন ব্যাংককে। থাইল্যান্ডের রাজধানী। থাইল্যান্ড থেকে সোজা তাঁরা পৌঁছলেন হংকং-এ। থাইল্যান্ড, লাওস, ভিয়েতনাম ইত্যাদি অতিক্রম করে মুজিবুররা পৌঁছলেন হংকং-এর কাইতেক বিমানবন্দরে। সেখানে মুজিবুরদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন–'সিন্‌হুয়া' বা 'নিউচায়না, নিউজ এজেন্সি' সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ। মুজিবুরদের রাখার ব্যবস্থা হলো–হংকং-এর নামকরা হোটেল কৌলুন-এ। সময় হাতে বেশি ছিল না। তাই দ্রুততার সঙ্গে হংকং শহর ঘুরে দেখলেন সকলে। হংকং-এ মুজিবুর সামান্য গরম কাপড় কিনে নিয়েছিলেন সস্তায়। হংকং শহরের কেনাকাটা সম্পর্কে মুজিবুর লিখেছেন এইভাবে–

"আমাদের টাকা বেশি নাই, কিন্তু জিনিসপত্র খুব সস্তা। তবে সাবধান হয়ে কিনতে হবে। এক টাকা দামের জিনিস পঁচিশ টাকা চাইবে, আপনাকে এক টাকাই বলতে হবে, লজ্জা করলে ঠকবেন। জানাশোনা পুরানা লোকের সাহায্য ছাড়া মালপত্র কেনা উচিত নয়। হংকং-এর আরেকটা নাম হওয়া উচিত ছিল 'ঠগিবাজ' শহর। রাস্তায় হাঁটবেন পকেটে হাত দিয়ে, না হলে পকেট খালি।"

হংকং থেকে মুজিবুররা ট্রেনে করে গেলেন ক্যান্টন শহরে। হংকং-এর সীমান্ত পর্যন্তই ট্রেনে গেলেন। দুই দেশের মাঝখানে একটি সেতু ছিল। সকলে হেঁটেই পার হলেন সেতুটি। হেঁটে হেঁটে গিয়েই চীনের সীমানায় প্রথম স্টেশন সেনচুনে গিয়ে পৌঁছলে শান্তি কমিটির স্বেচ্ছাসেবক সেবিকারা তাদেরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। স্বেচ্ছাসেবক সেবিকারা প্রায় সকলেই স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী। চীনের বিপ্লব হয়েছে মাত্র বছর তিনেক। এই তিন বছরের মধ্যে চীন দ্রুত পাল্টে গেছে। ট্রেনে করে মুজিবুররা ক্যান্টন পৌঁছলে

সেখানকার শত শত ছাত্রছাত্রী তাদেরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। শান্তি কমিটির কর্মকর্তারাও স্টেশনে হাজির থেকে সকলকে স্বাগত জানান। মুজিবুরদের থাকার ব্যবস্থা হলো একটি হোটেল। পার্ল নদীর তীরে অবস্থিত হোটেলটির সৌন্দর্য সকলকে মুগ্ধ করে।

শান্তি সম্মেলন হবে পিকিং শহরে। অর্থাৎ ক্যান্টন থেকে আরো দেড় হাজার মাইল। যাওয়ার ব্যবস্থা হলো বিমানে। কেননা সব দেশের প্রতিনিধি সময়মতো এসে পৌঁছতে পারেন নাই। সে জন্য সম্মেলন শুরু করা যাচ্ছে না। ক্যান্টন প্রদেশের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মুজিবুর সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

"দিনের বেলা প্লেনে দেড় হাজার মাইল চীনের ভূখণ্ডের উপর দিয়ে যাবার সময় সে দেশের সৌন্দর্য দেখে আমি সত্যি সত্যি মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। ক্যান্টন প্রদেশ বাংলাদেশের মতই সুজলা-সুফলা। শত শত বছর বিদেশীরা এই দেশকে শোষণ করেও এর সম্পদের শেষ করতে পারে নাই। নয়া চীন মনপ্রাণ দিয়ে নতুন করে গড়তে শুরু করেছে।" (অসমাপ্ত আত্মজীবনী)

পিকিং বিমানবন্দরে পৌঁছলে শান্তি কমিটির সদস্যবৃন্দ সকলকে স্বাগত জানান। স্বাগতিক এই পরিচয় পর্বে ছাত্রছাত্রীরা যেমন উপস্থিত ছিলেন তেমনি ছিলেন কয়েকজন ভারতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি। পিকিং-এর সবচাইতে বড় হোটেলেই সবার থাকার ব্যবস্থা হলো। এদিকে তারিখ পরিবর্তন করে স্থির হয়েছে সম্মেলন শুরু হবে ২ অক্টোবর থেকে। ১ অক্টোবর চীনের স্বাধীনতা দিবস। সুতরাং হাতে একটু সময় পাওয়া গেল। হোটেলে একই রুমে ছিলেন আতাউর রহমান সাহেব, মানিক মিয়া এবং মুজিবুর রহমান। সম্মেলন শুরু হবার আগেই মুজিবরা পিকিং শহরটি দেখে নিতে চাইলেন। পিকিং শহরের ভেতর একটি আকর্ষণীয় জায়গা হলো 'ফরবিডেন সিটি'। স্বাধীনতার আগে নবাব সম্রাটরা এখানে থাকতেন আমাত্যদের নিয়ে। স্বাধীনতার পর তার দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

এই সময়ের মধ্যেই ফরবিডেন সিটি, সামার প্যালেস, বিশাল আকৃতির বৌদ্ধ মন্দির, বিভিন্ন লেক, লেকের মধ্যে দ্বীপ, পার্ক ইত্যাদি প্রায় সবকিছুই তাঁরা দেখে নিলেন। এরই মধ্যে পিকিং শহরে অবস্থানরত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল রেজা হোটেলে এসে পাকিস্তান থেকে আসা সকলের সঙ্গে দেখা করে গেলেন। পিকিং-এ পাকিস্তান দূতাবাসে মুজিবুরের এক কলেজ সহপাঠী মাহাবুব কাজ করতেন। মুজিবুর সেটা জানতেন না। কিন্তু ১ অক্টোবর স্বাধীনতা দিবসের বিশাল মিছিলে মুজিবুর হঠাৎই তাঁকে আবিষ্কার করেন। মাহাবুব মুজিবুরকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া শুধু নয়, কিছু টাকা-

পয়সা দিয়েও সাহায্য করেছিলেন। মাহাবুব বন্ধু মুজিবুরকে পিকিং শহরের প্রায় সবকিছুই দেখালেন।

শান্তি সম্মেলনে গিয়ে মুজিবুর দেখলেন যে, ৩৭টা দেশ থেকে ৩৭৮ জন প্রতিনিধি যোগদান করেছে সম্মেলনে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে সম্মেলনে বক্তৃতা করলেন আতাউর রহমান খান এবং শেখ মুজিবুর রহমান। কলকাতা থেকে লেখক মনোজ বসু এবং শেখ মুজিবুর রহমান বাংলায় বক্তৃতা করেন। মুজিবুরের বক্তৃতার পর মনোজ বসু মুজিবুরকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন–

"ভাই মুজিব, আজ আমরা দুই দেশের লোক, কিন্তু আমাদের ভাষাকে কেউ ভাগ করতে পারে নাই। আর পারবেও না। তোমরা বাংলা ভাষাকে জাতীয় মর্যাদা দিতে যে ত্যাগ স্বীকার করেছ আমরা বাংলা ভাষাভাষী ভারতবর্ষের লোকেরাও তার জন্য গর্ব অনুভব করি।"

মূল অনুষ্ঠানের পর কয়েকটি কমিশন বা গ্রুপে আলোচনা হলো। সেখানেও মুজিবুর আলোচনা করলেন। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে মহিলা প্রতিনিধি তাহেরা মাজহার বক্তৃতা করার পর পাকিস্তানের মর্যাদা বেড়েছিল বলে মুজিবুর অনুভব করলেন। সম্মেলনের শেষ দিন হয়েছিল একটি জনসভা। সেখানে 'যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই'–এই মূল থিমকে ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশ বা দলের প্রতিনিধিরা বক্তৃতা করেন। হয়েছিল একটি শোভাযাত্রা। সেখানে বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা অংশগ্রহণ করেন। শান্তি সম্মেলনে যোগ দিয়ে মুজিবুর বহু বিশিষ্ট মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। যেমন রাশিয়ার লেখক অ্যাসিখভ, তুরস্কের বিখ্যাত কবি নাজিম হিকমত, মাদাম খান ইয়েৎ সেন, পিকিং-এর মেয়র পেং প্রমুখ।

এগারো দিনের শান্তি সম্মেলন শেষ করে মুজিবুর আরো দু-একদিন পিকিং-এ ছিলেন। চীন দেশটি যে বিপ্লবের পর দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা বোঝার চেষ্টা করলেন মুজিবুর। আগ্রহ ভরে দেখে নিলেন শিল্প-কারখানা, শ্রমিক এবং কৃষকদের অবস্থা। পিকিং থেকে ট্রেনে করে মুজিবুর তাঁর সাথীদের সঙ্গে প্রথমে আসেন তিয়েন শিং সামুদ্রিক বন্দরে। তিয়েন শিং-এ দু'দিন থেকে মুজিবুররা চলে এলেন পুরনো চীনের রাজধানী নানকিং শহরে। এখানেই বিপ্লবী খান ইয়েৎ সেনের সমাধি। সবাই ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। নানকিং থেকে প্রতিনিধি দল পৌঁছলেন সাংহাই শহরে। সাংহাই একটি বিশ্ববিখ্যাত শহর। সাংহাই শহর সম্পর্কে মুজিবুর লিখেছেন এইভাবে–"নানকিং থেকে আমরা সাংহাই পৌঁছলাম। এটা দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর ও ব্যবসা কেন্দ্র। পূর্বে এই সাংহাই ছিল বিদেশি শক্তির

বিলাসীদের আরাম-আয়েশ ও ফুর্তি করার শহর। নতুন চীন সরকার কঠোর হস্তে এসব দমন করেছে।"

সাংহাইতে একটি কলোনি দেখতে গিয়েছিলেন মুজিবুর রহমান। যে বাড়িতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন বাড়িতে মহিলা আছেন, স্বামী বাইরে কাজে গেছেন। তাদের বিয়ে হয়েছে মাত্র এক মাস। মুজিবুর সেদিন নিজের আঙুলের আংটি খুলে মহিলাকে উপহার দিয়েছিলেন। পরের দিন স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে হোটেলে এসে মুজিবুরের সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিলেন। সাংহাই থেকে মুজিবুর এলেন হ্যাংচো শহরে। একে চীনের কাশ্মীর বলা হয়। হ্যাংচো পশ্চিম হ্রদের পাড়ে। লেকের চারপাশে শহর। এখানেই একটি লেকে মুজিবুর নৌকো বেয়েছিলেন। হ্যাংকো থেকে মুজিবুররা পুনরায় এলেন ক্যান্টন শহরে। ক্যান্টন থেকে হংকং হয়ে তারা দেশে ফিরেছিলেন।

চীন দেশ সফর করে মুজিবুরের মনে যে ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল তা তিনি 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে ব্যক্ত করেছেন–

"চীনের জনগণ সরকারের কাজে সাহায্য করছে এটা বুঝতে কষ্ট হলো না। জনমত দেখলাম চীন সরকারের সাথে। চীন সরকার নিজেকে কমিউনিস্ট সরকার বলে ঘোষণা করে নাই। তারা তাদের সরকারকে 'নতুন গণতন্ত্রের কোয়ালিশন সরকার' বলে থাকে। কমিউনিস্ট ছাড়াও অন্য মতাবলম্বী লোকও সরকারের মধ্যে আছে। যদিও আমার মনে হলো কমিউনিস্টরা নিয়ন্ত্রণ করছে সবকিছু। আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসেবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যত দিন দুনিয়ায় থাকবে তত দিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না।"

চীন থেকে ফিরেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন আওয়ামী লীগ সংগঠনে

চীনে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে অংশ নিয়ে পুনরায় ঢাকায় ফিরে এলেন মুজিবুর। ঢাকাতে ফিরে এসেই পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন আওয়ামী লীগের নানা রকম কর্মসূচিতে। তখনো মওলানা ভাসানীসহ আওয়ামী লীগের অসংখ্য নেতা-কর্মী জেলে রয়েছেন। তাই তাঁদেরকে জেল থেকে মুক্ত করাটাই হবে এই মুহূর্তের সবচাইতে বড় কাজ। ফলে বন্দিমুক্তির আহ্বান রেখেই প্রথম সভা আহ্বান করা হলো ঢাকার পল্টন ময়দানে। সেই সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে মুজিবুর সরকারকে প্রায় চ্যালেঞ্জ করে বললেন যে, অতি দ্রুত আওয়ামী লীগ নেতা এবং কর্মীদেরকে জেলখানা থেকে মুক্তি না দিলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন আতাউর রহমান সাহেব।

এই সময়ে আওয়ামী লীগের কর্মসূচির মধ্যে নতুন মাত্রা এসেছিল সোহরাওয়ার্দী সাহেবের অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। অনেক দিন ধরেই মুজিবুর শহীদ সাহেবকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে তিনি মাস খানেকের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে এসে আওয়ামী লীগের কিছু কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। সেই মতো তিনি সম্মতি জানালেন এবং মুজিবুর এক মাসের কর্মসূচি নির্ধারণ করে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর প্রথম জনসভাটিই ছিল ঢাকাতে। পাকিস্তান গঠিত হবার পর শহীদ সাহেবের ঐ সভাটিই ছিল পাকিস্তানের মাটিতে বিরোধীদের প্রথম বড় জনসভা। বাংলার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সাহেব তাঁর বক্তৃতায় স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে বললেন, বাংলাকে অবশ্যই রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। সকল বন্দিদেরকে মুক্ত করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। রাজশাহী ইত্যাদি দুই একটি জেলা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সবগুলো জেলাতেই তিনি জনসভা করেন। বেশিরভাগ জনসভাতেই শহীদ সাহেবের সঙ্গে মুজিবুর বক্তৃতা করেন। ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র আওয়ামী লীগের সংগঠন গড়ে উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের পূর্ব পাকিস্তান পরিক্রমা করার পর মানুষের মধ্যে একটা উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং গণজাগরণ সৃষ্টি হলো। তখন থেকেই বহু মানুষ মুসলিম লীগ ছেড়ে আওয়ামী লীগে যোগদান করতে থাকেন। জনগণের মধ্যে সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে কেন্দ্র করে একটা আশা-আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হলো। চারদিকে যে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, জুলুমবাজি চলছে তার থেকে মানুষ একটা বিকল্প চিন্তা

করতে শুরু করে। শহীদ সাহেবকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের যে সংগঠন গড়ে ওঠে, নিয়মিত যোগাযোগ এবং কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মুজিবুর সেই সংগঠনকে আরো জোরদার করেন।

সোহরাওয়ার্দী সাহেব যখন জোরালোভাবে জনসভাগুলোতে বন্দিদের মুক্তির ব্যাপারে কথা বলতে শুরু করেন তখন থেকেই সরকারের টনক নড়তে শুরু করে। প্রতিটি জনসভাতেই মওলানা ভাসানীর প্রসঙ্গ আসতে শুরু করে এবং প্রকারান্তরে ভাসানী সাহেবও সারা পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের একটা ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। একে কাজে লাগিয়ে মুজিবুরসহ অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতারা প্রতিটি জেলায় গড়ে তোলেন আওয়ামী লীগের কমিটি। এই সমস্ত কমিটি নিজস্বভাবেও কর্মসূচি গ্রহণ করতে থাকে।

শুধু পূর্ব পাকিস্তানই নয়, এই সময়ের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানেও আওয়ামী লীগের সংগঠন গড়ে উঠেছিল। পীর খানকা শরীফের নেতৃত্বেই প্রথম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের সংগঠন গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে সোহরাওয়ার্দী সাহেব যে সমস্ত স্থানে যেতে পারেননি, সেখানে মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই সেদিন সংগঠন গড়ে উঠেছিল। আওয়ামী লীগের সংগ্রামের ফলে ১৯৫৩ সালের প্রথম দিক থেকেই সরকার রাজনৈতিক বন্দিদেরকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। পূর্ব পাকিস্তানের একজন নামকরা জনপ্রতিনিধি এবং আওয়ামী লীগ নেতা হলেন শামসুল হক সাহেব। পাকিস্তান আন্দোলনে যাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। ১৯৪৩ সাল থেকে মুসলিম লীগ দলকে জমিদার, নবাবদের দালানের কোঠা থেকে বের করে যিনি জনগণের পর্ণ কুঠিরে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি শামসুল হক। এই রকম একজন নেতাকে দিনের পর দিন জেলে আটকে রাখার ফলে তাঁকে একজন বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ হিসেবে জেল থেকে সেদিন মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

সেই দিনগুলোতে 'সাপ্তাহিক ইত্তেফাক' কাগজটি আওয়ামী লীগের সংগ্রামকে দারুণভাবে সাহায্য করেছিল। আওয়ামী লীগের সংগঠন সম্প্রসারণে তফাজ্জল সাহেবের এই কাগজের অবদান সত্যিই অপরিসীম। সেই সময়ে মুজিবুর এবং তাঁর সহযোগীরা মিলে প্রায় সত্তরটি ইউনিয়নে আওয়ামী লীগকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সময়ে আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিল সভা হয়েছিল মুকুল সিনেমা হলে। কাউন্সিল সদস্যদের থাকার জন্য কোনো জায়গা না পাওয়াতে সদস্যদেরকে রাখা হয়েছিল সদরঘাটের কয়েকটি নৌকায়। ১৯৫৩ সালের ঐ কাউন্সিল সভা থেকেই সর্বসম্মতিক্রমে আওয়ামী লীগের সভাপতি, সহসভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচি হয়েছিলেন যথাক্রমে মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান এবং শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৫৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে তাঁর অবিসংবাদী নেতৃত্ব

দুই-তিন বছরের মধ্যেই মুসলিম লীগ সরকারের জনপ্রিয়তা একেবারে তলানিতে এসে পড়ল। অন্যদিকে দ্রুত বাড়তে লাগল আওয়ামী লীগের সমর্থন। বহু বিশিষ্ট মানুষ আওয়ামী লীগে এসে যুক্ত হলো। সারা দেশব্যাপী চলতে লাগল আওয়ামী লীগের নানা রকম কর্মসূচি। এই সমস্ত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ক্রমশ একজন অবিসংবাদী নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে লাগলেন। জনগণ মুজিবুরের উপর দারুণভাবে আস্থা প্রকাশ করতে লাগল। মুজিবুরের জনপ্রিয়তা যত বাড়তে লাগল ততই দলের মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে একটি গোষ্ঠী ষড়যন্ত্রও করতে শুরু করে। এই প্রসঙ্গে মুজিবুর তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন এইভাবে–

"কাউন্সিল সভার দিন যতই ঘনিয়ে আসছিল আওয়ামী লীগের কয়েকজন প্রবীণ নেতা এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন; যাতে আমাকে জেনারেল সেক্রেটারি না করা হয়। আমি এ সম্বন্ধে খোঁজ-খবর রাখতাম না। কারণ প্রতিষ্ঠানের কাজ, টাকা জোগাড়, কাউন্সিলারদের থাকার বন্দোবস্তসহ নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হতো। আবদুস সালাম খান, ময়মনসিংহের হাশিমুদ্দিন আহমেদ, রংপুরের খয়রাত হোসেন, নারায়ণগঞ্জের আলমাস আলী ও আবদুল আউয়াল এবং আরো কয়েকজন এই ষড়যন্ত্রের নায়ক ছিলেন।"

যারা মুজিবুরের বিরোধী ছিলেন তারা শত চেষ্টা করেও মুজিবুরের বিরুদ্ধে একজন প্রার্থী দাঁড় করাতে পারলেন না। যাই হোক মুজিবুর রহমানই হলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।

এদিকে দেশের পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে শুরু করে। পশ্চিম পাকিস্তান কীভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করছে, কীভাবে সম্পদ লুট করে নিয়ে যাচ্ছে তা যখন হিসেব করে প্রমাণ দিয়ে আওয়ামী লীগ প্রকাশ করল জনগণ তখন বুঝতে পারল যে পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সত্যিই অন্ধকারাচ্ছন্ন। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ধীরে ধীরে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করে। ফলে পূর্ব বাংলাতেও মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পেল। এই রকম পরিস্থিতিতেই পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবে এক মর্মান্তিক দাঙ্গা হয়ে যায়। যে দাঙ্গায় মারা যায় হাজার হাজার মানুষ। মার্শাল ল' জারি করা হয় লাহোরে। পাকিস্তানের জন্য সংগ্রামের সময় মনে করা

হয়েছিল যে, পাকিস্তান হবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে পাকিস্তানে থাকবে সকলের সমানাধিকার। কিন্তু ধীরে ধীরে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ইসলামিক রাষ্ট্র করার একটা চক্রান্ত শুরু হয়ে যায় ১৯৫৩ সাল থেকেই। এই প্রসঙ্গে মুজিবুর বলেছেন–

"মুসলিম লীগ নেতারাও কোনোরকম অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রোগ্রাম না দিয়ে একসঙ্গে যে স্লোগান দিয়ে ব্যস্ত রইল তা হল ইসলাম। পাকিস্তানের শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষ যে আশা ও ভরসা নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন, তথা পাকিস্তান আন্দোলনে শরিক হয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির দিকে কোনো নজর দেওয়াই তারা দরকার মনে করল না।"

এদিকে পাকিস্তানের রাজনীতিতে এলো এক বিরাট পরিবর্তন। ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাস। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল জনাব গোলাম মোহাম্মদ প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনকে বরখাস্ত করেন। নাজিমুদ্দীন কিন্তু তখনো মুসলিম লীগের সভাপতি এবং গণপরিষদ ও পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। তাঁর জায়গায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা হলো আমেরিকায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আলী বগুড়াকে। যিনি মুসলিম লীগ এবং গণপরিষদ কোনো কিছুরই সদস্য ছিলেন না। নাজিমুদ্দীন সাহেব মুসলিম লীগের সভাপতির পদও ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর জায়গায় মুসলিম লীগ নেতারা মোহাম্মদ আলী বগুড়াকে পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে বরণ করে নিলেন। যদিও পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ সেদিন এই অগণতান্ত্রিক ঘটনার নিন্দা জানিয়েছিল খুব স্পষ্ট ভাষায়।

এই পরিস্থিতির মধ্যেও মুজিবুর এবং ভাসানী সাহেব আওয়ামী লীগকে একটা শক্ত ভীতের উপর দাঁড় করানোর চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। পূর্ব বাংলার জন্য স্বায়ত্তশাসনের দাবিও ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এরই মাঝে ঘোষণা করা হলো যে ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি অনুষ্ঠিত হবে পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচন। পূর্ব বাংলার জনগণ স্পষ্ট করেই বুঝতে পারলেন যে নির্বাচন মূলত হবে আওয়ামী লীগ এবং মুসলিম লীগ এই দুই দলের মধ্যে। এই সময়ে ঢাকা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন জনাব এ. কে. ফজলুল হক সাহেব। মুজিবুর তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আওয়ামী লীগে নিয়ে আসার চেষ্টা করলেন। চাঁদপুর আওয়ামী লীগের একসভায় তিনি বিখ্যাত একটি উক্তি করেছিলেন–

"যাঁরা চুরি করবেন তাঁরা মুসলিম লীগে থাকুন, আর যাঁরা ভালো কাজ করতে চান তাঁরা আওয়ামী লীগে যোগদান করুন।"

যাই হোক আওয়ামী লীগের পরবর্তী কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হলো ময়মনসিংহের অলকা সিনেমা হলে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব এবং মওলানা ভাসানী ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় আওয়ামী লীগের বৈদেশিক নীতি এবং যুক্তফ্রন্ট এই দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। ঐ সভায় মুজিবুর বলেছিলেন–

"আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয় লাভ করবে, ভয়ের কোনো কারণ নাই। আর যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে না পারি আইনসভায় আওয়ামী লীগই বিরোধী দল হয়ে কাজ করবে। রাজনীতি স্বচ্ছ থাকবে, জগাখিচুড়ি হবে না। আদর্শহীন লোক নিয়ে ক্ষমতায় গেলেও দেশের কাজ হবে না। ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার হতে পারে।"

দশ হাজারের বেশি ভোটে জয়ী হলেন শেখ মুজিবুর রহমান

নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাওয়ায় মুজিবুরের পরিশ্রমের মাত্রা বেড়ে গেল দ্বিগুণ। অন্য কোনো দলের সঙ্গে আঁতাত বা জোট করার খুব একটা ইচ্ছুক ছিলেন না মুজিবুর। তবুও কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্ট করতে হলো। সমগ্র পূর্ব বাংলার জনমত যে আওয়ামী লীগের পক্ষে তা মুজিবুর প্রথম থেকেই অনুভব করছিলেন। মওলানা ভাসানী সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পুনরায় শুরু করলেন দেশপরিক্রমা। মুজিবুরের বড় ভরসা ছিল সোহরাওয়ার্দী সাহেব। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রচারের মুখ ছিলেন এই তিনজন। শহীদ সাহেবও জনসভা করতে শুরু করলেন। শুধু জনসভা করাই নয় আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রার্থী ঠিক করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ঠিক করা হলো জেলা কমিটি যাকে সর্বসম্মতিক্রমে প্রার্থী করবে তাকেই নমিনেশন দেওয়া হবে। আর যেখানে সর্বসম্মতিক্রমে প্রার্থী করা যাবে না সেখানে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব প্রার্থী ঠিক করবে। এদিকে যুক্তফ্রন্ট হওয়াতে আওয়ামী লীগের জেল খাটা বহু গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বকে নমিনেশন দেওয়া যায়নি।

শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের পক্ষে গোপালগঞ্জ থেকে প্রার্থী হবেন বলে ঠিক হলো। সারা পূর্ব বাংলায় প্রচারের কাজে ব্যস্ত থাকায় তিনি গোপলগঞ্জে আসতেই পারেননি। হাতে ছিল আর মাত্র এক দিন। মুজিবুর এলেন গোপালগঞ্জে। তিনি গোপালগঞ্জে এসে দেখেন মুসলিম লীগের প্রার্থী হয়েছেন বহু অর্থের মালিক ওয়াহিদুজ্জামান সাহেব। তিনি বহু টাকা-পয়সা খরচ করে প্রচারের কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। কিন্তু গোপালগঞ্জের মানুষ যেন তাদের প্রিয় মানুষ মুজিবুরের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মুজিবুর গোপালগঞ্জের মাটিতে পা দেয়ার পরই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। কয়েকটি মাত্র সাইকেল এবং একটি মাইক্রোফোন ছাড়া মুজিবুরের প্রচারের উপকরণ আর বিশেষ কিছুই ছিল না। তবে গোপালগঞ্জের জনগণের পুরো সমর্থন ছিল মুজিবুরের পক্ষে।

ভোট প্রচারে গিয়ে মুজিবুর বুঝতে পেরেছিলেন যে, গোপালগঞ্জের মানুষ কীভাবে মুজিবুরকে ভালোবাসে। তিনি নিজের ভোট সম্পর্কে অর্থাৎ নিজের রায় সম্পর্কে যেমন একশো শতাংশ নিশ্চিত ছিলেন তেমনি সারা পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের রায় সম্পর্কিত নিশ্চিত ছিলেন। ভোটের প্রচার সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুজিবুর লিখেছেন এভাবে–

"আমার মনে আছে খুবই গরিব এক বৃদ্ধ মহিলা কয়েক ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, শুনেছে এই পথে আমি যাব, আমাকে দেখে আমার হাত ধরে বলল, বাবা আমার এই কুঁড়েঘরে তোমার একটু বসতে হবে। আমি তার হাত ধরেই বাড়িতে যাই। অনেক লোক আমার সাথে। আমাকে মাটিতে একটা পাটি বিছিয়ে বসতে দিয়ে এক বাটি দুধ, একটা পান এবং চার আনা পয়সা এনে আমার সামনে ধরে বলল, খাও বাবা, আর পয়সা কয়টা তুমি নেও, আমার তো কিছু নাই। আমার চোখে পানি এল।"

এইভাবে গ্রামে-গঞ্জে প্রত্যেকের বাড়ি গেলেন মুজিবুর। মুজিবুরের প্রতিদ্বন্দ্বী জামান সাহেব যখন বুঝতে পারলেন যে তিনি জয়ী হতে পারবেন না তখন তিনি নানা রকম ষড়যন্ত্র করলেন। জনগণের ধর্মীয় দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগাতে তিনি গোপালগঞ্জে নিয়ে এলেন বড় বড় আলেম, পীর এবং মওলানা সাহেবদের। শামসুল হক নামে একজন মওলানা সরাসরি ধর্মসভাগুলোতে ফতোয়া জারি করে বললেন যে, মুজিবুরকে ভোট দিলে ইসলাম থাকবে না, ধর্ম শেষ হয়ে যাবে। শুধু পীর বা মওলানারাই নয় সরকারের বড় বড় কর্মচারীরাও মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচার করতে শুরু করেন। এই রকম পরিস্থিতির মধ্যেই মুজিবুর নিজের নির্বাচনী অঞ্চল ছাড়াও পাশাপাশি আরো দুটো অঞ্চলে প্রচার চালিয়ে গেলেন। বিশেষ করে যশোরে আবদুল হাকিম সাহেবের নির্বাচনী এলাকা এবং আবদুল খালেকের এলাকা। নির্বাচনী ফলাফলে দেখা গেল মুজিবুর জয়ী হলো দশ হাজার বেশি ভোট পেয়ে। সারা রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফলে দেখা গেল যে, মোট আসন ৩০৯টির মধ্যে মুসলিম লীগ পায় ৯টি আসন, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট ও সহযোগী দলগুলো পায় ২৯০টি আসন এবং অন্যান্যরা পায় ৯টি আসন। (সূত্র : রঙ্গলাল সেন, পলিটিক্যাল এলিটস ইন বাংলাদেশ, ইউপিএল, ঢাকা ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ১২৩-১২৫)।

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এই অভূতপূর্ব সাফল্যে গোটা বিশ্বের রাজনীতিসচেতন মানুষ চমকে উঠেছিলেন। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমিনসহ অসংখ্য নেতা, মন্ত্রী, আইনভার সদস্য পরাজিত হয়েছিলেন।

১৯৫৪ সালের মে মাস : প্রথমবারের জন্য নিলেন মন্ত্রিত্বের শপথ

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যাপক জয় লাভ এবং ব্যক্তিগতভাবে মুজিবুর দশ হাজারের বেশি ভোটে নির্বাচিত হবার পর ঢাকায় এলে ঢাকার রেল স্টেশনে মুজিবুরকে বিশাল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেছিল তাঁর অনুগামীরা। রেল স্টেশন থেকে শোভাযাত্রা করে তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছিল আওয়ামী লীগের অফিস পর্যন্ত। এবার সরকার গঠনের পালা। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সভা যেমন হলো তেমনি যুক্তফ্রন্টের সভাও হলো। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেবকে নেতা নির্বাচন করা হলো। ভাসানী সাহেব এবং শহীদ সাহেবের উপস্থিতিতেই নেতা নির্বাচন হলো। কিন্তু মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে বিস্তর জল ঘোলা হলো। এ. কে. ফজলুল হক চার-পাঁচ জনকে নিয়ে প্রথমে মন্ত্রিসভা গঠন করতে চান। পরে অন্যদের নেয়া হবে বলে তিনি বলেন। এমনকি প্রথম দিকে তিনি মুজিবুরকেও মন্ত্রী করতে চাননি। একথা শুনে মুজিবুর মন্ত্রিসভায় যোগ দেবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিলেন এবং পুনরায় সংগঠন গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

এদিকে এ. কে. ফজলুল হক ছাড়া শপথ গ্রহণ করলেন আবু হোসেন সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া এবং আশরাফউদ্দিন চৌধুরী। কিছুদিনের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী হক সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন যে শেখ মুজিবুর রহমানকে মন্ত্রিসভায় না নিলে দেশের জনমত তাঁর বিরুদ্ধে চলে যাবে। সেই সময় একটি কর্মিসভায় যোগ দিতে টাঙ্গাইলে ছিলেন ভাসানী সাহেব এবং মুজিবুর। মুজিবুর যখন বক্তৃতা করছিলেন তখনই টাঙ্গাইলের এসডিও মুজিবুরের হাতে একটি টেলিগ্রাম দিয়ে বলেছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ঢাকায় যেতে অনুরোধ করছেন। মওলানা সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করে মুজিবুর ঢাকায় চলে এলেন। হক সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি প্রথমেই বলে ওঠেন, "তোকে মন্ত্রী হতে হবে। আমি তোকে চাই, তুই রাগ করে না বলিস না। তোরা সকলে বসে ঠিক কর, কাকে কাকে নেওয়া যেতে পারে।"

প্রধানমন্ত্রীর কথার উত্তরে মুজিবুর তাঁকে বলেছিলেন যে, "আমাদের তো আপত্তি নাই। শহীদ সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাঁর অনুমতি দরকার। আর মওলানা সাহেব উপস্থিত নাই, তাঁর সাথেও আলোচনা করতে হবে।"

মুজিবুর একা সিদ্ধান্ত নিলেন না। তিনি আতাউর রহমান খান, ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক ভাই, মোর্শেদ সাহেব, কাদের সর্দার সাহেব ফকিরুদ্দিন চৌধুরী প্রমুখদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। ফোনে সম্মতি জানালেন সোহরাওয়ার্দী সাহেব। শেষ পর্যন্ত মওলানা ভাসানীর সম্মতি আদায় করা হলো। প্রথমবারের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রিসভায় এলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সঙ্গে মন্ত্রিসভায় শপথ নিয়েছিলেন আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, আবদুস সালাম খান, হাশিমুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়েই খবর আসে যে, আদমজী জুট মিলে বাঙালি এবং অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। খবর পেয়েই প্রধানমন্ত্রী হক সাহেব মুজিবুরসহ অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে আদমজী জুট মিলে পৌঁছে গেলেন। মুজিবুর সেদিন অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে আহত প্রায় তিন শত মানুষকে গাড়ি করে হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন। প্রায় ছয়শো মৃতদেহ একসঙ্গে দেখতে পেয়ে মুজিব বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

জীবনের প্রথম মন্ত্রিসভায় শপথ গ্রহণের দিন মুজিবুর সারা দিন ছিলেন অভুক্ত। তাঁর পেটে কিছুই জুটেনি। কারণ শপথ গ্রহণ থেকে সোজা চলে গিয়েছিলেন দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায়। সেখানে তিনশো আহত মানুষকে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে হাসপাতালে পাঠিয়ে রাত একটায় ঢাকা ফিরে মন্ত্রিসভার বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল। মন্ত্রিসভায় সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন মুজিবুর। তাঁকে দেয়া হয়েছিল কো-অপারেটিভ ও এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট দপ্তর। সেই সময়ে মুজিবুর মন্ত্রী হিসেবে স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েকে নিয়ে বাস করতে থাকেন ঢাকার মিন্টো রোডের সরকারি ভবনে।

মন্ত্রিত্বের শপথ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো করাচির মাটিতে

জীবনে প্রথম মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই মুজিবুর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন প্রায় পাঁচ ছয়শো মানুষের জীবন কেড়ে নেয়। দাঙ্গার আগুন কিছুটা নিভিয়ে যখন তিনি ঢাকায় এলেন তখনই পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক মুজিবুরকে ডেকে বললেন–"করাচি থেকে খবর এসেছে, আমাকে যেতে হবে। তুই ও আতাউর রহমান আমার সাথে চল। নান্না, মোহন মিয়া ও আশরাফউদ্দিন চৌধুরীও যাবে, বেটাদের হাবভাব ভালো না। ফজলুল হক সাহেবের প্রস্তাব মুজিবুরের খারাপ লাগেনি। কারণ মুজিবুরও করাচি যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন মনে মনে। কেননা বেশ কিছুদিন ধরে সোহরাওয়ার্দী সাহেব করাচিতে অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন। তাঁকে গিয়ে দেখা উচিত।

১৯৫৪ সালের মে মাসের শেষের দিক। সকলে মিলে পৌঁছলেন করাচি। পাকিস্তান মন্ত্রিসভা, প্রধানমন্ত্রী এবং গভর্নর এই তিনটি সাক্ষাৎকারের পরিকল্পনা রয়েছে হক সাহেবের। প্রথমেই প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বগুড়াসহ মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে কথা হলো। দাঙ্গা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি ছিল। আলোচনাসাপেক্ষে তা শেষ হয়। আলোচনার পর পৃথকভাবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হলো। কিন্তু সেই আলোচনা সুখকর হয়নি। বরং সেই আলোচনা ছিল উত্তপ্ত। এর জন্য প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বগুড়াই ছিলেন দায়ী। কেননা তিনিই পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হকের সঙ্গে অপমানজনক কথাবার্তা বলতে শুরু করেন। এমনকি একসময় মুজিবুরের দিকে তাকিয়ে বলেছেন–"কি মুজিবুর রহমান, তোমার বিরুদ্ধে বিরাট ফাইল আছে আমার কাছে।" এর উত্তরে মুজিবুর তাঁকে সরাসরি বললেন–"ফাইল তো থাকবেই, আপনাদের দৌলতে আমাকে তো অনেক জেল খাটতে হয়েছে। আপনার বিরুদ্ধেও একটা ফাইল প্রাদেশিক সরকারের কাছে আছে।" এই কথার অর্থ জানতে চাইলে মুজিবুর প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীকে বলেছিলেন–"যখন খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন তখন আপনাকে মন্ত্রী করেন নাই। আমরা যখন ১৯৪৮ সালে প্রথম বাংলা ভাষার আন্দোলন করি, তখন আপনি গোপনে দুই শত টাকা চান্দা দিয়েছিলেন, মনে আছে আপনার? পুরনো কথা অনেকেই ভুলে যায়।"

প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে কথাবার্তা সেরে মুজিবুর গেলেন অসুস্থ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। সবাইকে একসঙ্গে দেখতে পেয়ে আপ্লুত শহীদ সাহেব সকলকে আগামী দিনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করলেন। এদিকে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ এ. কে. ফজলুল হক সাহেবকে অনুরোধ করেছেন তার সঙ্গে দেখা করার জন্য। এই প্রসঙ্গে মুজিবুর লিখেছেন এইভাবে–

"আমরা বড়লাটের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। তিনি যে কামরায় শুয়ে শুয়ে দেশ শাসন করতেন, সেই ঘরেই আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। তিনি খুবই অসুস্থ। হাত-পা সবসময়েই কাঁপে। কথাও পরিষ্কার করে বলতে পারেন না। তিনি হক সাহেবের সাথে আলাপ করলেন। আমার নাম ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, উপস্থিত আছি কি না! হক সাহেব আমাকে দেখিয়ে দিলেন। আমি আদাব করলাম। তিনি আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বসালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোকে বলে আপনি কমিউনিস্ট, এ কথা সত্য কি না?' আমি তাঁকে বললাম, যদি শহীদ সাহেব কমিউনিস্ট হন, তাহলে আমিও কমিউনিস্ট।"

করাচিতে থাকতে থাকতেই মুজিবুর জানতে পারেন যে পূর্ব পাকিস্তানে নতুন মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে গভর্নর শাসন জারি করা হবে এবং মুজিবুররা যাতে করাচি থেকে ঢাকায় ফিরতে না পারেন সেই চক্রান্তও করা হচ্ছে। পাকিস্তান সরকার পূর্ব বাংলার মুখ্য সচিবকে সব ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদিও মুখ্য সচিব জনাব ইসহাক সাহেব কোনো রকম অন্যায় আদেশ মানতে রাজি ছিলেন না। যাই হোক, ২৯ মে সবাই মিলে ঢাকা রওয়ানা হলেন। ঢাকা বিমানবন্দরে এসে মুজিবুর দেখলেন যে, বিরাট জনতা বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়েছে তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য।

১৯৫৪ সালের মে মাস : সপ্তমবারের জন্য গ্রেপ্তার হলেন মুজিবুর

ঢাকায় এসে মুজিবুর জানতে পারেন যে, পাকিস্তান সরকার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করেছিল যাতে মুজিবুররা করাচি থেকে ঢাকায় ফিরতে না পারেন। এমনকি কলকাতা বিমানবন্দরেই তাঁদেরকে ঢাকায় নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে আটকে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। কলকাতাতে আটকে রাখতে পারলে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা যেত। যাই হোক ঢাকায় ফিরে দেখেন তাঁর সহধর্মিনী রেণু ঢাকাতে এলেও ভালো করে গুছিয়ে উঠতে পারেননি। তিনি স্ত্রীকে বললেন–

"আর বোধহয় দরকার হবে না। কারণ মন্ত্রিত্ব ভেঙে দিবে, আর আমাকেও গ্রেপ্তার করবে। ঢাকায় কোথায় থাকবা, বোধহয় বাড়িই চলে যেতে হবে। আমার কাছে থাকবা বলে এসেছিলা, ঢাকায় ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ হবে, তা বোধহয় হল না। নিজের হাতের টাকাপয়সাগুলোও খরচ করে ফেলেছ।"

ঐদিনই বিকেল তিনটের সময় টেলিফোনে মুজিবুর জানতে পারলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট ১৯৩৫-এর ৯২(ক) ধারা অনুযায়ী গভর্নরের শাসন জারি করেছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেছে। ঐ ধারা বলে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল কোনো প্রদেশের গভর্নরকে ঐ প্রদেশের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করতে পারে। এই ঘোষণার মধ্যদিয়ে নতুন যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কার্যত ভেঙে দেয়া হয়েছিল। এই স্বৈরতান্ত্রিক ঘোষণায় পূর্ব বাংলার নতুন গভর্নর হলেন মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা এবং আর. এন. এম. খানকে করা হয়েছিল চিফ সেক্রেটারি। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সবচাইতে প্রয়োজনীয় মানুষটি হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। প্রকৃতপক্ষে তাঁর নেতৃত্বেই যে সমগ্র পূর্ব বাংলায় নতুন করে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে সেটা পাকিস্তান সরকার জানত। সেই কারণেই তিনি সকলের আগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যাওয়ার আগে সকলের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় মুজিবুর বলেছিলেন–

"আমি তো জেলে চললাম, তবে একটা কথা বলে যাই, আপনারা এই অন্যায় আদেশ নীরবে মাথা পেতে নেবেন না। প্রকাশ্যে এর বাধা দেওয়া উচিত। দেশবাসী প্রস্তুত আছে। শুধু নেতৃত্ব দিতে হবে আপনাদের। জেলে অনেকের যেতে হবে, তবে প্রতিবাদ করেই জেলখাটা উচিত।"

জেলে যাওয়ার সময় স্ত্রী রেণু দেবী যাতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঢাকাতে থাকতে পারে সে জন্য একটি ঘড়ভাড়া জোগাড় করে দেওয়া এবং তাঁকে এই সংকটের দিনে দেখাশোনা করার জন্য মুজিবুর দায়িত্ব দিয়ে গেলেন বন্ধু এম. এল. এ. ইয়ার মোহাম্মদ খান এবং আল হেলাল হোটেলের মালিক হাজী হেলালউদ্দিনকে। এঁরা দুজনেই নিষ্ঠার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন যাতে মুজিবুরের স্ত্রীর কোনো কষ্ট না হয়।

এদিকে এম. এল. এ. ইয়ার মোহাম্মদ খানও বেশি দিন থাকতে পারলেন না। একদিন মুজিবুরের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মুজিবরের সঙ্গে দেখা করার জন্য জেলখানার দিকে আসছেন এমন সময় জেলখানার গেইটেই পুলিশ রহমান সাহেবকে গ্রেপ্তার করে। মুজিবুরকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ যে মূলত কেন্দ্রীয় সরকার থেকেই এসেছে তা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছিলেন মুজিবুরকে গ্রেপ্তার করতে আসা তৎকালীন ডি. এম.। তিনি বলেছিলেন, "কী করব বলুন। করাচি আপনাকে গ্রেপ্তার করার জন্য পাগল হয়ে গেছে। মুজিবুরকে মূলত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ডাকাতি, খুন করার চেষ্টা, লুটতরাজ ও সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা ইত্যাদি অভিযোগে। মুজিবুরকে যেদিন গ্রেপ্তার করা হয়, সেই একই দিনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল মির্জা গোলাম হাফিজ এবং সৈয়দ আবদুর রহিম মোক্তার সাহেবকে। দশ-পনেরো দিনের মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রায় তিন হাজার কর্মী, নেতা ও সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এর মধ্যে অন্যান্য দলের কর্মীরা যেমন ছিলেন তেমনি ছিলেন অসংখ্য ছাত্র। সেই সময় পঞ্চাশ জনের মতো এম. এল. এ-কেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

ঢাকা জেলের দেওয়ানি ওয়ার্ডে মুজিবুরসহ বিশিষ্টজনদের রাখা হয়েছিল। যেমন–কোরবান আলী, দেওয়ান মাহবুব আলী, বিজয় চ্যাটার্জী, খন্দকার আবদুল হামিদ, মির্জা গোলাম হাফিজ, ইয়ার মোহাম্মদ খান, মোহাম্মদ তোয়াহা, অধ্যাপক অজিত গুহ এবং মুনীর চৌধুরী প্রমুখ। অন্যদিকে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক সাহেবকে নিজ বাড়িতেই অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল। সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো, পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন জারি করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী জাতির উদ্দেশ্যে যে বেতার বক্তৃতা করেছিলেন তাতে এ. কে. ফজলুল হক সাহেবকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে দাঙ্গাকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। সবচাইতে দুঃখজনক বিষয় হলো এই, মাত্র কয়েক দিন আগে পূর্ব বাংলার যে প্রায় নব্বই শতাংশ মানুষ মুসলিম লীগ সরকারকে পরাজিত করে একটি নতুন সরকার গঠন করেছিল তারা প্রায় নিশ্চুপ রইলেন। অর্থাৎ পাকিস্তান সরকারের এত বড় একটি স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে যে তীব্রতায় প্রতিবাদ করা

উচিত ছিল তা হয়নি। এর প্রধান কারণ ছিল নেতৃত্বের প্রায় সবাই তখন ছিলেন জেলে। গ্রেপ্তারের ভয়েই জনগণ যে সাহসভরে এগিয়ে এসে প্রতিবাদকে ধ্বনিত করতে পারেন নাই এটা বোঝা গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে মুজিবুর লিখেছেন এভাবে–

"দেড় ডজন মন্ত্রীর মধ্যে আমিই একমাত্র কারাগারে বন্দি। যদি ৬ জুন সরকারের অন্যায় হুকুম অমান্য করে অন্য মন্ত্রীরা গ্রেপ্তার হতেন তাহলেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন শুরু হয়ে যেত। দুঃখের বিষয়, একটা লোকও প্রতিবাদ করল না। এর ফল হলো ষড়যন্ত্রকারীরা বুঝতে পারল যে যতই হৈচৈ বাঙালিরা করুক না কেন, এদের দাবিয়ে রাখতে কষ্ট হবে না।

জেল থেকে মুক্ত হয়ে চতুর্থবারের জন্য করাচিতে মুজিবুর

জেলখানায় বসেই মুজিবুর খবর পেলেন ১৯৫৩ সালে মুসলিম লীগ থেকে যাঁরা বিতাড়িত হয়েছেন তাঁরা গোপনে মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন কীভাবে মন্ত্রিত্ব ফিরে পাওয়া যায়। এদিকে ১৯৫৪ সালের ২৩ অক্টোবর ঘটে গেল আরো একটি ঘটনা। ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস। গণপরিষদে আইন পাস করে মোহাম্মদ আলী গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার এক মাস পরে ১৯৫৪ সালের ২৩ অক্টোবর গোলাম মোহাম্মদ পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা জারি করে গণপরিষদ ভেঙে দিলেন। এই সময় থেকেই আইয়ুব খানকে প্রধান সেনাপতি ও ইস্কান্দার মির্জাকে মন্ত্রী করে দেশটাকে তুলে দেয়া হয়েছিল আমলাদের হাতে।

পাকিস্তান গঠিত হয়েছে আট বৎসর হতে চলল। কিন্তু এই আট বৎসরে দেশের গণপরিষদ একটি সংবিধান গঠন করতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে মুজিবুর তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বলেছেন, "গোলাম মোহাম্মদ বে-আইনীভাবে গণপরিষদ ভেঙে দিয়েছিলেন। তবুও জনগণ এতে খুবই আনন্দিত হয়েছিল। কারণ, গণপরিষদের সদস্যদের হয়তো আট বছর পর্যন্ত থাকার আইনগত অধিকার থাকলেও ন্যায়ত অধিকার ছিল না। আট বৎসর পর্যন্ত যে গণপরিষদ দেশকে একটা শাসনতন্ত্র দিতে পারে নাই, নির্বাচনে পরাজিত হয়েও যারা পদত্যাগ না করে ষড়যন্ত্র করে নির্বাচিত সদস্যদের বরখাস্ত করে, তাদের উপর জনগণের আস্থা থাকতে পারে না।"

এই সময়ের মধ্যে বেশ কিছু নেতা জেল থেকে মুক্ত হলেও মুজিবুরকে মুক্ত করতে সরকারের কোনো উদ্যোগই ছিল না। জেলের মধ্যে মুজিবুর যাঁদের সঙ্গে গল্পগুজব করে দিন কাটাতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন–ইয়ার মোহাম্মদ খান, দেওয়ান মাহবুব আলী, বিজয় চ্যাটার্জী, অধ্যাপক অজিত গুহ, মোহাম্মদ তোয়াহা ও কোরবান আলী। সেই সময় একজন একজন করে বন্ড দিয়ে মুক্ত করার চেষ্টা করছিল সরকার। মুজিবুর তখন জেল কর্তৃপক্ষকে বলে দিয়েছিলেন যাতে বন্ড-এর প্রস্তাব নিয়ে তাঁর কাছে কেউ না আসে। তিনি সেই সময় বলেছিলেন–

"আপনার উপরওয়ালাদের জানিয়ে দিবেন, বন্ড আমার দেওয়ার কথাই উঠে না। সরকারকেই বন্ড দিতে বলবেন, ভবিষ্যতে আর এইরকম অন্যায় কাজ যেন না করে! আর বিনা বিচারে কাউকেও বন্দি করে না রাখে।"

এই সময়ের মধ্যেই পাকিস্তানের গভর্নর গোলাম মোহাম্মদ ঢাকা সফরে আসেন। তাঁকে তেজগাঁ বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন আতাউর রহমান এবং এ. কে. ফজলুল হক। আতাউর রহমান সাহেবের এই ভূমিকায় মুজিবুর জেলের ভেতর বসে দারুণ কষ্ট পেয়েছিলেন। এই সময়ে জেলে বসে মুজিবুর খবর পেয়েছিলেন যে, তার পিতার শরীর খুবই সংকটজনক। বাঁচবার আশা কম। মুজিবুরের সহধর্মিণী রেণুও শ্বশুর মশায়ের এই অবস্থায় সরকারের কাছে আবেদন করেন তাঁর স্বামী মুজিবুরকে যেন মুক্তি দেওয়া হয়। তখন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যসচিব ছিলেন জনাব এন. এম. খান। তিনি ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্তান গঠন হওয়ার অনেক আগে থেকেই মুজিবুরকে স্নেহ করতেন। তিনি এই দরখাস্ত পেয়ে ২৩ ডিসেম্বর ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিয়ে মুজিবুরকে জেলের বাইরে নিয়ে গেলেন। তখনো যে সমস্ত সহযোদ্ধা জেলের ভেতরে ছিলেন তাঁদের জন্য খুবই কষ্ট হয় মুজিবুরের। তিনি যাওয়ার সময় বলে গেলেন, "হয় তোমরা মুক্তি পাবা, নতুবা আবার আমি জেলে আসব।"

জেল থেকে বেরিয়ে মুজিবুর দেখলেন যে, আওয়ামী লীগ কর্মী নূরুদ্দিন দাঁড়িয়ে আছে। তাঁকে নিয়ে ঢাকাতে স্ত্রীর ভাড়া করা বাড়ি হয়ে তিনি দ্রুত ছুটলেন নারায়ণগঞ্জে। সেখান থেকেই জাহাজ ধরতে হবে। জাহাজ ছাড়ার পনেরো মিনিট আগে তিনি জাহাজে ওঠেন এবং স্ত্রী রেণু দেবীর সাথে মিলিত হন। কারণ আব্বার খবর পেয়ে তারাও জাহাজ ধরেছিলেন গোপালগঞ্জে যাওয়ার জন্য। জাহাজেই তখন শুয়ে ছিল কন্যা হাসিনা এবং পুত্র কামাল। তারা তাঁদের আব্বাকে হঠাৎ করে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। সারা রাত ওরা আর ঘুমোয়নি আনন্দে। স্ত্রী, কন্যা, পুত্রকে পেয়ে আবেগে আপ্লুত মুজিবুরের মনের মধ্যে যেন একটা বিষাদের ছায়া। তিনি তাঁর আব্বাকে জীবিত পাবেন কিনা! এক দিন এক রাত পরে মুজিবুর যখন বাড়ি পৌঁছলেন তখন দেখেন তার আব্বাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গোপালগঞ্জে। তিনি আর দেরি না করে রাতেই নৌকা করে গোপালগঞ্জ ছুটলেন। নৌকায় চৌদ্দ মাইল। রাত শেষে ভোর হয়ে গেল। গোপালগঞ্জে পৌঁছে আব্বাকে দেখে যেন মুজিবুর কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। দুজন চিকিৎসক তাঁকে দেখছিলেন। এঁরা হলেন ড. ফরিদ আহমদ সাহেব এবং ড. বিজিতেন সাহেব। তাঁরা বলেছিলেন ভয়ের কোনো কারণ নেই। পুত্র মুজিবুরকে কাছে পেয়ে অনেকটাই সুস্থ বোধ করেন শেখ লুৎফুর রহমান।

এই অবস্থার মধ্যেই আতাউর রহমান সাহেবের টেলিগ্রাম পান মুজিবুর। তাতে লেখা শহীদ সাহেব মুজিবুরকে দ্রুত করাচিতে যেতে বলেছেন। পরের

দিন রাতেই মুজিবুর খুলনা যশোর হয়ে প্লেনে পৌঁছলেন ঢাকা। ঢাকা থেকে করাচি। কিন্তু করাচি পৌঁছেও যেন শহীদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে উৎসাহ পাচ্ছিলেন না। শহীদ সাহেব কেন যে মোহাম্মদ আলী সাহেবের আইনমন্ত্রী হতে গেলেন সেটা মুজিবুর কিছুতেই মনের দিক থেকে মেনে নিতে পারছিলেন না। মুজিবুরকে দেখেই সোহরাওয়ার্দী সাহেব বললেন–"গত রাতে এসেছ শুনলাম, রাতেই দেখা করা উচিত ছিল।"

একথা শুনে মুজিবুর সোজাসুজি বলেছিলেন–"ক্লান্ত ছিলাম, আর এসেই বা কি করব, আপনি তো এখন মোহাম্মদ আলী সাহেবের আইনমন্ত্রী।"

শহীদ সাহেব বললেন, "রাগ করছ বোধহয়।" মুজিবুর বললেন–"রাগ করব কেন স্যার, ভাবছি সারা জীবন আপনাকে নেতা মেনে ভুলই করেছি কি না?" যাই হোক পাকিস্তান যে জঘন্য খেলায় মেতেছে এবং তাদের ষড়যন্ত্র যে শহীদ সাহেব থেকে অনেকের পক্ষেই বোঝা কষ্টকর তা অনুভব করেন মুজিবুর। যদিও শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার সকল রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন সোহরাওয়ার্দী সাহেব। কয়েক দিন করাচিতে কাটিয়ে মুজিবুর ঢাকা চলে এলেন।

১৯৫৫ : সংসদে বললেন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম জারি থাকবে

১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয় লাভ করে। এই বিপুল জয়ের মূল কাণ্ডারি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ঐ নির্বাচনে ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয় ২২৩টি আসনে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ একাই পায় ১৪৩টি আসন। এত বিপুল আসন পাওয়া সত্ত্বেও সেদিন শুধুমাত্র সৌজন্যতার খাতিরে প্রবীণ জননেতা এ. কে. ফজলুল হককে প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের বয়স তখন মাত্র চৌত্রিশ বছর। বয়সের কারণেই হয়তো সেদিন তাঁর নাম প্রস্তাবিত হয়নি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। তা না হলে হয়তো বা বাংলাদেশের ইতিহাস অন্যরকমভাবে রচিত হতো। যাই হোক ১৫ মে মুজিবুর ঐ প্রাদেশিক সরকারের কৃষি ও বনমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। এত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও ৩০ মে পাকিস্তানের স্বৈরশাসক গোষ্ঠী যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেয়। ৩০ মে তারিখেই মুজিবুর ঢাকায় ফিরে আসেন। এবং মাত্র দুই দিনের মধ্যেই তিনি গ্রেপ্তার হয়ে যান। প্রায় সাত মাস পর ১৯৫৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর তিনি মুক্তি লাভ করে, জেলের চার দেওয়াল থেকে।

এরপর আরো ছয় মাস তিনি অতিবাহিত করেন নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে। ১৯৫৫ সালের ৫ জুন। গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হলেন তিনি। ১৭ জুন ঢাকার পল্টন ময়দানে এক ঐতিহাসিক সভার আয়োজন করে আওয়ামী লীগ। সেই সভা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়। ঘোষণা করা হয় ২১ দফা দাবি সনদ। ২৩ জুন আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদের সভা আহ্বান করা হয়। ঐ সভা থেকেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন প্রদান না করা হলে আওয়ামী লীগ সদস্যবৃন্দ দেশের আইনসভা থেকে পদত্যাগ করবেন।

২৫ আগস্ট দৃপ্ত ভূমিকায় করাচির মাটিতে দাঁড়িয়ে পাকিস্তান গণপরিষদে শেখ মুজিবুর বলেন–

"Sir, you will see that they want to place the word 'East Pakistan' instead of East Bengal. We have demanded so many times that you should use Bengal instead of Pakistan. The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own. You can change it ony ofter the people have been consualted."

...অর্থাৎ "স্যার আপনি দেখবেন ওরা 'পূর্ব বাংলা' নামের পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তান নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে, আপনারা এটাকে বাংলা নামে ডাকেন। 'বাংলা' শব্দটার একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, আছে এর একটা ঐতিহ্য। আপনারা যদি এই নাম পরিবর্তন করতে চান তাহলে আমাদের বাংলায় আবার যেতে হবে এবং সেখানকার জনগণের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হবে তারা নাম পরিবর্তন মেনে নেবে কি না?"

১৯৫৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর দুপুর আড়াইটার সময় করাচির মাটিতে দাঁড়িয়ে যে সাহস এবং জাত চেনালেন তা বিশ্বের গণতন্ত্রের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেদিন তিনি গণপরিষদে এক জোরালো বক্তৃতায় গভর্নর এবং গভর্নর জেনারেলকে অসীম ক্ষমতা না দেওয়ার কথা বলেন। তিনি বলেন গভর্নর এবং গভর্নর জেনারেলের হাতে অসীম ক্ষমতা প্রদান করা হলে সেটা হবে গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক। কারণ অসীম ক্ষমতা প্রদান করা হলে তাতে প্রতি স্তরে জন্ম দেবে দুর্নীতির। গণপরিষদে সকল সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি সেদিন বলেছিলেন–"সরকারি দলের মাননীয় সদস্যগণ আপনারা ভারতীয় দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারেন। সেখানে ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ রাষ্ট্রপতি। তিনি কি প্রধানমন্ত্রী অথবা মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদন ব্যতীত কিছু করতে পারেন? সেটা সম্ভব নয়। এমনকি ইংল্যান্ডের রানীর পক্ষেও কিছু করা সম্ভব নয়। কারণ তাকে মন্ত্রিপরিষদের উপদেশ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। তবে আপনারা যদি মনে করেন যে, পাকিস্তান একটা স্বৈরাচারী দেশ, এখানে গভর্নর জেনারেল সর্বক্ষমতাময় এবং তিনি কনস্টিটিউট অ্যাসেম্বলি বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারবেন এবং ফেডারেল অঞ্চলে বিভক্ত করার ক্ষমতা তাঁর থাকবে, সে ক্ষেত্রে আমার তেমন কিছু বলার নেই। তবে সেটা হবে গণতন্ত্রের মূলনীতি বিরোধী।' ২৮ সেপ্টেম্বর, ১ অক্টোবর তিনি পুনরায় বিভিন্ন বিষয়ে পার্লামেন্টে পূর্ব বাংলার মানুষের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে জোরালো বক্তব্য রাখেন।

এদিকে ১৯৫৫ সালের ২১ অক্টোবর দিনটিও খুবই স্মরণীয়। কারণ ঐ দিনেই আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা থেকে মুসলিম শব্দটি প্রত্যাহার করা হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানকেই পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। ঐ বছরের ৯ নভেম্বর দুপুর তিনটের সময় মুজিবুর করাচিতে গণপরিষদে জোরালোভাবে বলেন যে, পাকিস্তান সরকার যেন গণপরিষদের সেশন ডাকার ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় না গ্রহণ করে। তিনি সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, জনগণ এই ধরনের অগণতান্ত্রিক কার্যাবলিকে সহ্য করবে না। প্রথম অধিবেশনেই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বুঝতে পেরেছিল যে গণপরিষদের মাননীয় এই সদস্যটি অন্য ধাতুতে গড়া। তাঁর উপস্থিতিতে কিছুতেই জনগণকে ধোঁকা দেওয়া যাবে না।

১৯৫৬ : ১৪৪ ধারা ভেঙে নেতৃত্ব দেন ভুখা মিছিলের

১৯৫৬ সালের ১৭ জানুয়ারি মঙ্গলবার দুপুর ৩টায় শেখ মুজিবুর পাকিস্তানের গণপরিষদে জোরালোভাবে আওয়াজ তুললেন যে সংসদে ইংরেজি এবং উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষাতেও কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

১৯৫৬ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সংসদে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান বলিষ্ঠভাবে। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা বলেন। এর আগে ১৯৫৬ সালের ২১ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিককে সমান অধিকার দিতে হবে। তিনি ঐদিন এই বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন পেশ করেন স্পিকারের কাছে।

এদিকে ১৯৫৬ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেছিলেন যে, খসড়া শাসনতন্ত্রে যাতে অবশ্যই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়। সংসদের ভেতরে শেখ মুজিবুর রহমানও ঐ একই দাবিতে সংগ্রাম করে চলেছেন। ১৪ জুলাই আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সভায় শেখ মুজিবুর আওয়ামী লীগের সভায় প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা করে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব আনলেন। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল।

১৯৫৬ সালের ৪ সেপ্টেম্বর। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে খাদ্যের দাবিতে একটি মিছিল বের হয়েছিল। মিছিলটি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে পুলিশ চকবাজার এলাকায় মিছিলের উপর গুলি করে। গুলিতে ৩ জন ভুখা মানুষ নিহত হন।

ঐ বছরই সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে মন্ত্রিসভায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কোয়ালিশন সরকারের ঐ প্রস্তাব নিয়ে আওয়ামী লীগে ব্যাপক আলোচনা হয়। আলোচনার শেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রিসভায় যোগদান করবেন। এই নিয়ে তিনি দ্বিতীয়বার মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। তাঁকে দেওয়া হলো–শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ। মোট পাঁচটি দপ্তরের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তাঁকে।

ঐ বছরের ২৯ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের সংগ্রামের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যমণ্ডিত দিন। ঐ দিন পাকিস্তান সরকার স্বায়ত্তশাসনের কোনো বিধান ছাড়াই এবং শক্তিশালী কেন্দ্রের ভিত্তিতে দেশের খসড়া সংবিধান প্রণীত

হয়েছিল। এর প্রতিবাদে সেদিন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ওয়াকআউট করেন। এই ওয়াকআউটের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এই ধরনের সংবিধানের ব্যাপারে বছরের গোড়াতেই শেখ মুজিবুর জনগণকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি ১৯৫৬ সালের ২৯ জানুয়ারি ঢাকার পুরোনো পল্টনে এক সভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে–

"যদি সংবিধান পাশ হয়ে যায় তাহলে পূর্ব বাংলাকে কলোনি করা হবে। পূর্ব পাকিস্তানকে সমস্যা জর্জরিত করে রাখার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করা হবে এবং আমাদের কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হবে।"

১৯৫৬ সালের ৯ এপ্রিল মুজিবুরকে যেতে হয়েছিল সুইডেনের স্টকহোমে। সেখানে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি পরিষদের সভায় পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। ঐ বছরের ১৯ এবং ২০ মে তিনি আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সেশনে আওয়ামী লীগ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেন এবং তিনিই ঐ কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ঐ বছরের ২৫ মে দিনটিও স্মরণীয় হয়ে আছে। কেননা তাঁর নির্দেশেই দেশের জনগণ দেশব্যাপী খাদ্য দাবি দিবস পালন করেছিলেন। ঐ বছর প্রায় পুরো সময়েই তিনি পাকিস্তান সংসদে জনগণের কণ্ঠকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালের ১১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার তিনি পাকিস্তান সংসদে জয়েন্ট ইলেক্টরেট ব্যবস্থার পক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ঐ বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান গণপরিষদে খসড়া সংবিধান বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, পাকিস্তানের জনগণের অবশ্যই রাজনৈতিক দল গঠন ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার থাকতে হবে। একদিন পর ৬ ফেব্রুয়ারি করাচিতে গণপরিষদে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, সরকারের শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে অবশ্যই পৃথক করতে হবে। এতে জনগণের সুবিচার বা ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত হবে। ঠিক তার পরের দিনই শেখ মুজিবুর রহমান সংসদে দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বলেন যে, বাংলা যেহেতু পাকিস্তানের ৫৬% মানুষের ভাষা, তাই ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু এবং বাংলা। ৮ ফেব্রুয়ারি তিনি সংসদে দাঁড়িয়ে বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এমন কোনো ক্ষমতা থাকা ঠিক নয় যার দ্বারা তারা প্রাদেশিক সরকারের কাজে অপ্রয়োজনীয়ভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে।" তাই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা, মুদ্রা এবং পররাষ্ট্র বিষয় থাকতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

চাকরির সমতা, নিবর্তনমূলক আটক : গণপরিষদে সোচ্চার শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৫৬ সালটি শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনে একটি তাৎপর্যমণ্ডিত বর্ষ। গণপরিষদের সদস্য হিসেবে নানা রকম বৈষম্য নিয়ে তিনি যেমন পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তেমনি জনগণের ন্যায়বিচার নিয়েও সোচ্চার হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় শেখ মুজিবুরের দাবি-দাওয়া এবং প্রস্তাবসমূহ নিয়ে পাকিস্তান সরকারকে ভাবতে হয়েছিল। যেগুলো উপেক্ষা করা সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। ১৯৫৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি খসড়া সংবিধান নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেছিলেন উপেক্ষা নয়, বরং প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য চাকরিতে বাঙালিদের ন্যায্য অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি বলেছিলেন—

"জনসংখ্যার ভিত্তিতে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার দাবি আমাদের। শুধুমাত্র সংসদের প্রতিনিধিত্ব নয়, প্রতিরক্ষাসহ অন্যান্য সকল চাকরিতেও সমতা চাই আমরা। সব বিষয়েই সমতা চাই আমরা। এ বিষয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যাব।"

ঐ বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি খসড়া সংবিধান নিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি জনগণবিরোধী নিরাপত্তা, নিবর্তনমূলক ও বিনা বিচারে আটক আইন বিষয়ে জোর বক্তব্য তুলে ধরেন। এই ধরনের আইন যে মূলত কালাকানুন এবং যেগুলো যে প্রায় সবসময়ই প্রতিপক্ষ বা বিরোধীদের দমন-পীড়নের জন্যই ব্যবহৃত হয় তা তিনি ব্যক্ত করেন।

মুজিবুর বলেন, "একটা উদাহরণ দিয়ে দেখান যেখানে ইসলামী আইনে বিনা বিচারে শাস্তি দেয়া হয়েছে? আমি যত দূর জানি যে, বিনা বিচারে কাউকেই শাস্তি দেয়া যায় না। আর এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটা হবে জনগণকে ধোঁকা দেয়া। কিছুদিন আগে পূর্ব বাংলায় একটি ইসলামিক কনভেনশন হয়েছিল। সেখানে ইসলামী পণ্ডিতরা সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, বিনা বিচারে কাউকেই গ্রেপ্তার করা যাবে না।"

১৪ ফেব্রুয়ারি তিনি আলোচনায় অংশ নিয়ে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি এবং জায়গিরদারি ব্যবস্থা বাতিলের বিষয়ে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ঐদিন আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, "আমরা একটা ইসলামী সংবিধান তৈরি করছি এবং আমরা মুসলমান। ইসলাম আমাদের প্রত্যেকের

প্রয়োজন অনুসারে সমভাবে সম্পদ বণ্টনের শিক্ষা প্রদান করেছে। কিন্তু আমরা এখন কী দেখছি? একজন পিয়ন মাসে ৫০ রুপিজ বেতন পায় এবং রাষ্ট্রপ্রধান বেতন পান মাসে ১২,০০০ রুপিজ এবং সবকিছু ফ্রি। আমরা কেন আমাদের নিজেদের ভাইদের শোষণ করছি? তাদেরকে আর শোষণ করা সম্ভবপর নয়।"

জমিদারি প্রথা এবং জায়গিরদারি প্রথা বাতিল করা প্রসঙ্গে তিনি গণপরিষদে দাঁড়িয়ে ঐদিনই বলেছিলেন—"পূর্ব বাংলার জমিদার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জায়গীরদারদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। দু' শ্রেণির লোকেরাই প্রথম থেকে গরিব কৃষকদের শোষণ করেছে এবং কখনো ইসলামের নামে, পাকিস্তানের নামে এবং মানবতার নামে তাদেরকে শোষণ করছে। সেই কারণেই জমিদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা উচিত এবং তাদেরকে কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়া উচিত না।"

১৯৫৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান সংসদে দাঁড়িয়ে খসড়া সংবিধান সংক্রান্ত আলোচনায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে দৃঢ় বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি অভিযোগ করে বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য বিভাজন নীতি প্রচলন করেছেন।

মুজিবুর বলেন—

"আমাদের জন্য বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা আমাদের জন্য জীবন মরণ একটা বিষয়। আমরা সমতার বিষয়টি গ্রহণ করেছিলাম এই শর্তে যে, আমরা সব বিষয়ে সর্বত্রই সমতার সুযোগ পাব। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হয়নি। তারা এখন সমতার মূলনীতিই ভঙ্গ করেছে। পূর্ব বাংলার মানুষ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত।"

১৬ ফেব্রুয়ারি পুনরায় শেখ মুজিবুর রহমান দৃঢ়তার সঙ্গে সংসদে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সর্বস্তরে চালু করার ব্যাপারে দাবি জানান। মুজিবুর বলেন—"আমরা উর্দু ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করলেও সিন্ধু, পাঞ্জাব ও সীমান্ত অঞ্চলের ভাষাকে আমরা পরিত্যাগ করবো না। তাদের ভাষাও উন্নত করতে হবে। কিন্তু সেজন্য সরকারি সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।"

২১শে ফেব্রুয়ারি অধিবেশনে প্রবেশ করেই বাংলা ভাষার জন্য ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি যাঁরা আত্মবলিয়ান করেছিলেন তাদের প্রতি শুদ্ধা জানিয়ে অধিবেশন মুলতবি রাখার অনুরোধ করেন স্পিকারকে।

যথারীতি শেখ মুজিবুরের আবেদন সভায় উপেক্ষিত হয়। পরে তিনি ঐদিন আলোচনায় অংশ নিয়ে ঢাকাতে দেশের রাজধানী গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তাঁর এই বক্তব্যের পক্ষে অসংখ্য যুক্তি উপস্থাপন করেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান মহিলাদের জন্য কমপক্ষে ২০টি আসন সংরক্ষণের দাবি তুলেন। তিনি বলেন, "এতে মহিলাদের উন্নয়নের রাস্তা সম্প্রসারিত হবে এবং মহিলারা জাতিগঠনমূলক কাজে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। মহিলারা দেশের সমান নাগরিক হিসেবে পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারবে।"

১৯৫৭ : তীব্র প্রতিবাদে পদত্যাগ করলেন মন্ত্রিসভা থেকে, দ্বিতীয়বার চীনে

১৯৫৭ সাল। ঐ বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের কাগমারীতে অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন। ঐ অধিবেশনে পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে জাতীয়তাবাদী এবং বামপন্থীদের মধ্যে তুমুল বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। এই সময়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে আওয়ামী লীগের সদস্য সংখ্যা তখন ছিল মাত্র তেরো জন। সেই সময় পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে তীব্র সমালোচনার মুখে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী বলেছিলেন, কোয়ালিশন সরকারের সংখ্যালঘু অংশীদার হয়ে তাঁর পক্ষে আওয়ামী লীগ ম্যানিফেস্টোতে ঘোষিত পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের এই মন্তব্যে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুজিবুর।

এদিকে আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে সরকারি কাজ করার ব্যাপারে বলা হয়েছিল যে, পার্টির কর্মকর্তাদের কেউ মন্ত্রিত্বের শপথ গ্রহণ করলে তাঁকে পার্টির কর্মকর্তার দায়িত্ব পরিত্যাগ করতে হবে। সেই সময় বাংলা প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আতাউর রহমান সাহেব। এই পরিস্থিতিতে মুজিবুর ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি মূলত আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করার জন্য মন্ত্রিসভা থেকে সরে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালের ৩০ মে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ঐ বছরেরই ২৪ জুন থেকে ১৩ জুলাই পর্যন্ত মুজিবুরকে দ্বিতীয়বারের মতো চীন সফরে যেতে হয়েছিল। এটা ছিল তাঁর সরকারি সফর। মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করার মধ্যদিয়ে মুজিবরের জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। চীন সফর শেষ করে তিনি পূর্ণ সময়ের জন্য আওয়ামী লীগের সংগঠনে আত্মনিয়োগ করলেন। এই সময় থেকেই মুজিবুর জনগণকে আরো বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হবার আবেদন জানান। পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতি পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি তিনি জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করেন। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যে পূর্ব বাংলার উন্নয়নের জন্য যে কোনো কাজ করবে না তাও তিনি ব্যাখ্যা করেন। পূর্ব বাংলার জনগণ মুজিবুরকে বিশ্বাস করতেন হৃদয় দিয়ে। তাই যেখানেই মুজিবুর সেখানেই জনগণ। তাঁর কথা শোনার জন্য বহু দূর-দূরান্তর থেকে মানুষ চলে আসতেন। তখন থেকেই তিনি অবিসংবাদী এক নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

১৯৫৮ : অষ্টমবারের জন্য গ্রেপ্তার হলেন মুজিবুর, রাজনীতি নিষিদ্ধ

বঙ্গবন্ধু অনেক আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, পূর্ব বাংলার জনগণের দুঃখ-দুর্দশা খুব সহসা দূর হবে না। পূর্ব বাংলার মানুষের জন্য অপেক্ষা করে আছে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। কেননা পাকিস্তান ক্রমশ ক্রমশ চলে যাচ্ছে ফ্যাসিবাদের দিকে। ফ্যাসিবাদ যতই আগ্রাসী ভূমিকা নেয় জনগণ ততই গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে ব্রতী হয়। সুতরাং পূর্ব বাংলার মানুষের সামনে সংগ্রাম করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। এরই মধ্যে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং সামরিক বাহিনীর প্রধান পরিবর্তিত হয়েছে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হয়েছেন মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা। এবং সামরিক বাহিনীর প্রধান হয়েছেন জেনারেল আয়ুব খান? এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো এই যে, সকল সমস্যার মূলে রয়েছে রাজনীতি। সুতরাং দেশ থেকে রাজনীতিকে নির্মূল করতে হবে। এই নির্মূল করার প্রথম ধাপ হলো রাজনীতিকে নিষিদ্ধকরণ।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের ইতিহাসে একটি কালো দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ঐদিন শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানের মাটিতে রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করে জরুরি অবস্থা জারি করেন। উদ্দেশ্য একটাই, পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা খুব সহজ হবে। জরুরি অবস্থা জারির মাত্র চার দিনের মাথায় অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের ১১ অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হলো। এই নিয়ে তাঁকে অষ্টমবারের মতো গ্রেপ্তার করা হলো। তাঁর নামে অসংখ্য মিথ্যা মামলা জুড়ে দেয়া হলো। অত্যন্ত অন্যায়ভাবে সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে শাসকগোষ্ঠী তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। যাতে মুজিবুরের কণ্ঠস্বর জনগণ আর শুনতে না পারে।

এই পর্বে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী মুজিবুরকে মোট চৌদ্দ মাস জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। চৌদ মাস পরে মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিয়েছিল বটে কিন্তু জেলখানার গেট থেকে তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। এই নিয়ে মোট নয়বার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ধারণা এটাই ছিল যে, জনগণের এই প্রিয় নেতাকে জেলখানায় বন্দি করে রাখতে পারলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। নজিরবিহীন এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন

সমগ্র দেশবাসী। মুজিবুর দেখলেন যে, জেলের মধ্যেই যেহেতু তাঁর জীবন কাটছে এবং তিনি জেলখানায় থাকতে থাকতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ছেন সেহেতু আওয়ামী লীগের সম্পাদকের পদ আঁকড়ে থাকা ঠিক নয়। তিনি ১৯৫৮ সালেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য নেতৃবৃন্দের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু জেলখানার মধ্যে থাকলেও এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে, আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ তাঁর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করলেন না। সকলের অনুরোধ ফেরাতে পারলেও সোহরাওয়ার্দী সাহেবের অনুরোধ ফেরাতে পারেননি। ফলে সেই পদত্যাগ পত্র তাঁকে প্রত্যাহার করে নিতে হয়।

সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতিবাদের মুখে বাধ্য হয়ে সরকার তাঁকে ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে জেলখানা থেকে মুক্ত করে। সেই সময় দু' মাসের জন্য ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কয়েকটি দেশ তাঁকে সফর করতে হয়েছিল। এটা ছিল একটি সরকারি কর্মসূচি। মূলত লিডারশিপ বিনিময় কর্মসূচিতে অংশ নিয়েই তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্র সফর করেন। ১৯৬০ সালের ৫ জুন তারিখে 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকার সঙ্গে এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন যে, "দেশের প্রধান সমস্যা হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট মির্জা। গণতন্ত্র রক্ষা করতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাঁর অপসারণের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।"

১৯৬০ সালের ১৩ জুন ঢাকার পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের একটি বড় সমাবেশে মুজিবুর বলেছিলেন–

"মুসলিম লীগের সৃষ্ট পাকিস্তান ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে ইস্কান্দার মির্জা এই প্রদেশের গভর্নরথাকা কালে ৯২ (ক) ধারায় ১৫ হাজার কর্মীকে কারাগারে বন্দি করে রাখেন। কিছু শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী, যারা প্রধানত মোজাহের, তারা চেষ্টা করেছেন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আওয়ামী লীগ সরকারকে অপসারণের জন্য অস্বাভাবিকভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করতে এবং এর ফলে আওয়ামী লীগ সরকারের সুনাম হানি হবে।"

এই সময়েই মুজিবুর স্বৈরতান্ত্রিক পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস পালনের আহ্বান জানান। তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ৪ জুলাই ১৯৫৮ তারিখে ১৪৪ ধারা জারি এবং প্রদেশে প্রেসিডেন্ট শাসন চালুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস পালন করার আহ্বান জানান। ১৯৫২ সালের ৬ জুলাই নারায়ণগঞ্জের এক সভায় মুজিবুর বলেছিলেন–মনে রাখবেন–

"ইস্কান্দার মির্জা মুর্শিদাবাদের মীরজাফর পরিবারের একজন ব্যক্তি।" মুজিবুর বলেন–"আমার যদি আনেক টাকা থাকত আমি আপনাদের করাচি নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারতাম সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের রাজাদের অর্থে কতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করা হয়েছে। আমরা সবকিছুতেই পঞ্চাশ ভাগ চাই।"

১৯৬০ সালের ২৪ জুলাই মুজিবুর 'মর্নিং নিউজে' দেয়া আরেকটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, "কেন্দ্রীয় সরকার যদি মনে করে থাকে যে, তারা আমাদের প্রভু, তাহলে মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। আমি জানি না, পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে আর কত দিন এই চক্রান্তের খেলা চলবে।" তিনি আরো বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সংবিধানের পদ্ধতি অনুযায়ী শাসিত হতে চায়, স্বৈরতন্ত্রের মাধ্যমে নয়।

১৯৬০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জের 'শাহেদ আলী দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় বলেছিলেন–"মুসলিম লীগ ও কে এস পি পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থকে করাচির কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়ে পাকিস্তানের জনগণকে ব্যবহার করে পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের সুবিধা প্রদান করতে চায়।" এইভাবে ১৯৫৯ সাল পুরো বছরটিই তিনি বিভিন্ন জনসভায় বক্তব্য রেখে জনগণকে বৃত্তহর সংগ্রামের জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে তুলেছিলেন।

১৯৬০ : গড়ে উঠল "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ"

১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত এই চার বছর এক দিনের জন্য মুজিবুরকে শান্তিতে রাখেনি পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে মুজিবুরকে বিনা কারণে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করা হয়। এই নিয়ে তাঁকে নবম বারের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়। চৌদ্দ মাস পরে ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে তাঁকে ছাড়া হয়েছিল। পাকিস্তানের সামরিক সরকার আর কিছু বুঝক না বুঝক, অন্তত এটা বুঝতে পেরেছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মুখ বা মূল নেতৃত্ব হলেন জনপ্রিয় জননেতা শেখ মুজিবুর রহমান। এই সময় তিনি যত দিন জেলখানার বাইরে ছিলেন তত দিনই তাঁকে গোপনে সাংগঠনিক কাজ চালাতে হয়েছিল। কেননা আইয়ুব খানের শাসনে তিনি যে কোনোদিন পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারেন। সে জন্যই সামরিক শাসন এবং আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলন তাঁকে অত্যন্ত সতর্কভাবেই করতে হয়েছিল। যথেষ্ট গোপনীয়তার সঙ্গে সেই সময় তাঁকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করতে হয়েছিল।

১৯৬০ সালে তাঁর অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' গঠন। পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। এটি ছিল পুরোপুরি একটি গোপনীয় সংগঠন। এই সময়ে মুজিবুর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য বিশিষ্ট ছাত্র নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এই সংগঠনটি গড়ে তুলেছিলেন। প্রতিটি মহকুমা বা থানা এলাকাতেই ছিল এই সংগঠনের শাখা স্তর। অর্থাৎ সংগঠনটির নিউক্লিয়াস বা ইউনিট গঠন করা হয়েছিল। দেশে যেহেতু সামরিক শাসন চলছে সেহেতু চূড়ান্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করে এই সংগঠনটি তিনি গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে কয়েক হাজার ছাত্র-যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। একদিকে আওয়ামী লীগ অন্যদিকে ন্যাপ–এই দুটি সংগঠনের বাছাই করা কর্মীদেরকেই মূলত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আমরা যদি ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাই তাহলে এটা বলব যে, ১৯৬০-৬১ সাল থেকেই বর্তমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন যদিও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকাগার, কিন্তু ১৯৬০ সালের আইয়ুব খানের সামরিক শাসনই এই স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করে তুলেছিল। এই সময় থেকেই পূর্ব

বাংলার জনগণ স্বচ্ছভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে তাঁরা স্বাধীন হননি, শুধুমাত্র শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন ঘটেছে। বঙ্গবন্ধু নিজেও অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, তাঁকে জেলের বাইরে বেশি দিন থাকতে দেবে না। তাই তিনি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সমগ্র পূর্ব বাংলার সর্বত্র স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ গঠন করতে সচেষ্ট এবং সক্ষম হয়েছিলেন। মুজিবুরের আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হয়েছিল, কারণ ১৯৬২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি মুজিবুরকে পুনরায় গ্রেপ্তার করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠী। এই নিয়ে তিনি দশমবারের জন্য গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

১৯৬২ : দশমবারের জন্য গ্রেপ্তার হলেন শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৫৮ সাল থেকে যে সামরিক শাসন পূর্ব পাকিস্তানে চলছিল তার অবসান ঘটে ১৯৬২ সালে। ১৯৬২ সালের ৪ জুন পর্যন্ত জারি ছিল এই সামরিক শাসন। চার বছরের এই সামরিক শাসনের মধ্যে মুজিবুরকে পর পর দুবার গ্রেপ্তার করে প্রায় দু' বছর আটক করা হয়েছিল জেলে। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে মুক্তি দেয়া হয়। এই পর্বে তিনি জেলে ছিলেন চৌদ্দ মাস। ১৯৬২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি মুজিবুরকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। এটা ছিল তাঁর দশমবারের জন্য গ্রেপ্তার বরণ। ১৯৬২ সালের ২ জুন পাকিস্তানের সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। চার বছরের সামরিক শাসন উঠে যাওয়ার পর ১৯৬২ সালের ১৮ জুন মুজিবুরকে জেল থেকে মুক্ত করা হয়। অর্থাৎ তিনি এই পর্বেও প্রায় পাঁচ মাস জেলে অবরুদ্ধ হন।

জেল থেকে মুক্ত হয়েই মুজিবুর এবং অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ যৌথভাবে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। দিনটি ছিল ২৫ জুন। এই বিবৃতিতে আইয়ুব খানের গণতন্ত্রবিরোধী স্বৈরতন্ত্রী শামরিক শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা বর্ষিত হয়। বিবৃতিতে মুজিবুরসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ দেশের মানুষের উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্রের পক্ষে জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। এই বিবৃতিতে নতুন করে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করার জন্যও আহ্বান জানান জাতীয় নেতৃবৃন্দ।

এই সময়েই অর্থাৎ ১৯৬২ সালের ৫ জুলাই ঢাকার পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য দলের যৌথ আহ্বানে আয়োজিত হয় একটি বিশাল জনসভা। সেই সভাতে জ্বালাময়ী ভাষণের মধ্য দিয়ে মুজিবুর দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান এবং পাকিস্তান সরকারের একের পর এক অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। সামরিক শাসন উঠে যাওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে যে অসংখ্য জনসভা আয়োজিত হয় তার বেশিরভাগেই বক্তব্য পেশ করেন শেখ মুজিবুর রহমান।

এরই মধ্যে ১৯৬২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর মুজিবুরকে লাহোর যেতো হয়েছিল। ঐ সময় লাহোরে জাতীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে

গঠিত হয়েছিল একটি জাতীয় ফ্রন্ট। বিরোধী দলগুলোকে নিয়ে গঠিত এই জাতীয় মোর্চা বা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সভায় যোগ দেয়ার জন্যই তাঁকে সেদিন লাহোর যেতে হয়েছিল। ঐ সভায় যোগ দিয়ে পরের মাসেই অর্থাৎ সমগ্র অক্টোবর মাস ধরে মুজিবুর শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে সারা পূর্ব বাংলার প্রতিটি জেলায় জনসভা করেন এবং দেশের সামগ্রিক পরিস্থিত জনগণের সামনে তুলে ধরেন। এই সময় থেকেই অবিসংবাদী নেতা হয়ে উঠলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৬৩ : লন্ডন সফরে মুজিবুর

১৯৬২ সালের শেষের কয়েক মাস মুজিবুর রহমানকে শহীদ জনাব সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে পূর্ববঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলা সফর করতে হয়েছিল। প্রতিটি জেলাতেই ছিল জনসভার কর্মসূচি। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বয়স তখন আশি বছরের উপরে। অথচ প্রায় প্রতিটি জনসভাতে তাঁকেই বক্তৃতা করতে হয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমান এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো জনপ্রিয় দুই জাতীয় নেতা জেলার কোনো জনসভাতে বক্তৃতা করলে জনসভাস্থল যেমন লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে তেমনি জেলাগুলোতে তীব্র আলোরণের সৃষ্টি হয়। এইভাবে জনসভাগুলোতে অংশ নিতে গিয়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেব ক্রমশই অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতার তীব্রতা এত বেশি ছিল যে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে লন্ডনে যেতে হয়েছিল চিকিৎসার জন্য। মুজিবুর যখন শুনলেন যে, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের অবস্থা সংকটজনক তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। মুজিবুর সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করে ছুটে গেলেন লন্ডনে। যদিও ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর শহীদ জনাব সোহরাওয়ার্দী সাহেবের জীবনাবসান ঘটে।

এদিকে ঐ বছরই পাকিস্তানের সামরিক শাসক পশ্চিমে পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত রাজনৈতিক দলসমূহের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে আওয়ামী লীগ আবার অনেক দিন পর স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করতে পেরেছিল। এটা সকলেরই জানা যে, শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক প্রেরণা যা নির্দেশক ছিলেন সোহরাওয়ার্দী সাহেব। ছাত্র অবস্থা থেকেই তিনি সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে নেতা মেনে তাঁর রাজনৈতিক জীবন গড়েছিলেন। ফলে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রয়াণ মুজিবুরকে মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।

এদিকে শেখ মুজিবুর রহমানও যাবতীয় বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ধীরে ধীরে জাতীয় এবং অবিসংবাদী নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকেন। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, যেখানেই মানুষ সেখানেই মুজিবুর। যেখানেই সংগ্রাম সেখানেই মুজিবুর। মুজিবুর এবং সংগ্রাম যেন দুটি সমার্থক শব্দ হয়ে উঠল সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে। এদিকে মুজিবুর রহমানও কঠিন এক

প্রতীজ্ঞায় ব্রতী হলেন। এই পণ বা প্রতীজ্ঞা হলো পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের হাত থেকে মুক্ত করা। মুজিবুরের উপর দেশের মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস যেন দ্রুত গতিতে বাড়তে লাগল। ফলে জনগণকে সংগঠিত করাই ছিল ঐ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অসম্ভব নিষ্ঠা এবং সততা নিয়ে মুজিবুর সাংগঠনিক কাজকর্ম করে যেতে লাগলেন। তিনি তীব্রভাবে অনুভব করতে লাগলেন যে, একটা বড়ো মাপের দেশপ্রেমিক সংগ্রাম যেন তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। সেই সংগ্রামেরই অপর নাম ছিল মুক্তি সংগ্রাম।

১৯৬৪ : গড়ে তুললেন 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ'
একাদশতম গ্রেপ্তার বরণ

১৯৪৭ সালে প্রথমবার স্বাধীনতা লাভ, পাকিস্তান গঠন থেকে শুরু করে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ এই আঠারো বছরে পূর্ব বাংলার মানুষ তাদের জীবনের অভিজ্ঞতার নিরিখে অন্তত এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায় দেশ চালাতে চায়। দমন-পীড়নের মাধ্যমেই তারা দেশ পরিচালনা করবেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়। অর্থাৎ প্রকৃত মুক্তি বা স্বাধীনতা লাভ করতে হলে ব্যাপক স্বাধীনতার সংগ্রাম বা মুক্তির সংগ্রাম শুরু করতে হবে। এই সংগ্রামে যে শেখ মুজিবুর রহমানই নেতৃত্ব দেবেন তাও জনগণ প্রথম থেকেই অনুভব করতে শুরু করেন। আর সে জন্যই শেখ মুজিবুর রহমান কী কর্মসূচি গ্রহণ করছেন, কী বার্তা দিচ্ছেন মানুষের কাছে, সেই ব্যাপারে দলমত নির্বিশেষে মানুষের আগ্রহ বাড়তে থাকে।

এই রকম পরিস্থিতেই এলো ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি। সেদিন শেখ মুজিবুরের বাসভবনে বসেছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা। সেই সভার লক্ষ্য ছিল মূলত আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা। ঐ সভায় দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটের মাধ্যমে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। তাৎপর্যমণ্ডিত ঐ সভায় নতুন করে আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছিল। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

নতুনভাবে সম্পাদক নির্বাচিত হবার পর মুজিবুর আওয়ামী লীগ সংগঠনকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে চাইলেন। গ্রহণ করলেন ব্যাপক কর্মসূচি। প্রতিটি কর্মসূচিতেই মানুষের অংশগ্রহণের উপর জোর দিলেন।

এলো ১৯৬৪ সালের ১১ মার্চ। এই দিবসটি পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তির সংগ্রামে অবশ্যই একটি ঐতিহাসিক দিবস। ঐ দিনেই শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব গঠিত হয়েছিল 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ'। যে সংগঠন পূর্ব বাংলার মানুষের মুক্তির সংগ্রামে একটি অনন্য ভূমিকা পালন করেছিল। এই পরিষদ দেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধেও একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই পরিস্থিতির মধ্যেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মাত্র চৌদ্দ দিন আগে শেখ মুজিবুর

রহমানকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। এই নিয়ে তাঁকে এখন পর্যন্ত এগারোবার অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়। 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা' এবং 'আপত্তিজনক মন্তব্য' এই দুটি অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল প্রতিবারের মতো। ভাবতে অবাক লাগে বিশ্বের প্রথম সারির দেশপ্রেমিক মানুষটির বিরুদ্ধে বারবারই আনা হয় রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ।

এই পর্বে মুজিবুর রহমানকে পুরো এক বছরের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আবার শুরু হয় তাঁর জেলের জীবন। জেলের ভেতর থেকেই তিনি আওয়ামী লীগকে পরিচালনা করতে লাগলেন। পুরো এক বছর পর হাই কোর্টের নির্দেশে তিনি মুক্তিলাভ করেন। শাসকগোষ্ঠীর ধারণা ছিল যে, মুজিবুরকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়ে দিতে পারলেই বুঝি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা গেল যে, মুজিবুর জেলে থাকলেও আওয়ামী লীগের বিপ্লবী কার্যকলাপে কোনো ভাটা পড়ে না। কেননা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে শুরু করলেন, যে মানুষটির নেতৃত্বে দেশের মুক্তি আসবে তিনি শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৬৬ : এলো ৬ দফা মুক্তি সনদ
তিন মাসে গ্রেপ্তার হলেন আটবার

পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের দীর্ঘ স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রতিটি বর্ষই ছিল গৌরবোজ্জ্বল। তার মধ্যেও দুই-একটি বর্ষকে আমরা মাইলস্টোন হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এই রকমই একটি বর্ষ হলো ১৯৬৬ সাল। পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রামে ঐ বছরটি একটি ঐতিহাসিক বছর। বলা চলে ঐ বছর থেকেই প্রত্যক্ষ এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটেছিল। এমনিতেই শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ নেতৃত্বের গুণাবলি, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ জনসাধারণের কাছে তাঁকে আকর্ষণীয় করে তোলে। সেই সময় পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান ছিলেন মূলত জেনারেল আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো। এরা প্রত্যেকেই কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিলেন। তাঁকে জেলের ভেতর কোনোক্রমে ঢোকাতে পারলেই যেন তারা শান্তি পেতেন। বিশেষ করে শেখ মুজিবুরের বাঙালিদের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি ঐতিহাসিক ছয় দফা মুক্তি সনদ যেন শাসকগোষ্ঠীর ভিতকে নাড়িয়ে দেয়, শাসকগোষ্ঠীর বুকে কাপন ধরিয়ে দেয়।

১৯৬৬ সালের ১৮ মার্চ। আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমান দফাওয়ারীভাবে ছয় দফা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি সমগ্র দেশকে জানিয়ে দিয়ে বলেন, এই ছয় দফা শুধুমাত্র পূর্ব বাংলা বা বাঙালিদের মুক্তির জন্য নয় বা শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি নয়, এই ছয় দফা আসলে সমগ্র পাকিস্তানের বাঁচার দাবি। শেখ মুজিবের রহমান এই ছয় দফা যে কেবলমাত্র আওয়ামী লীগের সভায় উত্থাপন করেন তা-ই নয়, তিনি এর আগে ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনে বিষয় নির্বাচনী কমিটিতেও এই ঐতিহাসিক ছয় দফাকে উপস্থাপন করেন। এই ছয় দফাকেই বলা হয় বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ।

এদিকে ১৯৬৬ সালের ১ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এ বছর তাঁকে প্রথম তিন-চার মাসে মোট আটবার গ্রেপ্তার করা হয়। এই আটবারের গ্রেপ্তার নিয়ে মুজিবুরকে ১৯৬৬ সালের

মধ্যে অর্থাৎ তাঁর ৪৬ বছর বয়সের মধ্যে মোট উনিশবার গ্রেপ্তার করেছে সরকার। ১৯৬৬ সালে মুজিবুরকে সিলেট, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা থেকে বারবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ঐ সময়ে মুজিবুরের মূল কর্মসূচি ছিল ছয় দফা দাবির সমর্থনে সারা দেশব্যাপী প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করা। ১৯৬৬ সালের ৮ মে মুজিবুরকে সরকার পুনরায় গ্রেপ্তার করে। ঐদিন তিনি যখন নারায়ণগঞ্জে পাটকল শ্রমিকদের সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন তখনই ভাষণ শেষের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পরের মাসে অর্থাৎ ৭ জুন শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবিসহ আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য সারা বাংলাদেশে সফল ধর্মঘট পালিত হয়। এই ৭ জুনের ধর্মঘট পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। কেননা এই ধর্মঘট চলার সময় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং টঙ্গী অঞ্চলে পুলিশের গুলিতে তেজগাঁও শিল্প এলাকার মনু মিয়াসহ এগারোজন শ্রমিক নিহত হয়েছিলেন। এছাড়াও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ৮০০ জনকে।

১৯৬৬ সালে হোটেল ইডেনে আওয়ামী লীগের যে কাউন্সিল অধিবেশন বসেছিল সেই অধিবেশনটি অন্য একটি কারণেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে দেশবাসীর কাছে। ঐ অধিবেশনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' সংগীতটি উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে গাওয়া হয়েছিল। তখনই শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন সংগীতটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হবে।

শেখ মুজিবুর রহমান প্রস্তাবিত ছয় দফা দাবির মূলকথা

শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তি সনদ ঐতিহাসিক ছয় দফা প্রথম প্রস্তাব এবং ঘোষণা করেছিলেন ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে। এই ছয় দফা দাবির মূল বিষয় ছিল–

১। শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি

"দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমন হবে যেখানে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং এর ভিত্তি হবে লাহোর প্রস্তাব। সরকার হবে পার্লামেন্টারি ধরনের। আইন পরিষদের (Legislature) ক্ষমতা হবে সার্বভৌম এবং এই পরিষদও নির্বাচিত হবে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণের সরাসরি ভোটে।"

২। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা

"কেন্দ্রীয় (Federal) সরকারের ক্ষমতা কেবল দুটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যথা–দেশ রক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।"

৩। মুদ্রা বা অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকবে না। থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেশন রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

৪। রাজাস্ব, কর বা শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

ফেডারেশনের অঙ্গরাজ্যগুলোর কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনোরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে

প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর সবরকমের করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

৫। বৈদেশিক বাণিজ্যবিষয়ক ক্ষমতা

(ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে।

(খ) বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর এক্তিয়ারভুক্ত থাকবে।

(গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত কোনো হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোই মেটাবে।

(ঘ) অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদি চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোনো বাধা-নিষেধ থাকবে না।

(ঙ) শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলো বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্বস্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

৬। আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা

আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

(সূত্র : বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট প্রকাশনা
আগস্ট, ১৯৯৭)

পূর্ব বাংলার জনগণের এই ছয় দফা মুক্তি সনদ বা দাবি সনদই আসলে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চালিকাশক্তি। শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত এই ছয় দফা দাবি সনদ প্রচারিত হয় সমগ্র পাকিস্তানব্যাপী। এই ছয় দফা দাবির জনপ্রিয়তা দেখে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর কপালেও চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল। তারাও শেখ মুজিবুর রহমানের নামে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে কুৎসা রটনা করে। এই কুৎসা দেখে পূর্ব বাংলার জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর প্রকৃত পরিচয় অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

১৯৬৮ : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মুজিবুরের ২০তম গ্রেপ্তার বরণ

শেখ মুজিবুর রহমানের সমগ্র জীবন ও সংগ্রামের মধ্যে ১৯৬৮ সালে তাঁর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাঁর বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করে পাকিস্তান সরকার তাঁকে দেশদ্রোহী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে। এটা যে শাসকগোষ্ঠীর একটি পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রমূলক মামলা তা দেশের জনগণ প্রথম থেকেই অনুভব করতে পেরেছিলেন। ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবুরকে এক অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। এই সময়েই মুজিবুরকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবারের গ্রেপ্তার নিয়ে তাঁর আটচল্লিশ বছরের জীবনের মধ্যে তাঁকে বিশবার গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং ১৭ জানুয়ারি তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। মুক্তি দিয়ে ঐ দিনই তাঁকে জেল গেটে পুনরায় গ্রেপ্তার করে সেনা নিবাসে আটক রাখা হয়।

এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং তাঁকে বারবার গ্রেপ্তারের ঘটনা দেশব্যাপী প্রচার হতেই সারা দেশে বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। বলা যায় জনগণ উত্তাল হয়ে ওঠে। ১৯ জুন ঢাকা সেনা নিবাসে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের বিচারকার্য শুরু হয়। সরকার ১৯৬৮ সালের ২১ এপ্রিল একটি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনাল গঠন করে এই মামলা দায়ের করেছিল। এই মামলা চলাকালীন সময়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে নিহত হয়েছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ড. জোহা এবং সার্জেন্ট জহুরুল হক। এই সময়ে জনাব মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গোটা বাংলাদেশে আন্দোলন তীব্র হয়। সেই সময় জনগণ ক্যান্টনমেন্ট অবরোধও করেছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তির দাবিতে যখন গোটা পূর্ব বাংলা উত্তাল হয়ে পড়েছিল তখন পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার এই তীব্র আন্দোলনের মুখে সাজানো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবুরকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। সারা পূর্ব বাংলা উত্তাল। জনগণ তখন থেকেই এটা অনুধাবন করতে পারছিল যে, আরেকটা স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকেই দেশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই শেখ মুজিবুর রহমান সমগ্র বাঙালি জাতির কাছে এক অবিসংবাদী নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ট্রাইব্যুনালের কাছে শেখ মুজিবুর রহমানের বিবৃতি

স্কুল জীবন থেকেই আমি পাকিস্তান অর্জনের জন্য অনেক আন্দোলন করেছি। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্ব থেকেই আমি ভারত ও বাংলার মুসলিম লীগের সক্রিয় সদস্য ছিলাম এবং এমনকি লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার তোয়াক্কা না করেও আমি পাকিস্তান অর্জনের জন্য কাজ করেছি।

স্বাধীনতা অর্জনের পর আমরা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গঠন করি ১৯৪৯ সালে যখন মুসলিম লীগ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়। আওয়ামী লীগ সব সময়ই ছিল একটি সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান।

১৯৫৪ সালে আমি প্রাদেশিক সংসদের একজন সদস্য নির্বাচিত হই এবং পরে জাতীয় সংসদের সদস্যও নির্বাচিত হই। আমি দুই দফা পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী ছিলাম। সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনেও যাবার সুযোগ হয় আমার। জনগণের মঙ্গলের জন্য সাংবিধানিক বিরোধী দল সংগঠিত করার কারণে আমাকে কয়েক বছর জেলেও কাটাতে হয়েছে।

সামরিক শাসন জারী করার পর বর্তমান সরকার আমার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে অত্যাচার শুরু করে। ১৯৫৮ সালের ১২ অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনের ধারায় তারা আমাকে গ্রেফতার করে বিনা বিচারে দেড় বছর জেলে রাখে। আমি জেলে থাকা অবস্থায় তারা আমার বিরুদ্ধে ছয়টি মামলা জারী করে। কিন্তু আমি সবগুলোতে বেকসুর খালাস পেয়ে যাই এবং আমাকে ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

আমাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়ার সময় আমার প্রতি অনেকগুলো বিধি-নিষেধ জারী করা হয়। ঢাকা থেকে কোথাও যাওয়ার পূর্বে কোথায় যাব এবং বিস্তারিত বিবরণ স্পেশাল ব্রাঞ্চকে লিখিতভাবে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ঢাকায় ফেরত আসার পর পুনরায় লিখিতভাবে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে অবহিত করার নির্দেশও দেওয়া হয়। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা সব সময়ই আমাকে ফলো করতো।

পরে ১৯৬২ সালে বর্তমান সংবিধান জারী করার সময়ে যখন আমার নেতা মরহুম সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয় তখনও আমাকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে ছয় মাস জেলে রাখা হয় বিনা বিচারে।

জনাব সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের এই অংশেই রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে পুনর্জীবিত করা হয় এবং সম্মিলিত বিরোধী দলের অংশ হিসেবে আমরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ নিয়ে জেনারেল আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ফাতেমা জিন্নাহকে বিরোধী মোর্চার প্রার্থী হিসেবে সমর্থন জানাই। তখনও এই সরকার আমার বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলা জারী করে আমাকে নানাভাবে হয়রানি করার জন্য।

১৯৬৫ সালে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের মত আমিও ভারতীয় আগ্রাসনের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং আমার দল ও জনগণের প্রতি সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য আহ্বান জানাই। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ তার সব শাখার প্রতি সরকারি যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতি সহায়তা প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়।

এই যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আমিও ভারতীয় আগ্রাসনকে নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেই এবং জনগণকে সম্মিলিতভাবে সরকারি যুদ্ধ প্রচেষ্টার সঙ্গে শরিক হবার আহ্বান জানাই। যুদ্ধের পর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানে আসলে তার আমন্ত্রণে অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আমিও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং পূর্ব পাকিস্তানকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে আবেদন জানাই। বিশেষ করে বর্তমান যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে পূর্ব পাকিস্তানকে প্রতিরক্ষা ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার অনুরোধ জানাই। কারণ এই যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান ও সারা দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা হয়ে পড়েছিল। তাসখন্দ ঘোষণাকেও আমি সমর্থন জানিয়েছিলাম কারণ আমি ও আমার জনগণ বিশ্বাস করি যে সব আন্তর্জাতিক সমস্যারই শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান হওয়া উচিত। কারণ আমরা অগ্রগতির জন্য বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাস করি।

১৯৬৬ সালের শুরুর দিকে লাহোরে সর্বদলীয় একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় যেখানে আমি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের সাংবিধানিক সমাধান হিসেবে কনভেনশনের বিষয় কমিটির কাছে ছয়-দফা কর্মসূচি উপস্থান করি। ছয়-দফা কর্মসূচিতে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের বিধান রাখা হয়েছে।

তখন থেকেই আমার দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয়-দফা গ্রহণ করেছে এবং এর সপক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য জনসভা করা শুরু করেছে যাতে দুই প্রদেশের মধ্যেকার আর্থিক ও অন্যান্য অসাম্য কমিয়ে আনা সম্ভব হয়।

এর ফলে সরকারি প্রশাসন সরকারি দলের নেতারা এবং প্রেসিডেন্ট নিজে আমাকে 'অস্ত্রেরভাষা' 'গৃহযুদ্ধ' প্রভৃতি অপবাদে ভূষিত করে আমাকে নানাভাবে হয়রানি করতে শুরু করে এবং আমার বিরুদ্ধে এক ডজনেরও বেশি মামলা জারী করে। তারা প্রথমে ১৯৬৬ সালের পহেলা এপ্রিল যশোরে গ্রেফতার করে যখন আমি খুলনায় জনসভা করে ঢাকায় ফিরতে ছিলাম। আমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী বক্তৃতা দানের অভিযোগ আনয়ন করা হয়।

আমাকে যশোরে মহকুমা হাকিমের কোর্টে হাজির করা হয় এবং মহকুমা হাকিম আমাকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেন। ঢাকায় এসে ঢাকার সদর মহকুমা হাকিমের কোর্টে জামিন চাইলে তিনি আমাকে জামিন দেন নাই। পরে সেশন জর্জের কোর্টে জামিন পাই। সেদিন রাত ৭টায় বাসায় ফিরলে রাত আটটার সময় সিলেটে রাষ্ট্রবিরোধী বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতারী পরোয়ানা নিয়ে বাসায় আসে। আমাকে গ্রেফতার করে সিলেটে নিয়ে যায় এবং সেখানকার মহকুমা হাকিমের কাছে জামিনের জন্য আবেদন জানানো হলে তিনি জামিন না দিয়ে জেলে পাঠিয়ে দেন। পরের দিন সেশন জর্জ আমাকে জামিন দেন। জেল থেকে বের হবার পর জেল গেটেই আমাকে ময়মনসিংহ-এ জনসভায় রাষ্ট্রবিরোধী বক্তৃতা প্রদানের জন্য সেখান থেকে জারী করা গ্রেফতারী পরোয়ানারা ভিত্তিতে আবার গ্রেফতার করে এবং সে রাতেই বিশেষ প্রহরায় সিলেট থেকে ময়মনসিংহ নিয়ে যায়। ময়মনসিংহ মহকুমা হাকিমের কোর্টে হাজির করা হলে তিনি জামিন দিতে অস্বীকৃতি জানান। তবে পরে জামিন পেয়ে আমি ঢাকায় ফিরে আসি। এতসব গ্রেফতার ও হয়রানিমূলক ঘটনাগুলো সবই ঘটেছিল ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে।

১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সম্ভবত ৮ মে নারায়ণগঞ্জে একটি জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে রাতে আমার ঢাকার বাসায় ফিরে আসি। ঐ রাতে একটার দিকে পুলিশ পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের ৩২ ধারায় আমাকে গ্রেফতার করে। একই সঙ্গে তারা পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোস্তাক আহম্মদ, প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট মুজিবুর রহমান, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব আজিজ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম চৌধুরী এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সচিব জনাব জহুর আহম্মদ চৌধুরীকেও গ্রেফতার করে।

কয়েক দিন পরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও এমএলএ জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, প্রচারণা সম্পাদক এডভোকেট এ মোমেন, সমাজকল্যাণ সচিব জনাব ওবায়দুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব সামসুল হক, ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব

হাফেজ মোহাম্মদ মুসা, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোল্লা জালালউদ্দিন আহম্মদ, প্রাক্তন মন্ত্রী ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, প্রাক্তন এমএলএ জনাব আমজাদ হোসেন, এডভোকেট আমিনউদ্দিন আহম্মদ, পাবনার এডভোকেট জনাব আমজাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মোস্তফা সরওয়ার, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অফিস সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ, এডভোকেট শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের অফিস সেক্রেটারী জনাব সিরাজউদ্দিন আহম্মদ, রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের অফিস সেক্রেটারী জনাব হারুনুর রশিদ, তেজগাঁও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব সাহাবুদ্দিন চৌধুরী, ঢাকা সদর নর্থের সেক্রেটারী জনাব আব্দুল হাকিম, সিটি আওয়ামী লীগের অফিস সেক্রেটারী জনাব সুলতান আহম্মদ, পাবনার এডভোকেট জনাব হাসনাইনসহ আরো অনেক ছাত্র নেতা ও শ্রমিক নেতাদেরকেও পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের ২৩ ধারায় গ্রেফতার করা হয়। আমার দুই ভাগ্নে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ শহীদুল ইসলামকেও গ্রেফতার করে। এ ছাড়া বর্তমান শাসকচক্র পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক ইত্তেফাককে বাতিল ঘোষণা করে। একমাত্র কারণ ছিল ইত্তেফাক কখনও কখনও আমার দলের কর্মসূচি সমর্থন করতো। সরকার কাগজটির ছাপাখানা জব্দ করে এবং সম্পাদক এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক জনাব তোফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়াকে গ্রেফতার করে অনেকদিন আটকে রাখে এবং তার বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলা দায়ের করে। একই সঙ্গে চট্টগ্রাম মুসলিম চেম্বার অব কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি, চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টর প্রাক্তন সহ-সভাপতি এবং নামকরা আওয়ামী লীগারদেরকে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের ধারায় গ্রেফতার করে অন্ধকার কক্ষে আবদ্ধ রাখে। আমাদের সকলের গ্রেফতারের প্রতিবাদ হিসেবে আমার দল ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন এক সাধারণ ধর্মঘট ডাকে। সারা প্রদেশব্যাপী ধর্মঘটের সময় ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে ১১ জন লোক মারা যায় এবং ৮০০ জন কর্মীকে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে নানা রকম মামলা জারী করে।

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জনাব মোনায়েম খান কিছু অফিসার ও অন্যান্যদের কাছে মোটামুটিভাবে স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, যতদিন তিনি (মোনায়েম খান) ক্ষমতায় থাকবেন ততদিন শেখ মুজিবকে জেলেই সময় কাটাতে হবে। বিষয়টা ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করে।

আমার গ্রেফতার হবার পর থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলে স্থাপিত কোর্টে আমার বিরুদ্ধে জারী করা অনেকগুলো মামলার বিচারকার্য চলছিল। প্রায় ২১ মাস বন্দি থাকার পর ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি বেলা একটার দিকে আমাকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হলে জেল গেট থেকে কিছু সামরিক অফিসার আমাকে জোরপূর্বক ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায়। এখানে আমাকে নির্জন স্থানে বন্দি করে রাখা হয় এবং কারো সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় না। আমাকে খবরের কাগজও পড়তে দেওয়া হয় না। প্রকৃতপক্ষে পাঁচ মাস সারা দুনিয়ার সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ ছিল না। এই সময়ে আমার উপর নানাবিধ মানসিক নির্যাতন করা হয় এবং আমাকে সব ধরনের সাধারণ সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। এই অমানবিক মানসিক অত্যাচারের কাহিনি যত কম বলা হয় ততই মঙ্গল।

এই বিচারকার্য শুরু হবার মাত্র একদিন আগে অর্থাৎ ১৯৬৮ সালের ১৮ই জুন এডভোকেট জনাব আব্দুস সালাম খানের সঙ্গে আমার সর্বপ্রথম দেখা হয় এবং আমি তাকে আমার একজন উকিল হিসেবে নিয়োজিত করি। এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় আমাকে অত্যাচার করা এবং আমার দলকে জনগণের কাছে হেয় এবং অপদস্ত করা। আসল উদ্দেশ্য হল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতা আনয়নসহ অন্যান্য ন্যায্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া আদায়ের সংগ্রামে বাধা সৃষ্টি করা এবং স্তিমিত করা।

এই আদালতে আসার পূর্বে আমি কখনও লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, এক্স কর্পোরাল আমির হোসেন, এল এস সুলতানউদ্দিন আহম্মদ, কামালউদ্দিন আহম্মদ, স্টেওয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন মাহবুবউল্লাহ এবং এই মামলায় জড়িত অন্যান্য সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর লোকদের দেখি নাই। জনাব আহম্মদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস এবং খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান–এই তিনজন সিএসপি অফিসারদেরকে আমি চিনি। মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সময়ে আমি এদেরকে চিনতাম। তারা তখন পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন। আমি তাদের সঙ্গে কখনও রাজনীতি নিয়ে আলাপ করিনি এবং তাদের সঙ্গে কোন ষড়যন্ত্রেও জড়িত নই। আমি কখনও করাচীতে লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন অথবা কামালউদ্দিনের বাড়িতে যাই নাই। এই কথিত ষড়যন্ত্র বিষয়ে আমার বাড়িতে অথবা জনাব তাজউদ্দিনের বাড়িতে আমার সঙ্গে কখনও কারো কোন আলোচনা হয় নাই। এই কথিত ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত লোকেরা কেউ কখনও আমার বাড়িতে যায় নাই এবং এদের কাউকে কোন টাকা দেওয়ার প্রশ্নই

আসে না। আমি ডা. সাইদুর রহমান অথবা মানিক চৌধুরীকে এই কথিত ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত হওয়ার জন্য কখনও কিছু বলি নাই। তাদের মত শত শত দলীয় সদস্য চট্টগ্রামে রয়েছে। আমার দলে তিনজন সহ-সভাপতি, ৪৪ জন নির্বাহী কমিটির সদস্য, একজন সাধারণ সম্পাদক এবং ৮ জন সম্পাদক রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অনেক অফিস বেয়ারার সাবেক মন্ত্রী, এমএলএ এবং এমপিএ। বর্তমান জাতীয় সংসদের পাঁচজন সদস্য এবং প্রাদেশিক সংসদের দশজন সদস্য আমার দলের সদস্য। চট্টগ্রামে আমার দলের রয়েছে জেলা সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, শহর কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাবেক এমএলএ, এমপিএ এবং আরো অনেক প্রভাবশালী ও সম্পদশালী ব্যক্তিরা। আমি এদের কারো কাছ থেকেই কোন সাহায্য চাই নাই। তাই এটা খুবই আশ্চর্য্যজনক যে জনাব মানিক চৌধুরী মাত্র একজন সাধারণ ব্যবসায়ী এবং ড. সাইদুর রহমানের মত একজন এলএমএফ ডাক্তারের কাছে কেন সাহায্য চাইবো? বরং ১৯৬৫ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব জহুর আহম্মদ চৌধুরীর বিরোধিতা করার জন্য ড. সাইদুর রহমানকে দল থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। আমি কখনও ড. সাইদুর রহমানের বাড়িতে যাই নাই।

আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। এই দলটি হোল একটি সাংবিধানিক রাজনৈতিক দল যে দলের রয়েছে জনগণের কল্যাণের জন্য সুনির্দ্দিষ্ট এবং গঠনমূলক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সর্মসূচি। আমি ছয়-দফায় সন্নিবেশিত কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের দুই অংশের জন্যই ন্যায় বিচার চেয়েছি। দেশের জন্য যা কিছু মঙ্গল এবং সুফল বয়ে আনবে সেটা আমি সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে সরাসরি বলতে চেয়েছি। তা সত্ত্বেও শাসক চক্র এবং স্বার্থান্বেষী মহল যারা পাকিস্তানের জনগণকে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর তাদের নিষ্পেষণের মাত্রা স্থায়ী করতে চায় তারা আমাকে এবং আমার দলকে তাদের পথের কাঁটা হিসেবে মনে করে।

আমার বিবৃতির সমর্থনে মাননীয় বিচারকমণ্ডলীর কাছে আরো বলতে চাই যে আমার প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা এই মামলার সঙ্গে আমাকে জড়িত করেছে। ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারি পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রদত্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই মামলার আসামী হিসেবে যে ১৮ জনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে তার মধ্যে আমার নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল না। উক্ত বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছিল যে ঐ সমস্ত আসামীরা তাদের অপরাধের কথা স্বীকার করেছে, তদন্ত প্রক্রিয়ার কাজ প্রায় শেষ এবং খুব শীঘ্রই বিচারের জন্য

মামলাটি কোর্টে পেশ করা হবে। একজন সাবেক মন্ত্রী হিসেবে আমার অভিজ্ঞতার আলোকে আমি বলতে চাই যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের ব্যক্তিগত তদন্ত এবং অনুমোদন ছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ঐ ধরনের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার কথা নয়। এছাড়া ঐ ধরনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিজ্ঞাপ্তি প্রদানের পূর্বে প্রেসিডেন্ট অথবা প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নেওয়া প্রয়োজন বলেও আমি মনে করি।

পূর্বে আমি যে নিষ্পেষণ ও অত্যাচার অবিচারের কথা উল্লেখ করেছি, বর্তমান মামলাটিও তারই নমুনা। এছাড়া এই মামলাটিও বর্তমান শাসকগোষ্ঠী এবং স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক তাদের নিষ্পেণের ষড়যন্ত্রের যে জাল তারা বিস্তার করেছে তারই একটি ঘৃণ্য পদক্ষেপ। আমি কখনও ষড়যন্ত্রমূলক কিছুই করি নাই। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর অফিসারদেরকে সংশ্লিষ্ট করে কোন ষড়যন্ত্র করার প্রশ্নই উঠে না।

আমি নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে মনে করি এবং এই কথিত ষড়যন্ত্র বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।

[সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৮।]

১৯৬৯ : দশ লক্ষ লোকের সমাবেশে মুজিবুরকে 'বঙ্গবন্ধু' সম্মাননা

১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি। ছয় দফাসহ এগারো দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সেদিন গড়ে উঠেছিল কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নিজস্ব এগারো দফা দাবির প্রথম দুটি দাবি ছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং বিনাশর্তে শেখ মুজিবুরকে মুক্তি দান। এদিকে ১৪৪ ধারা ও কারফিউ ভঙ্গ, পুলিশ, ই. পি. আর.-এর গুলিবর্ষণ, বহু সাধারণ মানুষের মৃত্যু ইত্যাদির মধ্যদিয়ে যখন সমগ্র পূর্ব বাংলায় গণঅভ্যুত্থানের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, এই অবস্থায় আইয়ুব খান সরকার রাওয়ালপিন্ডিতে গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করেন ১ ফেব্রুয়ারি। সরকার ঘোষণা করে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্যারোলে মুক্তিদান করা হবে।

এদিকে শেখ মুজিবুর রহমান জেলে থেকে প্যারোলে মুক্তিদানকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ পর্যন্ত সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলার জনগণের তীব্র চাপের মুখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে এবং বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য আসামিকে মুক্তিদান করতে বাধ্য হয়। পরের দিন ২৩ ফেব্রুয়ারি ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের স্বাধীনতার সংগ্রামে একটি উজ্জ্বলতম দিন। ঐদিন ঢাকার রেসকোর্স বা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ জনগণের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য সমাবেশের ডাক দেয়। প্রায় দশ লক্ষ মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল ঐ সভায়। ঐ ঐতিহাসিক সভাতেই ঊনসত্তরের ছাত্র আন্দোলনের অগ্রসেনানী তোফায়েল আহমদ হর্ষোৎফুল্ল জনতার সমাবেশ তুমুল করতালির মধ্য দিয়ে বাংলার মুকুটহীন সম্রাট শেখ মুজিবুরকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। সেইদিন থেকেই শেখ মুজিবুর রহমানকে সকলেই বঙ্গবন্ধু নামে ভূষিত করেন। বঙ্গবন্ধুর বয়স তখন সবে মাত্র আটচল্লিশ। বঙ্গবন্ধু এই সংবর্ধনা গ্রহণ করে ঘোষণা দিলেন পূর্বের ছয় দফা দাবিসহ এই এগারো দফা দাবির সমর্থনে বাংলার মাটিতে অবিরাম গতিতে সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

ঠিক এই সময়েই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আইয়ুব খান রাওয়ালপিন্ডিতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্য মুজিবুরকে অনুরোধ করেন। শেষ পর্যন্ত ১০ মার্চ রাওয়ালপিন্ডিতে এই বৈঠকে যোগ দেন বঙ্গবন্ধু। রাওয়ালপিন্ডির ঐ

গোলটেবিল বৈঠকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আইয়ুব খানকে বঙ্গবন্ধু সরাসরি বলেছিলেন যে, আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবি এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগারো দফা দাবি না মানা পর্যন্ত কোনো আলোচনা চলে না। তিনি মোট সতেরো দফা দাবি উত্থাপন করে বলেন যে, 'গণঅসন্তোষ নিরসনে ৬ দফা এবং ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

ঐ বৈঠকে শাসকগোষ্ঠী যখন বঙ্গবন্ধুর দাবিসমূহ অগ্রাহ্য করে তখনই তিনি গোলটেবিল বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং ১৪ মার্চ ফিরে আসেন ঢাকায়। এই বৈঠকের কিছুদিন পরই ২৫ মার্চ পাকিস্তানের সামরিক প্রধান ইয়াহিয়া খান সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান এবং সামরিক শাসনের মাধ্যমে আইয়ুব খানের হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নেন।

প্রধানমন্ত্রী আইয়ুব খানের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকে বঙ্গবন্ধু যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার মূল কথা ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার। তিনি বলেছিলেন জাতি আজ একটি সংকট মোকাবিলা করছে, যা তার ভিতকেই কাঁপিয়ে দিয়েছে। যারা জাতিকে ভালোবাসেন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য কৃত ত্যাগকে স্মরণ করেন, বর্তমান সময় তাদের জন্য গভীর উদ্বেগের। সংকটটি নিরসনের জন্যে এর প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা এবং এর কারণ নির্ণয় করা অবশ্যকর্তব্য। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যদি জনগণের বিভিন্ন অংশ কর্তৃক উত্থাপিত দাবিগুলো সযত্নে পরীক্ষা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, তাদের ভেতর রয়েছে তিনটি মৌলিক বিষয়। যেমন প্রথমত–রাজনৈতিক অধিকার এবং স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হওয়া; দ্বিতীয়ত জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি অর্থনৈতিক অবিচার, তৃতীয়ত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অবিচারের বোধ, যারা দেখতে পাচ্ছে যে, বিদ্যমান শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তারা কার্যকর রাজনৈতিক ক্ষমতা না পাওয়ায় তাদের মৌলিক স্বার্থ ধারাবাহিকভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

১৯৬৯-এর ৫ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'

জেনারেল ইয়াহিয়া খান আইয়ুব খানের কাছ থেকে ক্ষমতা হাতে নিয়ে সারা দেশে সামরিক শাসন জারি করে জাতির প্রতি প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন– ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক কার্যকলাপের অনুমতি দেয়া হবে এবং 'এক মাথা এক ভোটের' ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেছিলেন জাতীয় নির্বাচনের পর নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশের জন্য একটা সংবিধান প্রণয়ন করবেন এবং পাকিস্তানের প্রতিটি প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে ১৯৬৯ সালের ২৫ অক্টোবর থেকে বঙ্গবন্ধু তিন সপ্তাহের জন্য লন্ডন সফর করেন। ঐ বছরেরই ৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন বাংলাদেশ। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন–

"একসময় এ দেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিন্তাটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। একমাত্র বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোনো কিছুর নামের সঙ্গে বাংলা কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ।'

ফলে ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর থেকে বঙ্গবন্ধুর দেয়া এই বাংলাদেশ শব্দটি জনগণের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে যায়। ফলে ভবিষ্যতে যে স্বাধীন রাষ্ট্রটির নাম হবে বাংলাদেশ তা যেমন একশো শতাংশ স্থির হয়ে গিয়েছিল, তেমনি নতুন রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত যে হবে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' তাও স্থির হয়েই ছিল বহু আগে থেকেই। এদিকে উত্তাল তখন বাংলাদেশ। বাংলাদেশের জনগণের হৃদয়ের আকুতি তখন একটাই। চাই একটি স্বাধীন বাংলাদেশ। পশ্চিম পাকিস্তানের দমন-পীড়ন আর নয়। এবার চাই মুক্তি। স্বাধীন বাংলাদেশ। এরই মধ্যে এলো ১৯৭০ সাল। বছরের

একেবারে শুরুতেই অর্থাৎ ৫ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আহূত হয়। সেই অধিবেশন থেকেই বঙ্গবন্ধুকে পুনরায় আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে নির্বাচিত করা হয়। এই অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই ১৯৭০ সালের ১ এপ্রিল আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এবং আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক হবে নৌকা।

১৯৭০ : দেশের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুই ছিলেন প্রচারের প্রধান মুখ

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল সবচাইতে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক। ঐ নির্বাচনে যিনি প্রধান নেতৃত্ব বা কাণ্ডারি ছিলেন, যাঁকে কেন্দ্র করে সমগ্র নির্বাচনী প্রচার বা প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছিল তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যেকোনো সমস্যায় তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল শেষ কথা। আসলে অত্যন্ত জটিল এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুই ছিলেন প্রচারের প্রধান মুখ। ১৯৭০ সালের ৭ জুন রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক সভায় বঙ্গবন্ধু দেশের স্বার্থে, বাঙালি জাতির স্বার্থে আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। ১৯৭০ সালের ১৭ অক্টোবর তারিখে বঙ্গবন্ধু জাতিকে জানিয়েছিলেন নৌকাই হবে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক। ঐ দিন ঢাকার ধোলাইখালে ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রথম নির্বাচনী জনসভা। ঐ জনসভাতেই তিনি জনগণের কাছে আহ্বান জানান নৌকা চিহ্নে আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার জন্য।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারের একটি পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছিল। সেই পোস্টারে বলা হয়েছিল যে, 'পূর্ব বাংলা শ্মশান কেন?' ঐ নির্বাচনে কৃষক এবং শ্রমিক সমাজের প্রতি আওয়ামী লীগের বক্তব্য বা প্রতিশ্রুতি ছিল এই যে, বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করা হবে এবং ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা হবে। ১৯৭০ সালের ৮ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু ছয় দফার বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে বেতার এবং দূরদর্শনে ভাষণ দেন।

ঠিক এই সময়েই নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে বাংলাদেশে ঘটেছিল ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর পূর্ব বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে উপসাগরীয় এলাকায় ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায় দশ লক্ষ মানুষের জীবনহানি ঘটেছিল। বঙ্গবন্ধু এই ঘটনায় নির্বাচনী প্রচার বাতিল করে দুর্গত এলাকায় দ্রুত চলে যান এবং যারা আহত হয়েছেন বা জীবিত রয়েছেন তাদেরকে বাঁচাতে তাদের পাশে দাঁড়ান। প্রাকৃতিক এই বিপর্যয়ে বঙ্গবন্ধু বিশ্ববাসীর কাছে আর্ত মানুষের জন্য সাহায্যের আবেদন করেন।

পূর্ব বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত জেলাগুলো সফর করে এসে বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ সালের ২৬ নভেম্বর ঢাকার শাহবাগ হোটেলে যে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন তাতে দেশ-বিদেশের প্রায় দুশো সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। সেই সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু আড়াই হাজার শব্দ সংবলিত একটি ইংরেজি বিবৃতি সাংবাদিকদের হাতে দিয়ে তাদের সামনে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন। বিবৃতিতে তিনি ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ভয়াবহ বর্ণনা প্রদান করে বললেন যে, পটুয়াখালী, ভোলা ও নোয়াখালীর কোনো কোনো এলাকায় ২০ থেকে ২৫ শতাংশ জনসংখ্যা মাত্র জীবিত রয়েছে। এবং এঁরা বর্তমানে রিলিফ, বাসস্থান ও চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুপথযাত্রী। সময়মতো ত্রাণের ব্যবস্থা করলে হয়তো কিছু মানুষকে অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা যেত।

সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু তাঁর ছয় দফা বর্ণনা করে জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন—

"জনগণকে ক্ষমতা দখল করতে হবে। নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতা নিতে হবে। নির্বাচন যদি বানচাল করা হয় তাহলে জাগ্রত জনতার শক্তিতে ক্ষমতা দখল করতে হবে। বাংলাদেশ এখন জাগ্রত। নির্বাচনের মাধ্যমেই জনতা তার রায় দেবে।"

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে দেশবাসীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর বিনম্র আবেদন

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাইবোনেরা, আস্‌সালামু আলাইকুম।

আমার সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করেন। আগামী ৭ই ডিসেম্বর (১৯৭০) দেশব্যাপী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হয়েছে। জনগণের ত্যাগ ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফল হচ্ছে এই নির্বাচন। সারা দেশ ও দেশের মানুষকে তীব্র সংকট ও দুর্গতি থেকে চিরদিনের মতো মুক্ত করার সুযোগ এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।

দীর্ঘ তেইশ বছরের অবিরাম আন্দোলনের পথ বেয়ে শত শত দেশপ্রেমিকের আত্মদান, শহীদের তাজা রক্ত আর হাজার হাজার ছাত্র-শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীর অশেষ নির্যাতন ভোগ ও ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের জনগণের সামনে আজ এক মহা সুযোগ উপস্থিত। এই নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নির্বাচিত হবার পর পরই পরিষদ সদস্যরা বা রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার গদিতে বসে পড়তে পারবে না। তাঁদেরকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ সমাধা করতে হবে। বস্তুত স্বাধীনতার তেইশ বছরের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল দায়িত্ব এবং অধিকার সর্বপ্রথম এবারই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা লাভ করেছে। তাই এই নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম।

আমার দেশবাসী

আমাদের দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরও যদি কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের প্রতিনিধিগণ দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে পাকিস্তান বিশেষ করে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ চিরতরে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে। কেননা সম্পদ লুণ্ঠনকারী ও একনায়কত্ববাদের প্রতিভূরা দেশের কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের ইচ্ছানুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার কাজে পদে পদে বাধা দেবে। ভোটাধিকারের নির্ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে সেই মহাসুযোগ ও দায়িত্ব যদি আমরা কুচক্রীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি, তাহলে কৃষক-শ্রমিক-সর্বহারা মানুষের দুঃখমোচন এবং বাংলার মুক্তি সনদ ছয়-দফা ও এগার-দফা

বাস্তবায়িত করা যাবে। একমাত্র এই কারণেই আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের প্রতিটি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

কারাগার থেকে বেরিয়ে আমরা জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব অর্থাৎ এক ব্যক্তি এক ভোটের দাবি তুলেছিলাম; আজ সেটা আদায় হয়েছে। তাই ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ যোগ্যতা ও সুযোগের অধিকারী। এখন বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত পরিষদ সদস্যরা যদি একই দলের কর্মসূচি ও আদর্শের সমর্থক হন অর্থাৎ সকল প্রশ্নে তাঁরা ঐক্যমতে থাকতে পারেন তবে আমরা অতীতে চাপিয়ে দেওয়া সকল অবিচার, বৈষম্যমূলক আচরণ, আইন কানুন এবং বে-ইনসাফী শোষণের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারব। আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও সম্মিলিত দাবির মুখে দেশের অপর অংশের পরিষদ সদস্যগণ বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি সনদ ছয়-দফা ও এগার-দফা মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন। এর কারণ, পরিষদে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকব। আর যদি আমরা বিভক্ত হয়ে যাই এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও মতাদর্শের অনৈক্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আত্মঘাতী সংঘাতে মেতে উঠি তাহলে যারা এদেশের মানুষের ভালো চান না ও এখানকার সম্পদের উপর ভাগ বসাতে চান তাদেরই সুবিধে হবে এবং বাংলাদেশের নির্যাতিত, নিপীড়িত, ভাগ্যা হত ও দুঃখী মানুষের মুক্তির দিনটি পিছিয়ে যাবে।

আমার ভাইবোনেরা

শের-এ-বাংলা আজ পরলোকে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আমাদের মাঝে নেই। যাঁরা প্রবীণতার দাবি করছেন তাঁদের অধিকাংশই হয় ইতোমধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের এক শ্রেণির বাঙালি বিদ্বেষীদের নিকট নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে তল্পীবাহকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, নয়ত নিষ্কর্মা, নির্জীব হয়ে পড়েছেন এবং অন্যের সলা-পরামর্শে বশীভূত হয়ে কথায় ও কাজে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। আমি নিশ্চিত বুঝতে পারছি, ভাগ্য-বিপর্যস্ত মানুষের হয়ে আমাদেরই কথা বলতে হবে। তাদের চাওয়া ও পাওয়ার সার্থক রূপদানের দায়িত্ব আওয়ামী লীগকেই গ্রহণ করতে হবে এবং সে কঠিন দায়িত্ব গ্রহণে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তার উপযোগী করেই আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগকে গড়ে তোলা হয়েছে। নিজেদের প্রাণ দিয়েও যদি এদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবনকে কণ্টকমুক্ত করতে পারি, আগামী দিনগুলোকে

সকলের জন্য সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে পারি এবং দেশবাসীর জন্যে যে কল্পনার নকশা এতদিন ধরে মনের পটে এঁকেছিলাম, সে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের পথ প্রশস্ত করে দুঃখের বোঝা যদি কিছুটাও লাঘব করে যেতে পারি, তাহলে আমাদের সংগ্রাম সার্থক হবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী

আমি ক্ষমতার প্রত্যাশী নই। কারণ, ক্ষমতার চেয়ে জনতার দাবি আদায়ের সংগ্রাম অনেক বড়। এখন নির্বাচনের মাধ্যমে বক্তব্য পেশ ও দাবি আদায়ের দায়িত্ব যদি আমাদের উপর ন্যস্ত করতে চান তাহলে আমাদের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সে শক্তি হল পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ। কারণ, এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হচ্ছে অধিকার আদায়ের চাবিকাঠি। তাই আমার জীবনের সুদীর্ঘ সংগ্রামের এই ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে আমার একটি মাত্র আবেদন—বাংলাদেশের সকল আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীদের 'নৌকা' মার্কায় ভোট দিন।

সংগ্রামী প্রিয় দেশবাসী

সবশেষে, আমি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আপনাদের কাছে কয়েকটি কথা পেশ করতে চাই। আপনারা জানেন, ১৯৬৫ সালে ১৭ দিনের যুদ্ধের সময় আমরা বাঙালিরা কিরূপ বিচ্ছিন্ন, অসহায় ও নিরুপায় হয়ে পড়েছিলাম। বিশ্বের সাথে এবং দেশের কেন্দ্রের সঙ্গে প্রায় আমাদের সকল যোগাযোগ ও সম্পর্ক ভেঙে পড়েছিল। অবরুদ্ধ দ্বীপের ন্যায় বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ কেবল আল্লাহর উপর ভরসা রেখে এক সীমাহীন অনিশ্চয়তার মুখে দিন কাটাচ্ছিল। তথাকথিত শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রশাসনযন্ত্র বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সেদিনের সেই জরুরি প্রয়োজনের দিনেও আমাদের নাগালের বাইরে ছিল। তাই আমার নিজের জন্যে নয়, বাংলার মানুষের দুঃখের অবসানের জন্যে ১৯৬৬ সালে আমি ছয়-দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম। এই দাবি হচ্ছে আমাদের স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের দাবি; অঞ্চলে অঞ্চলে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তার অবসানের দাবি। এই দাবি তুলতে গিয়ে আমি নির্যাতিত হয়েছি। আমার ছেলে-মেয়ে, বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও আপনাদের কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে কারাগারে আটক করে রাখা হয়েছিল। আমার সহকর্মীদেরও একই অন্যায়-অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে। সেই দুর্দিনে পরম করুণাময় আল্লাহর আশীর্বাদস্বরূপ আপনারাই কেবল আমার সাথে ছিলেন। কোন নেতা নয়, কোন দলপতি নয়, আপনারা—

বাংলার বিপ্লবী ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, সর্বহারা মানুষ রাতের অন্ধকারে কারফিউ ভেঙে মনু মিয়া, আসাদ, মতিউর, রুস্তম, জহুর, জোহা, আনোয়ারার মতো বাংলাদেশের দামাল ছেলে-মেয়েরা প্রাণ দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলে আমাকে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কবল থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন। সেদিনের কথা আমি ভুলে যাই নি, জীবনে কোনদিন ভুলব না, ভুলতে পারব না। জীবনে আমি যদি একলাও হয়ে যাই, মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মতো আবার যদি মৃত্যুর পরোয়ানা আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলেও আমি শহীদের পবিত্র রক্তের সাথে বেঈমানী করব না। আপনারা যে ভালোবাসা আমার প্রতি আজও অক্ষুণ্ন রেখেছেন, জীবনে যদি কোনদিন প্রয়োজন হয় তবে আমার রক্ত দিয়ে হলেও আপনাদের এ ভালোবাসার ঋণ পরিশোধ করব।

প্রিয় ভাইবোনেরা

বাংলার যে জননী শিশুকে দুধ দিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে তেজগাঁর নাখালপাড়ায় মারা গেল, বাংলার যে শিক্ষক অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ঢলে পড়ল, বাংলার যে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে জীবন দিল, বাংলার যে ছাত্র স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে রাজপথে রাইফেলের সামনে বুক পেতে দিল, বাংলার যে সৈনিক কুর্মিটোলার বন্দি শিবিরে অসহায় অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হলো, বাংলার যে কৃষক ধান খেতের আলের পাশে প্রাণ হারাল—তাঁদের বিদেহী অমর আত্মা বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে ঘরে-ঘরে ঘুরে ফিরছে এবং অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার দাবি করছে। রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে যে আন্দোলন তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, সে আন্দোলন ছয়-দফা ও এগার-দফার। আমি তাঁদেরই ভাই। আমি জানি, ছয়-দফা ও এগার-দফা বাস্তবায়নের পরই তাদের বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে। কাজেই আপনারা আওয়ামী লীগের প্রতিটি প্রার্থীকে 'নৌকা' মার্কায় ভোট দিয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি আসনে জয়যুক্ত করে আনুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে জালেমদের ক্ষুরধার নখদন্ত জননী বঙ্গভূমির বক্ষ বিদীর্ণ করে তার হাজারো সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা জয়যুক্ত হবো।

শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। ন্যায় ও সত্যের সংগ্রামে নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন।

[সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক, ২ ডিসেম্বর, ১৯৭০]

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নজিরবিহীন সাফল্য

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নজিরবিহীন সাফল্য অর্জন করে। ৩১০ জন সদস্যবিশিষ্ট পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের ২৭৯টি আসনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৬৮টি আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগ যে ১১টি আসন হারায় তার মধ্যে পিডিপি পায় ২টি, আওয়ামী ন্যাপ, জামাত ও নেজামে ইসলাম ১টি করে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৬টি আসন লাভ করে। ঘূর্ণিঝড়বিধ্বস্ত অঞ্চলে প্রাদেশিক পরিষদের ১৮টি এবং জাতীয় পরিষদের ৯টি আসনের স্থগিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৭ জানুয়ারি ১৯৭১। এই আসনগুলোতে মুসলিম লীগের কোনো প্রার্থী জয়লাভ করতে পারেনি।

নির্বাচনে এই বিপুল জয় লাভে আপ্লুত বঙ্গবন্ধু ১৯ ডিসেম্বর একটি বিবৃতি দিয়ে বললেন—জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নজীরবিহীন বিজয়ে আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ এবং আমার প্রিয় দেশবাসী—ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকদের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে পড়েছি। আমাদের ৬ দফা কর্মসূচির পক্ষে এক ঐতিহাসিক রায় প্রদানের জন্য আমি জনসাধারণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা এই রায় বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। ৬ দফা কর্মসূচিভিত্তিক ছাড়া কোন শাসনতন্ত্র হতে পারে না।

আমি চাল, খাওয়ার তৈল ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির ক্রমবর্ধমান মূল্যের ব্যাপারটি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি। মনে হচ্ছে, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের নিকট শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর বিঘ্নিত করার জন্যে কায়েমী স্বার্থবাদীদের এটা কোন চেষ্টারই একটি অংশ। তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই যে, ঐ ধরনের অপরাধমূলক কাজের জন্য যারা দায়ী জনসাধারণ তাদেরকে ক্ষমা করবে না। যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই ধরনের শোষণ চলে অবশ্যই এমন একটি ব্যবস্থার দ্বারা উহার অবসান ঘটাতে হবে, যা আমাদের মেহনতী জনগণের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম।

বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক শস্যহানির দরুন আমরা যে দুর্ভিক্ষের হুমকির সম্মুখীন, উহাতে পর্যাপ্ত খাদ শস্য ও মওজুত ও বিতরণের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, উহা জনগণকে জানানোর জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি আহ্বান জানাচ্ছি, বাংলাদেশের ঘূর্ণি-উপদ্রুত এলাকার রক্ষাপ্রাপ্ত মানুষের রিলিফের জন্য যে বৈদেশিক মুদ্রা ও অন্যান্য সাহায্য এসেছে, এর সমুদয় প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করা উচিত। রিলিফ হিসেবে প্রাপ্ত এই ধরনের অর্থের বোনাস রেটের সুবিধা দেওয়া উচিত। প্রাপ্ত সমুদয় বৈদেশিক মুদ্রা অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের ঘূর্ণি-উপদ্রুত এলাকাসমূহে ব্যয় করতে হবে। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের আমলাদের দ্বারা রিলিফ কাজে সৃষ্ট বিঘ্নসমূহ বৈদেশিক মুদ্রা ও অন্যান্য সম্পদ এবং এ যাবৎ উহার কি পরিমাণ ব্যবহার হয়েছে সে ব্যাপারে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হোক। এ ব্যাপারে যে মারাত্মক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে, উহা দূর করার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদানের জন্য আমি প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। প্রেসিডেন্ট রাজনৈতিক তৎপরতা সংক্রান্ত অপরাধে দণ্ডিতদের ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন। আমরা এর প্রশংসা করি। আমরা সবসময় এই ধরনের ক্ষমা প্রদর্শন এবং রাজনৈতিক তৎপরতা সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলায় দণ্ডিতসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবি জানিয়ে আসছি। আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, এই ক্ষমা পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হোক এবং রাজনৈতিক তৎপরতা সংক্রান্ত অপরাধের ব্যাপারে কারাগারে আটক ছাত্র ও শ্রমিকসহ সকল রাজবন্দীর অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হোক। রাজনৈতিক তৎপরতা সংক্রান্ত সকল মামলা এবং বিনা বিচারে আটক সকল রাজবন্দিরও মুক্তি দেওয়া উচিত।

অন্যান্য মারাত্মক সমস্যাবলীর মধ্যে ক্ষুধা, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা ও বন্যা আমাদের সামনে রয়েছে। যাতে আমরা একটি উন্নততর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারি, তজ্জন্য আমরা আমাদের জনগণের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে সম্ভব সবকিছু করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

[সূত্র : সংবাদ, ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭০]

১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি বিশ লক্ষ মানুষের সামনে শপথবাক্য পাঠ করান বঙ্গবন্ধু

১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি। শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র বিশ্বের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য দিন। ঐদিন জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদে নবনির্বাচিত আওয়ামী লীগ সদস্যবৃন্দ সরকারিভাবে আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করার আগে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে সমবেত প্রায় বিশ লক্ষ জনতার সামনে আগে শপথ বাক্য পাঠ করেন। নজিরবিহীন এই শপথ বাক্য পাঠ অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়েছিল একটি বিশাল মঞ্চে। মঞ্চটি ছিল ১২ ফুট উঁচু এবং ১২০ ফুট দীর্ঘ। মঞ্চের আকৃতিটি ছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক একটি নৌকার মতো। সভার শুরুতেই বঙ্গবন্ধু ৬ দফা এবং ১১ দফার প্রতীক হিসেবে ৬টি এবং ১১টি কবুতর আকাশে উড়িয়ে দেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শপথ বাক্য পাঠ করার মূল কথাই ছিল ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করা এবং জনগণের প্রতি আনুগত্য থাকা। এই সভায় বঙ্গবন্ধু জনগণের সামনে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ—

শুরু করার আগে আমি ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬-এর ৭ জুনের আন্দোলন এবং ১৯৬৮-৬৯ গণ-অভ্যুত্থানের সকল শহীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আমি আমার সব এমএলএ এবং এমপিএ-সহ প্রতিজ্ঞা করছি, এইসব শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না। গত ৭ জুনের পর আপনাদের সামনে রেসকোর্স ময়দানে এই প্রথম উপস্থিত হয়েছি। নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে এবং বাংলাদেশের জনগণ এই নির্বাচনে জয়ের মাধ্যমে তাদের সংগ্রামের প্রথম পর্যায় অতিক্রম করেছে।

আমরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। শুধু বাংলারই নই। আমরা সারা পাকিস্তানেরই 'মেজরিটি'। আমরা যে শাসনতন্ত্র রচনা করব, সেটাই জনগণ গ্রহণ করবে এবং তা বানচালের অধিকার কারো নেই। মরহুম নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেছেন, শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে জনগণের রায়ই শেষ কথা। আর সে রায় আমরা পেয়েছি। যদি কেউ এ রায়ের বিরোধিতা করে তবে রক্তক্ষয় হবে এবং যে অভ্যুত্থান ঘটবে তা কেউ রোধ করতে পারবে না।

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ৬ দফার ভিত্তিতে প্রণীত হবে এবং তাতে ১১ দফার প্রতিফলন থাকবে—কেউ তা রোধ করতে পারবে না। ৬ দফা ও ১১ দফা এখন আর আওয়ামী লীগের সম্পত্তি নয়, বাংলার জনগণ গত নির্বাচনে

৬ দফার পক্ষে রায় দিয়েছেন। ৬ দফা পরিবর্তন আর পরিবর্ধনের কোন ক্ষমতা বা অধিকার এখন আর আওয়ামী লীগ বা আমার নেই।

কিন্তু সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের সহযোগিতা নেব না এ ধরনের কথা আমরা বলি না। আমরা অবশ্যই তাদের সহযোগিতা কামনা করি। কিন্তু একটি কথা আমি পরিষ্কার ভাষায় বলে দিতে চাই— নীতির প্রশ্নে কোন আপোষ নাই।

আমরা দেশের একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবো, কারণ আমরা এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধি। এই প্রক্রিয়ায় যারা বাধা সৃষ্টি করবে তাদেরকে নির্মূল করা হবে। অতীতে আমাদেরকে হিন্দুদের এজেন্ট আখ্যা দেয়া হয়েছিল এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা দেওয়া হয়। কারণ আমরা বাঙালি। এদেশের প্রতি আমাদের আনুগত্যের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা হয়। আমরা অনেক অন্যায় সহ্য করেছি। অন্যায়ের প্রতিকার কিভাবে হয় তা আমরা জানি। তাই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানির প্রতি ন্যায় বিচার করব। যদিও আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা করাচিকে পাকিস্তানের রাজধানী করতে দিয়েছি। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্যে প্রথম জাতীয় পরিষদের ৬টি আসন ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু প্রতিদানে আমরা কি পেলাম? অবিচার।

কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে তোমরা ৮৫ জন, আমরা ১৫ জন। সামরিক বিভাগে তোমরা ৯০ জন, আমাদের দিয়েছো ১০ জন। বৈদেশিক সাহায্যের তোমরা খরচ করছো ৮০ ভাগ, আমাদের দিয়েছো ২০ ভাগ। মহাপ্রলয়ে দক্ষিণ বাংলার ১০ লাখ লোক মারা গেল। লাখ লাখ লোক অসহায় অবস্থায় রাইলো। রিফিল কাজের জন্যে বিদেশ থেকে হেলিকপ্টার এসে কাজ করে গেলো–অথচ ঢাকায় একখানা মাত্র সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আর কোন হেলিকপ্টার আসলো না। আমরা এসব বঞ্চনার অবসান করব।

বাংলার গরিব আর পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের গরিবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আমাদের সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে নয়, বরং যেসব শোষকদের কারণে বাংলার মানুষ গৃহহারা হয়েছে, বাস্তহারা হয়েছে, সর্বস্বান্ত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। এসব শোষকের সাথে কোনো আপোষ নাই।

আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করা হলে দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গ্রহণ করা হবে। ধনীকে আরও ধনী এবং গরিবকে আরও গরিব হতে দেওয়া হবে না।

আমি পুনর্ব্যক্ত করছি, যে যাই বলুক না কেন, ব্যাঙ্ক, বীমা ও পাট ব্যবসা জাতীয়করণ করা হবে। শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং কল-কারখানার শেয়ার শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। ২৩ বছর দেশের গরিব জনগণকে কায়েমী স্বার্থান্বেষী

মহল শোষণ করেছে। আওয়ামী লীগ এই শোষণের শেষ দেখতে চায়। শুধুমাত্র কয়েক মাস সময় আছে, লুটপাট যা করার করে নেন। এরপর আর সময় পাবেন না।

আমার দল ক্ষমতায় যাওয়ার সাথে সাথেই ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেওয়া হবে। আর দশ বছর পর বাংলাদেশের কাউকেই জমির খাজনা দিতে হবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলায়ও এই একই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। আইয়ুবী আমলে বাস্তুহারা হয়েছে বাংলার মানুষ। সরকারের খাস জমিগুলো বণ্টন করা হয়েছে ভুঁড়িওয়ালাদের কাছে। তদন্ত করে এদের কাছ থেকে খাস জমি কেড়ে নিয়ে তা বণ্টন করা হবে বাস্তুহারাদের মধ্যে। ভবিষ্যতেও সকল খাস জমি বাস্তুহারাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। আমি কৃষক এবং শ্রমিকদের কথা দিচ্ছি, আওয়ামী লীগ তাদের আদর্শের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কারণ আমি বিশ্বাস করি আওয়ামী লীগের মাথা কেনার মতো ক্ষমতা পুঁজিপতিদের নেই। এরা কেউ এমনকি আমি নিজেও যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি তাহলে আমাদের জীবন্ত কবর দেবেন।

এ বছর দেশে সতের লক্ষ টন খাদ্য শস্যের ঘাটতি ছিল। আমরা আর খাদ্য আমদানীর উপর নির্ভরশীল হতে পারি না। সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে শীতকালীন শস্য চাষের ব্যবস্থা করতে হবে।

গত ২০ বছর ধরে শুনে এসেছি টাকা নেই, টাকা নেই। এবার আমি দেখিয়ে দেব বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য টাকা পাওয়া যায় কিনা।

পূর্ব পাকিস্তানের উপকূল এলাকার মানুষদের ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক বানের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে '৬২ সাল থেকে শুধু পরিকল্পনার কথাই শুনে আসছি। সাম্প্রতিক মহাপ্লাবনে যেসব এলাকায় বাঁধ ছিল সেখানে ক্ষতি কম হয়েছে। আর বাঁধহীন এলাকাগুলোয় জনমানবের চিহ্ন নাই বললেই চলে। মনপুরা দ্বীপ যা বাঁধের আওতা নাই সেখানে ২৬ হাজার জনসাধারণের মধ্যে মাত্র ৬ হাজার লোক এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছে। ৬২ সাল থেকে সাইক্লোনের হাত থেকে এদের বাঁচানোর জন্যে যে টাকা এসেছে তার হিসাব দিতে হবে এবং অবিলম্বে উপদ্রুত এলাকায় দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যাপক কর্মসূচী নিতে হবে।

জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আমরাই চতুর্থ পাঁচশালা পরিকল্পনা করব। বর্তমান সরকারের কোন অধিকার নাই এটা তৈরি করার। আপনাদের চতুর্থ পাঁচশালা পরিকল্পনা বাক্স বন্ধ করে রাখুন। চতুর্থ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগে ৩য় পাঁচশালা পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্য ১১০০ কোটি টাকা ব্যয় হতে হবে। বাংলাদেশের স্বল্প আয়ের কর্মচারী, ছাত্র এবং শিক্ষকদের প্রয়োজন অনুসারে চতুর্থ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিবেশী ভারত, চীন, রাশিয়া, ইরান, আফগানিস্তান, তুরস্ক, সিংহল ও বার্মাসহ সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে, কারো সাথে শত্রুতা নয়। কোন বিরোধ দেখা দিলে শান্তিপূর্ণভাবে তার সমাধান করা হবে। আমরা কাশ্মীর এবং ফারাক্কা সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করতে চাই। অধিকৃত আরব এলাকা পুনরুদ্ধারের জন্যে পাকিস্তানী জনগণ সবসময়ই আরবদের সাহায্য করে যাবে।

আমি বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি অস্ত্র প্রতিযোগিতা হ্রাস করে সে অর্থ দিয়ে দরিদ্র দেশের সাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। বর্তমানে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ব্যয় করা বিপুল অর্থের এক-দশমাংশও যদি জনগণের জন্যে খরচ করা হয় তবে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য মুছে যাবে এবং তাতে বৃহৎ শক্তিবর্গের মর্যাদাই বৃদ্ধি পাবে। অস্ত্রের মাধ্যমেই অপরকে জয় করা যেতে পারে।

আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে ধন্যবাদ দেব এজন্যে যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে তিনি ওয়াদা রক্ষা করেছেন। তবে তাঁর কর্মচারীদের একাংশ আজও নির্বাচনের ফলাফল বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এরা সম্প্রতি ঢাকায় একটি গোপন সভায় মিলিত হয়েছে। নির্বাচন ফলাফল বানচালের ষড়যন্ত্র থেকে এসব কর্মচারীকে বিরত রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আইয়ুব আমলের একযুগে পদস্থ সরকারি কর্মচারীদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি এদের হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, জনগণের কর্তা হওয়ার আশা ত্যাগ করুন, জনতার সারিতে নেমে জনগণের খাদেম হোন। না হয় ইয়াহিয়া সাহেব তো ৩০৩ করেছেন, আমরা শুধু জনতাকে বলে দেব—'ভালো লোক নয়, বের করো বাড়ি থেকে'। আমি সবার হাতে লাঠি দেখতে চাই। সবাই লাঠি তৈরি রাখুন। আমি হুকুম করলেই লাঠি ব্যবহার করে তাদের শায়েস্তা করবেন। প্রয়োজন হলে এদের কামান-বন্দুককেও লাঠি হাতে বাংলার মানুষ রুখবে।

ষড়যন্ত্র এখনো শেষ হয়নি। নির্বাচন শেষ না হতেই খুন করা হয়েছে আমার এক সহকর্মীকে। যে যুবক বাংলার জন্যে ত্যাগ স্বীকার করেছিল, জেল খেটেছিল সেই আহমদ রফিককে আমি মনোনয়ন দিয়েছিলাম প্রাদেশিক পরিষদে। তাঁকে চোরের মতো তার বাড়ির সামনে ১৩টি ঘায়ে হত্যা করা হয়েছে। তাদের মনে রাখা উচিত, চুরি করে বিপ্লব করা যায় না। খুলনায় আমার ছোট ভাই সংগ্রামী কর্মী মমতাজকে ডেকে নিয়ে খুন করা হয়েছে। যেকোন ষড়যন্ত্র বাঙালিরা প্রতিহত করবে। প্রয়োজন হলে বাঁশের আর সুন্দরীর লাঠি নিয়ে এসব সন্ত্রাসবাদী তৎপরতাকে নস্যাৎ করে দেবে। অবশ্য আমার নির্দেশের আগে কিছু করতে যাবেন না। আপনারা এমন কিছু করবেন

না যাতে শান্তি বিঘ্নিত হয়। বর্তমানে শান্তি রক্ষা করাই গুরুত্বপূর্ণ, আর তাই আমরা আমাদের কর্মী হত্যাও সহ্য করে আছি।

নির্বাচনের পরদিন থেকেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়তে শুরু করেছে। এটাও একধরনের ষড়যন্ত্র। কারা এসব করছে? তারা কি সেইসব ভুঁড়ি-মোটা পুঁজিপতি নয়, যারা এখনই দাম বাড়িয়ে পরস্থিতি ঘোলাটে করে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জনতাকে ক্ষেপিয়ে দেওয়ার শেষ চেষ্টা করছে? তারা এখনো লোভের মধ্যে রয়েছে, আমি তাদের হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, অনেক খেয়েছেন এবার মুখ বন্ধ করুন, নচেৎ জিহ্বা কাটা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এসব পুঁজিপতিরাই যে নির্বাচনের সময় ইসলাম রক্ষার নামে, সংহতির নামে আওয়ামী লীগকে কোন না কোন উপায়ে পরাস্ত করার জন্যে পূর্ব বাংলায় টাকা ঢেলেছেন–তা আমাদের জানা আছে। এক শ্রেণীর লোক নির্বাচনের সময় 'ইসলাম গেল, ইসলাম গেল', বলে চিৎকার করেছেন। নির্বাচনে জয়ের ফন্দি খুঁজেছেন পিডিপি করে, ইসলাম ফ্রন্ট করে, আরো কত কিছু করে। অথচ নির্বাচনের পর কি কেউ নামাজ পড়তে নিষেধ করেছে? রোজা রাখতে নিষেধ করেছে? যদি না করে থাকে তাহলে এসব অপপ্রচারের জন্যে কি তাদের 'কোড়া' মারা উচিত নয়?

এদেশে ইসলাম, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ খ্রিস্টান–সবই থাকবে এবং বাংলাদেশও থাকবে। হিন্দু ও বৌদ্ধদের ওপর গত এক দশকে যে অত্যাচার হয়েছে তারও অবসান হবে। মহিলাদের সমান অধিকার প্রদান করা হবে এবং তারা আর দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক থাকবেন না। ২৩ বছর পর এদেশে কোনো মোহাজের নেই। সবাই এখন বাঙালি। মোহাজেরদের আমি বাংলার মাটির সাথে মিলে যাওয়ার আহ্বান জানাই। এখনো যেসব মোহাজের পুনর্বাসিত হননি, তাঁদের সবার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

যেসব রাজবন্দি বিনা বিচারে এবং যেসব রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতা ও কর্মী বিভিন্ন মেয়াদী কারাগারে রয়েছেন, অবিলম্বে তাদের ছেড়ে দিন এবং রাজনৈতিক ও ছাত্রকর্মী যে নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা ও গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে সেসব প্রত্যাহার করুন। নতুবা আমরা কয়েক মাস পরেই ক্ষমতায় যাচ্ছি, তখন সব কিছু করব।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কোনো ইচ্ছা আমার নাই। প্রধানমন্ত্রী আসে এবং যায়। কিন্তু যে ভালোবাসা ও সম্মান দেশবাসী আমাকে দিয়েছেন, তা আমি সারাজীবন মনে রাখব। অত্যাচার, নিপীড়ন এবং কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠকেও আমি ভয় করি না। কিন্তু জনগণের ভালোবাসা আমাকে দুর্বল করে ফেলেছে।

[সূত্র : পূর্বদেশ, ৪ জানুয়ারি ১৯৭১]

১৯৭১-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি : বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিলেন ওয়াদার সাথে বেইমানি করতে পারি না

১৯৭১ সালের ৫ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে একটি বিশেষ দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। কারণ ঐ দিনেই তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের পিপল্‌স পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনে তাঁর সম্মতির কথা ঘোষণা করেন। এদিকে জাতীয় পরিষদ সদস্যদের এক বৈঠকে বঙ্গবন্ধু পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন। ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক হবে। কিন্তু ১৫ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক বয়কটের ঘোষণা দিয়ে দুই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের প্রতি ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি জানান। পরের দিন ১৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে জনাব ভুট্টোর দাবির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ভুট্টো সাহেবের দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ক্ষমতা একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছেই হস্তান্তর করতে হবে। ক্ষমতার মালিক এখন পূর্ব বাংলার জনগণ।

১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আওয়ামী লীগের দলীয় নবনির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের দু'দিনব্যাপী একটি যৌথ অধিবেশন উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু। নির্বাচনের পর এটাই ছিল এমএলএ এবং এমপিদের প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক। এই বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন—

"৩রা জানুয়ারি রেসকোর্সের গণসমাবেশে আমি আওয়ামী লীগের নীতি ও লক্ষ্য স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছি। আমি সেদিনও বলেছি, আজও বলছি, গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত আমরা নিরলসভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

আমরা জাতির সাথে ওয়াদাবদ্ধ আছি ৬ দফার শাসনতন্ত্র তৈরি করার জন্য। কোনো পরিস্থিতিতেই আমরা আমাদের ওয়াদার সাথে বেইমানি করতে পারি না। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ৬ দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হলে দেশের সব অঞ্চলের সাধারণ মানুষের উপকার হবে। যদি এই কর্মসূচী পুরোপুরি গ্রহণ করা হয় তাহলেই আমরা একসাথে ভাই ভায়ের মতো বাস করতে পারি।

কেউ ষড়যন্ত্র বা গণরায় বানচাল করার চেষ্টা করলে আমরা প্রস্তুত আছি। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। তাই আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চাই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, বুকের উপর মেশিনগান ধরে যে কোনো শাসনতন্ত্র পাশ করতে বললেই আমরা তা মেনে নেব। কেউ যদি মনে করে থাকেন তিনি আমাদের অন্য কিছু গ্রহণ করাতে পারবেন, তবে তিনি ভুল করছেন।

আমার দল কোনোদিন পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে কথা বলেনি। বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ৬ দফা কর্মসূচী বাংলাদেশের সাথে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের জন্যে সমানভাবে প্রযোজ্য। শুধু বাংলার জন্যে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের এই চারটি প্রদেশের জন্যেও আমরা ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন চাই। সেখানকার নির্যাতিত, শোষিত জনতার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আমরা তাদের সাথে আছি।"

[সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১]

১৯৭১-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমিতে বললেন সর্বত্র চালু হবে বাংলা

১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি আয়োজিত ভাষা আন্দোলনের স্মরণ সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন একাডেমির সভাপতি সৈয়দ মুর্তুজা আলী। স্বাগত ভাষণ দেন একাডেমির পরিচালক কবীর চৌধুরী। এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন—

"রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি নয়, মূলতঃ শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ। এইদিনই বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে করাচিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। একমাত্র কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্তই উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিবাদ করেন এবং উর্দুর সাথে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। কোনো বাঙালি মুসলমান প্রতিবাদ করেন নাই। এটা লজ্জাজনক ইতিহাস।

১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুধুমাত্র ভাষার আন্দোলন ছিল না; বাঙালির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন এর সাথে জড়িত ছিল।

ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমি ঘোষণা করছি, আমার দল ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকেই সকল সরকারি অফিস-আদালত ও জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা চালু করবে। এ ব্যাপারে আমরা পরিভাষা সৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা করব না। কারণ তাহলে সর্বক্ষেত্রে কোনদিনই বাংলা চালু করা সম্ভবপর হবে না। এ অবস্থায় হয়তো কিছু কিছু ভুল হবে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। এভাবেই অগ্রসর হতে হবে।

স্বাধীনতার পর আমাদের সাথে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে আচরণ করা হয়েছে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দালাল বলা হয়েছে। এমন কি ভাষা আন্দোলনকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমদানি করা হয়েছে বলা হতো। বাঙালি হিসাবে আমরা অনেক উদারতার পরিচয় দিয়েছি। তা না হলে আমরা বাংলাকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানাতে পারতাম। কিন্তু সেদিন আমরা উর্দুর সাথে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়েছিলাম।

বাঙালির স্বাজাত্যবোধকে টুঁটি চেপে হত্যার জন্যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বারবার এই অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ভাষার উপর আঘাত হেনেছে, আর তাকে প্রাণ দিয়ে প্রতিহত করেছে এদেশের তরুণরা। কিন্তু তাদের মধ্যে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ক'জন আছেন? বিবেকের কাছেই তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে। আপনাদের লেখনী দিয়ে বের হয়ে আসা উচিত ছিল এদেশের গণমানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা। স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সন্তান সূর্য সেনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রচেষ্টাই করা হয় নাই। তাঁর কথা বলতে আপনারা ভয় পান। কারণ তিনি ছিলেন হিন্দু। এঁদের ইতিহাস লেখা এবং পাঠ করার জন্যে দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানাই। একদিন বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলা যেত না। কিন্তু আজ এই জাতীয়তাবাদ সত্য। একে রোধ করতে পারে এমন কোনো ক্ষমতা নাই। এই প্রথমবারের মতো বাঙালি জাতি একতাবদ্ধ হয়েছে। নিজেদের দাবিতে বাঙালিরা আজ ঐক্যবদ্ধ।

ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল এই বাংলা একাডেমি। ১৯৫২ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এই ভবনে বসেই ভাষা আন্দোলনকারীদের উপর গুলির আদেশ দিয়েছিলেন। তাই যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালে ক্ষমতায় এসে এখানে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে। এই বাংলা একাডেমিকে কেন্দ্র করে স্বৈরাচারী সরকার কত খেলাই না খেলেছে, তা এদেশের মানুষের জানা আছে। বাংলা একাডেমির মতো একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে মাত্র ৩ লক্ষ টাকা সরকার বার্ষিক বরাদ্দ করেছে। এর জন্যে কাকে দোষ দেব! যারা এসব করছে, সে আমলারা তো এদেশেরই ছেলে। বাংলা একাডেমির ভেতরের সব কথাই আমি জানি। লোক বদল করে নতুন নতুন লোক এনে বাংলা ভাষাকে ইসলামীকরণের যে চেষ্টা চালানো হয়েছে তাও জানি।

স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনে ফেব্রুয়ারির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলা একাডেমি যে সপ্তাহ পালন করছে সে সপ্তাহ বাংলাদেশের জীবনে এক কঠিন সপ্তাহ। ফেব্রুয়ারির এই দিনেই বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছেন ভাষা আন্দোলনে শহীদেরা, এই সপ্তাহেই শহীদ হয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহা, আর এই সপ্তাহেই কারফিউর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে আত্মাহুতি দিয়েছে এদেশের অসংখ্য মায়ের অসংখ্য নাম-না-জানা সন্তান। স্বৈরাচারী চক্র সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে কোনো কোনো প্রফেসরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বিদেশে চলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু কই, বিশ্ববিদ্যালয় কোনো শিক্ষক তো সে স্বৈরাচারী কার্যকলাপের প্রতিবাদে তখন পদত্যাগ

করেন নাই। তখন অধ্যাপকরা একযোগে পদত্যাগ করলে আন্দোলনে এত রক্তক্ষয়ের প্রয়োজন হতো না।

মুক্ত পরিবেশেই ভাষার বিকাশ হয়! ঘরে বসে ভাষার পরিবর্তন, পরিবর্ধন করা যায় না। এর পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় ব্যবহারের ভেতর দিয়ে। ভাষার গতি নদীর স্রোতধারার মতো। ভাষা নিজেই তার গতিপথ রচনা করে নেয়। কেউ এর গতি রোধ করতে পারে না। এই মুক্ত পরিবেশে বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের অতীত ভূমিকা ভুলে স্বাজাত্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলা ভাষাকে গণমুখী ভাষা হিসাবে গড়ে তুলুন। জনগণের জন্যেই সাহিত্য। এদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের লেখনীর মধ্যে নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন, দুঃখী মানুষের সংগ্রাম নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করুন। কেউ আপনাদের বাধা দিতে সাহস করবে না।

আমরা জনগণের দাবি আদায়ের জন্যে রাজনীতি করি। তবে তার মানে এই না যে আমরা ক্ষমতা চাই না। আমরা দাবি আদায়ের জন্যেই ক্ষমতায় যেতে চাই। ক্ষমতা পেলে আমরা একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করব। আমাদের 'জয় বাংলা' শ্লোগানের মধ্যেই এদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি নিহিত আছে। তবে দাবি আদায় না হলে আমরা ক্ষমতা ছেড়ে চলে আসব।

জয় বাংলা!

[সূত্র : দৈনিক আজাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১]

১৯৭১-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি
বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা– চাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি

১৯৭১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। বঙ্গবন্ধু এবং জাতীয় প্রাদেশিক পরিষদে নবনির্বাচিত সদস্যদের সম্মানে ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতি একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে। ঢাকার তেজগাঁ এলাকার পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ ভবনের লনে এই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন–শিল্প ও বাণিজ্য মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিদেশি কূটনৈতিক এবং সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ। এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন–

"পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের ঢাকায় এসে দেশের জন্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে আমি যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাই। শাসনতন্ত্র রচনার জন্যে জনগণ তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেছেন, কাজেই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সবার পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করা উচিত। জাতীয় পরিষদের সদস্য একটি দলের প্রধান অধিবেশনে যোগদানের জন্যে আশ্বাস দাবি করেছেন। আমি কোনো আশ্বাস দিতে পারি না। কারণ ৬ দফা বর্তমানে জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের নির্ধারিত সময়ে পরিষদে দিন-রাত আলোচনার সুযোগ পাওয়া যাবে। যদি একজন সদস্যও সুষ্ঠু ও ন্যায্য সুপারিশ করেন, তা মেনে নেয়া হবে। আমি আবারও জোর দিয়ে বলতে চাই, ৬ দফার ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হবে। ৬ দফা কর্মসূচী শুধু বাংলার মানুষের জন্যে নয়। আমরা সিন্ধু, পাঞ্জাব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশগুলোকেও বাংলাদেশের সমপরিমাণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার পক্ষপাতী। তাই পাকিস্তানও থাকবে, বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আর বেলুচিস্তানও থাকবে। যা থাকবে না তা হচ্ছে মানুষে মানুষে শোষণ।

যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠের ডিক্টেটরশীপের কথা বলছেন, তাঁরাই সংখ্যালঘিষ্ঠের ডিক্টেটরশিপ করছেন। যেসব মন্তব্য শোনা যাচ্ছে তা কেবল দুঃখজনকই নয়, ভবিষ্যতের জন্যে ভীতিজনকও বটে। জনাব ভুট্টো জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ না দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। যদি আপনি মাত্র ৮৩ জন সদস্য নিয়ে আসতে না চান, তাহলে আওয়ামী লীগ ১৬০ জন সদস্য নিয়ে বলতে পারে– 'আমরাও যাব না।' তাহলে কি হবে?

জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যর্থ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র নির্বাচনের পর অব্যাহত আছে। এ ধরনের বাধাবিঘ্ন চলতে থাকলে এসবের পরিণতির জন্যেও ষড়যন্ত্রকারীরাই দায়ী হবে। আমরা মরতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কিছুতেই নতি স্বীকার করব না।

আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। তবে তা বিপ্লবের মাধ্যমে নয়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিবর্তনের মাধ্যমেই অর্জিত হবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ছাড়া ৫৫ হাজার বর্গমাইল এলাকার সাড়ে ৭ কোটি লোক কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারে না।

স্বাধীনতার সময় বাংলা সোনার দেশ ছিল, কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে ২৩ বছরে একচেটিয়া পুঁজিবাদের শোষণে সোনার বাংলা সর্বত্র বুভুক্ষু মানুষের আর্তনাদে ভরে উঠেছে। স্বাধীনতার জন্যে যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন, তাঁরা সাধারণ মানুষের বর্তমান অবস্থা দেখার জন্য স্বাধীনতা চান নাই। পাকিস্তানের স্রষ্টা জিন্নাহ্ সাহেবও বেঁচে থাকলে বলতেন, তিনি এ পাকিস্তান চান নাই।

উন্নত জীবনের আশাতেই জনগণ সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করেছিল। কিন্তু তার জায়গায় এ পর্যন্ত তারা এমনভাবে শোষিত হয়েছে যে তাদের মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে গেছে।

এ প্রদেশ আজ এক সর্বাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। বাংলাদেশে ৭০ লক্ষ লোক আজ বেকার। তাই কর্ম ও খাদ্য সংস্থানের তাগিদে গ্রাম অঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে সমানে লোক চলে আসছে। ২৪ বছর-কালে এমনকি বাংলাদেশ থেকে কেন্দ্রীয় ও সশস্ত্র বাহিনীতে শতকরা ১৫ জন লোকও স্থান পায় নাই। ভবিষ্যতে সামরিক বাহিনীসহ কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাঙালিদের নিয়োগ করা হবে। তবে রাতারাতি এই পন্থা কার্যকরী করা সম্ভব হবে না। ক্রমে ক্রমে করা হবে। আমরা বেকার সমস্যার সমাধান করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা একজন লোককেও অনাহারে মরতে দেব না।

স্বাধীনতার পর পূর্ব পাকিস্তান বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সত্ত্বেও তার শতকরা ৮০ ভাগই পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী মিলে উৎপাদিত পণ্যের বাজার সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বিকাশমান তাঁত শিল্পকে ধ্বংস করা হয়েছে এবং এর ফলে ২০ লাখ লোক বেকার হয়েছে। শিল্প সংরক্ষণের অজুহাতে বাংলাদেশের জনসাধারণকে জাপান ও অন্যান্য দেশ থেকে আমদানীকৃত কাপড়ের মূল্যের চেয়ে ছয় গুণ বেশি দাম দিয়ে কাপড় কিনতে হয়েছে।

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এক ভ্রান্ত নীতি গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড পাটের রফতানি বাজার হারাতে হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আর

তা রফতানি করা হচ্ছে না। বাংলাদেশের চা পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে চোরাচালানোর মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে বিরাট বাজার সৃষ্টি করা হয়েছে। তামাক ফসলও আজ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানি লবণ উৎপাদকদের স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানে লবণ উৎপাদনের উপর কর আরোপ করে হাজার হাজার লোককে বেকার করা হয়েছে।

আমি আবারও ঘোষণা করছি, দরিদ্র জনগণের স্বার্থে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিসমূহ জাতীয়করণ করা হবে। পাকিস্তানের নামে দরিদ্র জনসাধারণকে সর্বস্বান্ত করে পুঁজি সংগ্রহ করে দেশে ২২ পরিবার গড়ে উঠেছে। আজ ব্যাংক তাদের হাতে, বীমা কোম্পানি তাদের নিয়ন্ত্রণে। ২২ পরিবার টেলিফোনে কোটি কোটি টাকার 'এলসি' খুলে ফেলে আর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা শতকরা ৪৫ ভাগ টাকা জমা দিয়েও 'এলসি' খোলার জন্যে হয়রান হয়।

বাংলার মানুষের উদারতার সুযোগ নিয়ে সারা বাংলাদেশকে লুট করা হয়েছে। যাদের ৫ লক্ষ টাকা ছিল তারা এখন ৫ কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। এই টাকা আসমান থেকে আসে নাই। পাকিস্তানের নামে দরিদ্র জনসাধারণকে সর্বস্বান্ত করে এই পুঁজি সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের জন্যে হাসপাতালে বেড সংখ্যা ৬০০০ আর পশ্চিম পাকিস্তানের হাসপাতালের বেড সংখ্যা ২৬,০০০।

ব্যবসায়ীদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, তাঁরা অতীতে বাংলাদেশের জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্যে কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রদের সংগ্রামে শরীক হন নাই। তবে ভবিষ্যতে এরকম যেকোনো সংগ্রামে তাঁরা শরীক হবেন আশা করি। অন্যথায় আপনাদের আর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। আর তা টিকে থাকলেও আপনাদের দাসের মতোই জীবনযাপন করতে হবে।

বাংলার এই সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের বণিকদের বিরুদ্ধে নয়। যেসব ব্যবসায়ী বাংলার মাটিকে নিজের বলে গ্রহণ করছেন, তাঁরা আমাদেরই ভাই। আমরা তাদের তাড়াতে চাই, একথা আদৌ সত্য নয়। আপনারা এখানে ব্যবসা করুন। আমরা কখনও আপনাদের বাংলাদেশ ত্যাগ করতে বলব না। তবে দয়া করে পুঁজি পাচার বন্ধ করুন।

জয় বাংলা আন্দোলন কেবলমাত্র রাজনৈতিক শ্লোগান নয়। এটা বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের প্রতীক। এই আন্দোলন চলবেই। সেই সঙ্গে চলবে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলন।

[সূত্র : দৈনিক আজাদ, পহেলা মার্চ, ১৯৭১]

১৯৭১-এর ১ মার্চ : ইয়াহিয়া খানের বিবৃতি বঙ্গবন্ধুর হরতালের আহ্বান

১৯৭১ সালের ১ মার্চ দুপুরে হঠাৎ করেই পাকিস্তান রেডিও'র বিশেষ অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল পিপলস্ পার্টিসহ আরোও কয়েকটি দল ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার সংকল্প প্রকাশ করায় ৩ মার্চ থেকে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এই সংবাদ ঢাকাতে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকাসহ সমগ্র বাংলাদেশের জনগণ তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঢাকার রাজপথে অসংখ্য বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। দোকানপাট, হাটবাজার বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু সেই সময় ছিলেন ঢাকার হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠকে। সেই হোটেলের সামনে সমবেত হন হাজার হাজার মানুষ। সাংবাদিকরাও শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্য শোনার জন্য জড়ো হন। সেই দিনই একটি বিবৃতি দিয়ে মুজিবুর রহমান বলেন, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে আগামী ২ মার্চ ঢাকায় এবং আগামী ৩ মার্চ সারাদেশে পালিত হবে সর্বাত্মক তরতাল। তিনি বিবৃতিতে আরো বলেন—

"আপনারা সম্ভবত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নামে প্রচারিত বিবৃতি শুনেছেন। সাধারণত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণ তাঁর কণ্ঠেই শোনা যেত। অথচ এ ক্ষেত্রে বিবৃতিটি অন্য কারো কণ্ঠে প্রচারিত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের সকল এমএলএ এখন ঢাকায়। ভুট্টো ও কাইয়ুম খানের দল ছাড়া আর বাকি সব পশ্চিম পাকিস্তানি এমএলএ অধিবেশনে যোগদান করে শাসনতন্ত্র রচনায় সহায়তা করতে প্রস্তুত। এই মুহূর্তে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।

আমি আগে থেকেই বলেছি, ষড়যন্ত্র চলছে। এই ঘোষণা এক সুদীর্ঘ ষড়যন্ত্রেরই ফলশ্রুতি এবং আমরা এর কঠোর নিন্দা ও প্রতিবাদ না করে পারি না। একটি সংখ্যালঘু দলের একগুঁয়ে দাবির ফলে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মূলতবী ঘোষিত হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত

হয়েছে—এটা আমাদের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক। জনগণের প্রতি যেহেতু আমাদের দায়িত্ব রয়েছে, তাই আমরা একে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দিতে পারি না।

এর প্রতিবাদে কাল মঙ্গলবার রাজধানী ঢাকায় এবং পরশু সারা দেশে সাধারণ হরতাল পালিত হবে। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমি শিগগিরই মওলানা ভাসানী, জনাব নূরুল আমিন, প্রফেসর মুজাফফর আহমদ এবং জনাব আতাউর রহমান খানের সাথে আলোচনা করব। আগামী ৭ই মার্চ রেসকোর্সে এক গণসমাবেশে বাংলার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।

আমরা যেকোনো অবস্থার জন্য প্রস্তুত আছি। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমরা নির্বাচিত হয়েছি। এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। কিন্তু পুরানো ষড়যন্ত্র আবার শুরু হয়েছে। বাংলাদেশকে উপনিবেশ এবং বাজার হিসাবে শোষণ করার জন্যই এই ষড়যন্ত্র। কিন্তু আমরা আমাদের সম্মিলিত সংগ্রাম চালিয়ে যাব। কারণ আমরা জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। আপনারা যেকোনো ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকুন। তবে সব রকম হিংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকবেন। আমাদের দল একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং আমরা শান্তিপূর্ণভাবে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাব।

জনগণ আমাদের নির্বাচিত করেছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে একটি শাসনতন্ত্র রচনার জন্য আমরাই জনগণের কাছে দায়ী। শাসনতন্ত্র রচনার জন্য আমরা সবার সহযোগিতা চাই। পশ্চিম পাকিস্তানের জনাব ভুট্টো ও জনাব কাইয়ুম খানের দল ছাড়া আর সব দলের সদস্যরাই শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ঢাকা আসতে আগ্রহী ছিলেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরুর পর তার নিজস্ব কার্যধারা মোতাবেক সেটা চলবে। শাসনতান্ত্রিক বিল পেশের পর সেভাবেই আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেত। কিন্তু একটি দলের আবেগে সাড়া দিতে গিয়ে তা বানচাল করা হয়েছে। জনাব ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য পরিষদ সদস্যকে হুমকি দিয়েছেন। তিনি আইন নিজ হাতে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে তো আইন প্রয়োগ হচ্ছে না? তবে কি আইন সব দরিদ্র বাঙালিদের জন্য?

আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি আহ্বানের দাবি করেছিলাম। সেই সময় জনাব ভুট্টো মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে আহ্বানের দাবি জানান এবং ৩রা মার্চ পরিষদের অধিবেশনের তারিখ ধার্য করা

হয়েছিল। আমি পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার বিরুদ্ধে আমার মত ঘোষণা করা সত্ত্বেও জনাব ভুট্টো স্থগিত রাখার দাবি জানান এবং সেটাই করা হচ্ছে। এর অর্থ কি এই নয়, কর্তৃপক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠকে উপেক্ষা করে গণতান্ত্রিক নীতি লঙ্ঘন করেছেন? গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগুরুর মতই গৃহীত হয় এবং আমরা সংখ্যাগুরু।

বাঙালিদের আর কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আমরা ন্যায় ও সত্যের জন্য সংগ্রাম করছি। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। আমি পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের জনগণকে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর অনুরোধ করব। এই প্রদেশে বসবাসকারী অবাঙালিরা এদেশেরই সন্তান। এদেশের জনগণের সংগ্রামে তাঁদেরও অবশ্যই যোগ দিতে হবে। জনগণ ৬ দফার পক্ষে রায় দিয়েছে। আমরা তাতে দৃঢ় থাকব–জনগণই অবশিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। জনগণের দাবি আদায়ের জন্য এগিয়ে গেলে কেউ যদি আমাদের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে, তার পরিণতির জন্য তাঁরাই দায়ী থাকবেন।

[সূত্র : দৈনিক পূর্বদেশ, ২ মার্চ, ১৯৭১]

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ
বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা–এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম

১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিতের ঘোষণা দিলে সারা বাংলায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এই পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদের জরুরি বৈঠকে ৩ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়। ৩ মার্চ হরতাল পালিত হবার পর বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি দাবি জানান। এই প্রেক্ষাপটেই ১৯৭১ সালের ৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন যে, বিগত কয়েক দিনের আন্দোলনকালে সেনাবাহিনীর গুলিতে ৩০০ জনের মতো নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন আরো দু' হাজারের মতো মানুষ। জনগণ বহু জায়গায় পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে দিয়ে বাংলাদেশের নতুন পতাকা উত্তোলন করেছেন। ছবি পোড়ানো হয়েছে মহম্মদ আলী জিন্নার। এদিকে ৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক ভাষণে ২৫ মার্চ তারিখে জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন। যদিও প্রেসিডেন্টের ভাষণের মূল কথাই হলো পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী যে কোনো মূল্যে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবে। এরই মধ্যে প্রেসিডেন্ট ৬ মার্চ জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেন।

এলো বাংলাদেশের ইতিহাসে ঐতিহাসিক এবং পবিত্রতম দিবস ৭ মার্চ, ১৯৭১। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ঐতিহাসিক জনসভার আয়োজন হয় ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে। ঐ সমাবেশে বঙ্গবন্ধু পরবর্তী কী নির্দেশ দেন তা শোনার জন্য সমবেত হন কম করে দশ লক্ষ মানুষ। বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা করেন মোট আঠারো মিনিট। ঐ বক্তৃতায় তিনি বলেন–

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম–জয়বাংলা" ঐতিহাসিক ঐ ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে শৃঙ্খলমুক্তির আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করেন–

"প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।"

বঙ্গবন্ধুর জীবনে সবচাইতে তাৎপর্যমণ্ডিত এই বক্তৃতাটি ছিল এইরকম—

"ভাইয়েরা আমার,

আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।

কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করব এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলব, এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বছরের ইতিহাস, মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস।

বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সনে রক্ত দিয়েছি, ১৯৫৪ সনে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সনে আয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে দশ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছিল। ১৯৬৬ সনে ছয়-দফা আন্দোলনে, ৭ই জুনে আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাঁকে অনুরোধ করলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না। তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে হবে। আমরা বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসব। আমি বললাম, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব, এমনকি আমি এ-ও পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও, একজনও যদি হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব। জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ না। আরো আলোচনা হবে। তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, ওদের সঙ্গে আলাপ করলাম, আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে

তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে। তারপরে হঠাৎ এক তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো। ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসাবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন, আমি বললাম যে, আমি যাব। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। পঁয়ত্রিশ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করে দেওয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল। আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কী পেলাম আমরা? আমরা পয়সা দিয়ে যে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রু থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে দেশের গরিব-দুঃখী-আর্ত মানুষের মধ্যে। তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপরে গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি যে, ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমি তো অনেক আগেই বলেছি, কিসের আর.টি.সি.? কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসব? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন। বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার,

পঁচিশ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি দশ তারিখে বলে দিয়েছি যে, ওই শহীদের রক্তের উপর দিয়ে, পাড়া দিয়ে আর.টি.সি.তে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেম্বলি কল করেছেন আমার দাবি মানতে হবে প্রথম। সামরিক আইন মার্শাল ল' উইথড্র

করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখব আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারব কি পারব না। এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না। আমি, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাচারি, আদালত, ফৌজদারী, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সে জন্য যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা-ঘোড়ার গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু, সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্মেন্ট দপ্তরগুলো—ওয়াপদা, কোনো কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটি গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর আমার অনুরোধ রইল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু, আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।

আমরা ভাতে মারব। আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাক, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবা না। আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যতদূর পারি ওদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই সাত দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছিয়ে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি : আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো। কেউ দেবে না। শোনেন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলার হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-নন-বেঙলি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে, আমাদের উপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও, টেলিভিশনের

কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয় কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়না-পত্র নেবার পারে। কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম, আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন। কিন্তু যদি এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

জয় বাংলা।

[সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ মার্চ, ১৯৭১]

১৯৭১ এর ৮ মার্চ : বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে শুরু হলো অসহযোগ আন্দোলন

১৯৭১ সালের ৮ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইয়াহিয়া খান সরকারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। প্রকৃতপক্ষে ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ও পরিচালনায়। সেই সময় একদিকে রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়ার নির্দেশ যেত, অন্যদিকে ৩২ নং ধানমন্ডি সড়ক থেকে যেত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ। বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনে চলতেন। অফিস, আদালত, ব্যাঙ্ক, বীমা, শিল্প, কলকারখানা, গাড়ি, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি সবকিছুই পরিচালিত হতো বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। ইয়াহিয়ার সব নির্দেশ অমান্য করে অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার মানুষের সেই অভূতপূর্ব সাড়া ইতিহাসে বিরল ঘটনা।

বঙ্গবন্ধু ৮ মার্চ ১৯৭১ থেকে এক সপ্তাহের জন্য কর্মসূচি ঘোষণা করে বললেন যে—

(১) খাজনা-ট্যাক্স বর্জন আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

(২) সেক্রেটারিয়েট, সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, হাইকোর্ট ও বাংলাদেশের অন্যান্য আদালত হরতাল পালন করবে। মাঝে মাঝে প্রয়োজনবোধে এ ব্যাপারে কোন কোন অংশকে হরতালের আওতামুক্ত ঘোষণা করা হবে।

(৩) রেলওয়ে ও বন্দরগুলো চালু থাকতে পারে। কিন্তু যদি জনগণের উপর নির্যাতন চালানোর উদ্দেশ্যে সৈন্য সমাবেশের জন্য রেলওয়ে ও বন্দরগুলোকে ব্যবহার করা হয় তাহলে রেলওয়ে শ্রমিক ও বন্দর শ্রমিকরা সহযোগিতা করবেন না।

(৪) বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলোকে আমাদের বিবৃতিসমূহের পূর্ণ বিবরণ প্রচার করতে হবে এবং তারা জনগণের আন্দোলন সম্পর্কে খবর গোপন করতে পারবে না, অন্যথায় এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত বাঙালিরা সহযোগিতা করবেন না।

(৫) কেবল স্থানীয় এবং আন্তঃজেলা ট্রাঙ্ক টেলিফোন যোগাযোগ চালু থাকবে।

(৬) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

(৭) ব্যাংকগুলো স্টেট ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে দেশের পশ্চিম অংশে অর্থ পাচার করতে পারবে না।

(৮) প্রতিদিন সকল ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন করতে হবে।

(৯) অন্য সকল ক্ষেত্র থেকে হরতাল প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু অবস্থা বিশেষে যেকোন সময় উপরোক্ত ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ অথবা আংশিক হরতাল ঘোষণা করা হতে পারে।

(১০) প্রতি ইউনিয়ন, মহল্লা, থানা, মহকুমা ও জেলায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ ইউনিটের নেতৃত্বে একটি করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে।

[সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান, ৮ মার্চ, ১৯৭১]

১৯৭১-এর ১৪ মার্চ ৩৫টি নির্দেশ জারি করে বললেন— মুক্তির সংগ্রাম চলবেই

১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক জনসমাবেশে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার পর থেকেই কার্যত স্বাধীনতার জন্য, মুক্তির জন্য গোটা দেশ উত্তাল হয়ে উঠে। ৮ মার্চ থেকে ১৪ মার্চ পর্যন্ত জনগণ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সর্বাত্মক হরতাল পালন করেন। ১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু ৩৫টি নির্দেশ জারি করে বললেন মুক্তির সংগ্রাম জারি থাকবে। স্বাধীনতা লাভ না করা পর্যন্ত চলবে এই সংগ্রাম। এই ৩৫টি নির্দেশ ছিল এই রকম—

১ নং নির্দেশ

সরকারি সংস্থাসমূহ

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়টসমূহ, সরকারি ও বেসরকারি অফিসসমূহ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ, হাইকোর্ট এবং বাংলাদেশস্থ সকল কোর্টে হরতাল পালন করবেন এবং নিম্নেবর্ণিত বিশেষ নির্দেশনাবলি এবং বিভিন্ন সময়ে যেসব ছাড় ব্যাখ্যা দেওয়া হবে তা সবই মেনে চলবেন।

২ নং নির্দেশ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

সমগ্র বাংলাদেশে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

৩ নং নির্দেশ

আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা

ক. ডেপুটি কমিশনারগণ ও মহকুমা অফিসারগণ তাঁদের কোন দপ্তর না খুলে সংশ্লিষ্ট এলাকার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন এবং উন্নয়ন কাজ ও প্রয়োজন হলে এই সকল নির্দেশ কার্যকরী বা প্রয়োগ করার দায়িত্ব পালন করবেন।

ডেপুটি কমিশনারগণ ও মহকুমা অফিসারগণ তাঁদের এই সব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও নিবিড় সহযোগিতা বজায় রাখবেন।

খ. পুলিশ আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রয়োজন বোধে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাথে যোগ দেবেন।

গ. জেলের দপ্তরে কাজ চলবে এবং জেল ওয়ার্ডারগণ তাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করে যাবেন।

ঘ. আনসার বাহিনী তাদের দায়িত্ব পালন করবেন।

৪ নং নির্দেশ

বন্দর (অভ্যন্তরীণ বন্দরসহ)

বন্দর কর্তৃপক্ষ পাইলটেজসহ সকল কাজ করে যাবেন। বন্দর কর্তৃপক্ষের কেবলমাত্র সেই সব অফিস খোলা থাকবে যেগুলি বন্দরে জাহাজসমূহের সহজ ও সুষ্ঠু আসা-যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু সৈন্য চলাচলে কিংবা সমরাস্ত্র নামানোর ও বাংলাদেশের মানুষকে নির্যাতনের জন্যে সৈন্য ও সমরাস্ত্র আনা-নেওয়ার কাজে কোনভাবেই সহযোগিতা বা সাহায্য করা যাবে না। জাহাজসমূহের বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের জন্য খাদ্যবাহী জাহাজসমূহের মাল খালাস ত্বরান্বিত করার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর শুল্ক (পোর্ট ডিউজ) ও মাল খালাসের কর বা শুল্ক আদায় করবেন। অভ্যন্তরীণ বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর শুল্ক ও অন্যান্য শুল্ক আদায় করবেন।

৫ নং নির্দেশ

আমদানি

আমদানিকৃত সকল মাল দ্রুত খালাস করতে হবে। শুল্ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ কাজ করে যাবেন এবং ধার্যকৃত শুল্ক সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের পর মাল খালাসের অনুমতি দেবেন। এই কাজ সমাধানের জন্যে ইস্টার্ণ ব্যাংকিং করপোরেশন লিমিটেডে ও ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডে বিশেষ একাউন্ট খোলা হবে। কাষ্টমস কালেক্টরগণ এই বিশেষ একাউন্ট পরিচালনা করবেন। আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময়ে যেসব নির্দেশ ইস্যু করবেন কাস্টমস কালেক্টরগণ তদনুযায়ী একাউন্ট পরিচালনা করবেন। যে শুল্ক আদায় করা হবে তা কোন মতেই কেন্দ্রীয় সরকারের নামে জমা হবে না।

৬ নং নির্দেশ

রেলওয়ে

রেলওয়ে চালু থাকবে। তবে রেল কর্তৃপক্ষের কেবলমাত্র সেই সব অফিসই খোলা থাকবে যেগুলি রেল চলাচলের জন্যে প্রয়োজনীয়। কিন্তু

বাংলাদেশের মানুষের উপর নির্যাতন চালানোর জন্যে সৈন্যদের আনা-নেওয়া বা সমরাস্ত্র পরিবহনের কোন কাজে কোনভাবেই সাহায্য বা সহযোগিতা করা যাবে না। বন্দর থেকে দেশের অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য পরিবহনের জন্যে রেলওয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রেল ওয়াগনের ব্যবস্থা করবেন।

৭ নং নির্দেশ

সড়ক পরিবহন

সারা বাংলাদেশে ইপিআরটিসি চালু থাকবে।

৮ নং নির্দেশ

অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরগুলোর কাজ চালু রাখার জন্য ই পিএসসি অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ও আইডব্লিউটিএ-র প্রয়োজনীয় কিছু সংখ্যক কর্মচারী কাজ চালিয়ে যাবেন। গণ-নির্যাতনের জন্য সৈন্য বা রণসম্ভার আনা-নেওয়ার ব্যাপারে এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা কোন সহযোগিতা করতে পারবেন না।

৯ নং নির্দেশ

বাংলাদেশের মধ্যে শুধু চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ও মানি অর্ডার পৌঁছানোর জন্য ডাক ও তার বিভাগ কাজ করে যাবে। সরাসরি বিদেশে চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম প্রেরণ করা যাবে। ব্যাংকের বিভিন্ন নির্দেশ নেওয়ার ও দেওয়ার জন্য সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার শুধু অপরাহ্ণ তিনটা থেকে ৪টা পর্যন্ত এই এক ঘণ্টা আন্তঃঅঞ্চল টেলিপ্রিন্টার যোগাযোগ চালু থাকবে। ২৫ নং নির্দেশে এই অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আন্তঃঅঞ্চল প্রেস টেলিগ্রাম চালু থাকবে। পোস্টাল সেভিংস ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি কার্যরত থাকবে।

১০ নং নির্দেশ

বাংলাদেশের মধ্যে কেবল স্থানীয় ও আন্তঃজেলা ট্রাংক টেলিফোন যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে। টেলিফোন মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভাগগুলো কাজ করে যাবে।

১১ নং নির্দেশ

বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলি কাজ চালিয়ে যাবেন। তারা গণ-আন্দোলন সম্পর্কিত সকল বক্তব্য, বিবৃতি, সংবাদ ইত্যাদি প্রচার করবেন। যদি না করেন তবে এই সব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিরা সহযোগিতা করবেন না।

১২ নং নির্দেশ

জেলা হাসপাতাল, টিবি ক্লিনিক, কলেরা রিসার্চ ইনস্টিটিউটসহ সকল হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য ও সেনিটেশান সার্ভিসগুলো যথারীতি কাজ করে যাবে। সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স কাজ করে যাবে এবং সকল হাসপাতাল ও হেলথ সেন্টারে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করবে।

১৩ নং নির্দেশ

বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজের সাথে ও এই কাজের সংরক্ষণ ও মেরামত কাজের সাথে জড়িত ইপিওয়াপদার বিভাগগুলো কাজ করে যাবে।

১৪ নং নির্দেশ

গ্যাস ও পানি সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। এই সবের সংরক্ষণ ও মেরামতের কাজও চালু থাকবে।

ব্রিক ফিল্ড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য কয়লা সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।

১৬ নং নির্দেশ

আমদানি, বণ্টন, গুদামজাতকরণ ও খাদ্যশস্যের চলাচল জরুরি ভিত্তিতে কার্যকরী থাকবে। এই সবের প্রয়োজনে ওয়াগন, বার্জ, ট্রাক ও অন্যান্য সকল প্রকার পরিবহন ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে চালু থাকবে।

১৭ নং নির্দেশ

ক. ধান ও পাটবীজ, সার ও কীটপতঙ্গনাশক ঔষধ ক্রয়, চলাচল ও বণ্টন অব্যাহত থাকবে। কৃষি খামার ও চাল গবেষণা ইনস্টিটিউট ও এর সকল প্রকল্প যথারীতি কাজ করবে।

খ. পাওয়ার পাম্প ও অন্যান্য কারিগরি যন্ত্রপাতির চলাচল, বণ্টন, মাঠে চালু রাখা ইত্যাদি অব্যাহত থাকবে। তা ছাড়া, তেল, জ্বালানি, যন্ত্রপাতি ও এইসবের সংরক্ষণ ও মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় বিভাগ খোলা থাকবে।

গ. নলকূপ খনন, খাল খনন ও এই জাতীয় পানি সেচ সম্পর্কিত সকল কাজ চালু থাকবে।

ঘ. পূর্ব পাকিস্তান সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও তার অঙ্গ সংস্থাগুলো থানা সমবায় সমিতি এবং অন্যান্য সমবায় সংস্থাগুলো থেকে কৃষি ঋণ দেওয়া অব্যাহত থাকবে।

ঙ. যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো তার কার্য সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন সংস্থার প্রয়োজনীয় শাখাগুলো খোলা থাকবে।

চ. কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংক থেকে ঘূর্ণিদুর্গতদের জন্য সুদবিহীন ঋণ ও কৃষকদের প্রয়োজনীয় ঋণ দেওয়া বলবৎ থাকবে।

ছ. আলু কিনে গুদামজাত করার জন্য কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের তহবিল মওজুদ রাখতে হবে।

১৮ নং নির্দেশ

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও শহর সংরক্ষণ

বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ, শহর সংরক্ষণ এবং নদী খনন ও যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ ওয়াপদার পানি উন্নয়ন কাজ, মালপত্র খালাস ও আনা-নেওয়া এবং এই ধরনের অন্যান্য জরুরি কাজ সুচারুরূপে চালিয়ে যাওয়া হবে। সরকারি এজেন্সি কিংবা সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কন্ট্রাক্টরদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।

১৯ নং নির্দেশ

উন্নয়ন ও নির্মাণকার্য

বৈদেশিক সাহায্যে তৈরি রাস্তা পুল প্রকল্পগুলোসহ সকল প্রকার সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার উন্নয়ন ও নির্মাণকাজ অব্যাহত থাকবে। সরকারি এজেন্সি ও সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা থেকে ঠিকাদারদের পাওনা যথারীতি মিটিয়ে দেওয়া হবে। উক্ত সংস্থাগুলো থেকে যদি মালমসলা সরবরাহের চুক্তি থাকে তাহলে সেই চুক্তি মোতাবেক যথারীতি সরবরাহ করা হবে।

২০ নং নির্দেশ

সাহায্য ও পুনর্বাসন

ঘূর্ণিদুর্গত এলাকার বাঁধ তৈরি ও উন্নয়নমূলক কাজসহ সকল প্রকার সাহায্য, পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে। সরকারি এজেন্সি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো ঠিকাদারদের পাওনা মিটিয়ে দিবে।

২১ নং নির্দেশ

ইপিআইডিসি, ইপসিক ফ্যাক্টরি ও ইস্টার্ন রিফাইনারি

ইপিআইডিসি, ইপসিকের সকল কারখানায় কাজ চলবে এবং যত দূর সম্ভব উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। এই সকল কারখানা চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের ব্যাপারে ইপিআইডিসি ও ইপসিকের যে

সকল শাখা খোলা রাখা প্রয়োজন হবে তা খুলে রাখতে হবে। ইস্টার্ন রিফাইনারির কাজ যথারীতি চালিয়ে যেতে হবে।

২২ নং নির্দেশ

বেতন দান

সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থার কর্মচারী ও প্রাইমারি শিক্ষকদের বেতন—যাদের রোজ, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক কিংবা মাসিক হিসাবে দেওয়া হয়ে থাকে, তাদের সেই ভাবে দিতে হবে। যাদের বন্যা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে বাকি বেতন দেওয়ার কথা তা দিয়ে দিতে হবে। বেতন বিল তৈরির জন্য সরকারি আধা-সরকারি বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো খোলা রাখতে হবে।

২৩ নং নির্দেশ

পেনসন

সামরিক বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীসহ সকল অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর পেনসন নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করতে হবে।

২৪ নং নির্দেশ

এজি (ইপি) ও ট্রেজারি

এই নির্দেশে যে সকল সংস্থাকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য হুকুম দেওয়া হয়েছে তাদের টাকা-পয়সা দেওয়া-নেওয়া ও সরকারি কর্মচারীদের বিল তৈরির জন্য সামান্যসংখ্যক কর্মচারী দ্বারা এজি (ইপি) অফিসের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

২৫ নং নির্দেশ

ব্যাংক

ক. ব্যাংকিং কার্য পরিচালনার জন্য সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে ৪টা পর্যন্ত সকল ব্যাংক খোলা থাকবে (অবশ্য মাঝে টিফিনের ছুটি থাকবে)। কিন্তু শুক্রবারে ও শনিবারে ব্যাংকিং কাজের জন্য সকাল ৯টা থেকে ১১.৩০ মি. পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য ১২.৩০ মি. পর্যন্ত খোলা থাকবে। অনুমোদিত লেনদেনের ক্ষেত্রে বুক ব্যালান্সসহ অন্য কার্যাবলি নিয়মিতভাবে চলবে।

খ. কয়েকটি বিধি-নিষেধ ছাড়া ব্যাংকগুলো যেকোন পরিমাণ জমা গ্রহণ, বাংলাদেশের ভিতর যেকোন পরিমাণ আন্তঃব্যাংক ক্লিয়ারেন্স, বাংলাদেশের ভিতর আন্তঃব্যাংক ট্রান্সফার এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে টি টি বা মেইল

ট্রান্সফার ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ ড্র করাসহ তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাবে। যেসব বিধিনিষেধ মানতে হবে সেগুলো হচ্ছে—

১. যদি চেকের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংস্থার প্রতিনিধির বা বেতন রেজিস্টারের সার্টিফিকেট থাকে তাহলে বেতন ও মজুরি পরিশোধ করা।

২. সপ্তাহে এক হাজার টাকা পর্যন্ত বোনাফাইড ব্যক্তিগত ড্রইংস।

৩. চিনিকলের জন্যে আখ ও পাটকলের জন্যে পাটসহ শিল্পের কাঁচামাল কেনার জন্যে অর্থদান।

৪. বাংলাদেশের ক্রেতাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়সহ যেকোনো বাণিজ্যিক খাতে সপ্তাহে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট। ওই অংক ক্যাশ অথবা ক্যাশড্রাফ্ট মারফত উঠানো যাবে। কিন্তু উপরে উল্লিখিত ৩ ও ৪ নম্বর শর্তে কোন অর্থ দেওয়ার পূর্বে অতীত রেকর্ড দেখে ব্যাংককে সন্তুষ্ট হতে হবে যে, অর্থ গ্রহণকারী একজন বোনাফাইড শিল্প অথবা বাণিজ্যিক সংস্থা অথবা ব্যবসায়ী এবং সে যে অর্থ উঠাচ্ছে তা তার গত এক বছরের সাপ্তাহিক গড় অর্থ উঠানোর চাইতে যেন বেশি না হয়।

৫. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে নিযুক্ত তালিকাভুক্ত কন্ট্রাক্টরদের অর্থদান। তবে যে কর্তৃপক্ষের অধীনে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে তার কাছ থেকে চেকে একটি সার্টিফিকেট আনতে হবে যে, যে টাকাটা উঠাতে চাওয়া হচ্ছে তা উল্লিখিত কাজের জন্য প্রয়োজনীয়।

গ. বাংলাদেশের অভ্যন্তরের যে কোন একাউন্টে ক্রস চেক ও ক্রস ডিম্যান্ড ড্রাফট প্রদান করা ও জমা নেওয়া যাবে।

ঘ. স্টেট ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংক, ঢাকা থেকে অর্থ প্রদানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে টি টি পাঠানো যাবে। যে সমস্ত ব্যাংকের সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত সেগুলো ঢাকাস্থ স্টেট ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পাওনা গ্রহণ করতে পারবে।

ঙ. অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ের জন্য সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা আন্তঃশাখা টেলিপ্রেন্টার সার্ভিস চালু থাকবে।

১. প্রত্যেকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক সোমবার ও বুধবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি খবর পাঠাতে পারে।

২. প্রত্যেকটি ব্যাংক অর্থ পাঠানোর ব্যাপারে মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে একটি খবর পেতে পারে।

চ. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাংক পদ্ধতির জন্য টেলিপ্রিন্টার সার্ভিসের জন্য অব্যাহত থাকবে।

ছ. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিল সংগ্রহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ক্রস চেক বা ক্রস গ্রান্টের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করতে হবে।

জ. অনুমোদিত ডিলারের সাহায্যে ফরেন ট্র্যাভেলার্স চেক ভাঙানো যাবে।

ঝ. কূটনীতিকগণ অবাধে তাদের এ্যাকাউন্টের কাজ পরিচালনা করতে পারবেন এবং বিদেশি নাগরিকগণ বৈদেশিক মুদ্রা এ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে পারবেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ করতে পারবেন।

ঞ. লকার্স পরিচালনার কাজ বন্ধ থাকবে।

ট. স্টেট ব্যাংক বা অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে বাংলাদেশের বাইরে টাকা পাঠানো যাবে না।

ঠ. বিদেশি রাষ্ট্র থেকে লাইসেন্সের মাধ্যমে দ্রব্যাদি আমদানির জন্য লেটার অব ক্রেডিট খোলা যাবে।

ড. পণ্য বিনিময়ে চুক্তি (যে সমস্ত দ্রব্য ইতোমধ্যেই পাঠানো হয়েছে) মোতাবেক প্রেরিত দ্রব্যাদি ছাড় করতে হবে।

ঢ. ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড ও ইস্টার্ন ব্যাংকিং করপোরেশন লিমিটেড-এর মারফত বকেয়া রপ্তানি বিল সংগ্রহ করতে হবে এবং এ ব্যাপারে ব্যাংকগুলো নির্দেশ মোতাবেক কাজ পরিচালিত করবে।

২৬ নং নির্দেশ

স্টেট ব্যাংকও অন্যান্য ব্যাংকের মতো কাজ করবে এবং সে একই অফিস সময়ে চলবে এবং বাংলাদেশের ব্যাংকিং পদ্ধতি কাজ করার জন্য ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরূপভাবে খোলা থাকবে। উল্লিখিত কাঠামো ও বিধিনিষেধ এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। 'পি' ফর্ম বরাদ্দ করা যেতে পারে এবং বিদেশে অবস্থানরত ছাত্র ও অন্যান্য অনুমোদিত প্রাপকের জন্য বিদেশে প্রেরণের টাকাও গৃহীত হতে পারবে।

২৭ নং নির্দেশ

বাংলাদেশের জন্য আমদানি লাইসেন্স ইস্যুকরণ ও আমদানিকৃত দ্রব্যাদি চলাচলের বিধি ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য আমদানি-রপ্তানি কন্ট্রোলারের অফিস নিয়মিতভাবে চলবে।

২৮ নং নির্দেশ

সকল ট্রাভেল এজেন্ট অফিস ও বিদেশি বিমান পরিবহন অফিস চালু হতে পারে। কিন্তু তাদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাংলাদেশের ব্যাংকে জমা রাখতে হবে।

২৯ নং নির্দেশ

বাংলাদেশে সকল অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা চালু থাকবে।

৩০ নং নির্দেশ

পৌরসভার ময়লাবাহী ট্রাক, রাস্তায় বাতি জ্বালানো, সুইপার সার্ভিস এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগীর অন্যান্য ব্যবস্থা চালু থাকবে।

৩১ নং নির্দেশ

কোন খাজনা কর আদায় করা যাবে না।

ক. পুনঃনির্দেশ দেওয়া পর্যন্ত

১. সকল ভূমি-রাজস্ব আদায় বন্ধ থাকবে

২. বাংলাদেশের কোথাও কোন লবণ কর আদায় করা যাবে না

৩. বাংলাদেশের কোথাও কোন তামাক কর আদায় হবে না

৪. তাঁতীরা আবগারি শুল্ক দান ব্যতিরেকেই বাংলার সুতা কিনবেন। মিল মালিক ও ডিলারেরা তাদের কাছ থেকে কোন আবগারি শুল্ক আদায় করতে পারবেন না।

খ. এ ছাড়া সকল প্রাদেশিক সরকারের কর—যেমন প্রমোদ কর, হাট, বাজার, পুল ও পুকুরের উপর ধার্যকৃত কর আদায় করা যাবে এবং বাংলাদেশের সরকারের একাউন্টে জমা দিতে হবে।

গ. অক্ট্রয়সহ সকল স্থানীয় কর আদায় করা যাবে।

ঘ. কেন্দ্রীয় সরকারের সকল পরোক্ষ কর—যেমন আবগারি শুল্ক কর, বিক্রয় কর এখন থেকে আদায়কারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা আদায় হবে, তবে তা কেন্দ্রীয় খাতে জমা করা যাবে না অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে হস্তান্তর করা যাবে না। এসব আদায়কৃত কর ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক অথবা ইস্টার্ন ব্যাংকিং করপোরেশনে 'বিশেষ একাউন্ট' খুলে জমা রাখতে হবে এবং ব্যাংক দুটিও তাদের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী এগুলো গ্রহণ করবেন। সকল আদায়কারী প্রতিষ্ঠানকে এ নির্দেশ ও বিভিন্ন সময়ে তাদের প্রতি যে নির্দেশ দেওয়া হবে, তা মানতে হবে।

ঙ. কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রত্যক্ষ কর, যেমন আয় কর আদায় ইত্যাদি পরবর্তী নির্দেশ জারি হওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

৩২ নং নির্দেশ

পাকিস্তান বীমা করপোরেশন চালু থাকবে এবং পোস্টাল লাইফ ইন্সুরেন্সসহ সকল বীমা কোম্পানি কাজ করবেন।

৩৩ নং নির্দেশ

সকল ব্যবসা-শিল্প প্রতিষ্ঠান, দোকান-পাট নিয়মিতভাবে চলবে।

৩৪ নং নির্দেশ

সকল বাড়ির শীর্ষে কালো পতাকা উত্তোলিত হবে।

৩৫ নং নির্দেশ

সংগ্রাম পরিষদগুলো সর্বস্তরে তাদের কাজ চালু রাখবে এবং এ সকল নির্দেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে যাবে।

[সূত্র : দৈনিক পূর্বদেশ, ১৫ মার্চ, ১৯৭১]

১৯৭১-এর ২৬ মার্চ : বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন

১৯৭১ সালের ১৬ মার্চ ঢাকায় ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়। আলোচনার জন্য জনাব ভুট্টোও আসেন ঢাকায়। ২৪ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-মুজিব ভুট্টো আলোচনা হয়। কিন্তু ২৫ মার্চ ব্যর্থ হয় সকল রকম আলোচনা। ঐদিনই সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন গোপনে। সঙ্গে সঙ্গে খবরটি প্রচারিত হয়। খবর যায় বঙ্গবন্ধুর কাছেও। তিনি অনুভব করেন সেনাবাহিনী হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়বে। তিনি সমস্ত সহকর্মীদের আত্মগোপন করার নির্দেশ দেন। আত্মগোপনে থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধুকেও সকলে অনুরোধ করেন আত্মগোপনে চলে যাবার জন্য। কিন্তু বঙ্গবন্ধু আত্মগোপনে যেতে অস্বীকার করেন।

রাত তখন সাড়ে আটটা। সেনাবাহিনী সারা ঢাকায়। খবর ছড়িয়ে পড়ে সেনাবাহিনী ঢাকা শহরকে ঘেরাও করে রেখেছে। জনগণ শঙ্কিত এবং আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। দলে দলে রাস্তায় নেমে আসে। রাত ১০টার পরে সেনাবাহিনী ঢাকার দখল নেয়। শুরু হয় আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীর কামান দাগা ও ভারী গুলিবর্ষণ।

এদিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ২৬ মার্চ করাচি থেকে প্রচারিত এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তার দল আওয়ামী লীগকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের বিচার শুরু হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। এদিকে ২৫ মার্চ রাত থেকেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা রাইফেল সদর দপ্তর এবং রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার। এদিকে বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ স্বাধীনতা ঘোষণা করে বলেন—

"This may be the last message, from today Bangladesh is indepentdent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. You fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved."

অর্থাৎ, এটাই হয়তো আমার জীবনের শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ তোমরা যে যেখানেই আছো এবং যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সৈন্য বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।

রাত ১২.৩০ মিনিট নাগাদ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাংবাদিকদের সব রকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর সব টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। রাত ১.৩০ মিনিট নাগাদ সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। তার আগেই বঙ্গবন্ধু ২৫ তারিখ রাতে চট্টগ্রামে একটা বার্তা পাঠান ইপিআর বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে সারা দেশে সম্প্রচার করার জন্য। এই ঘোষণাটি ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা। বঙ্গবন্ধুর এই শেষ বার্তাটি বাংলাদেশের সর্বত্র ওয়্যারল্যাস, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাধ্যম প্রেরিত হয়। এটাই ছিল তাঁর স্বাধীনতার আহ্বান।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেশবাসীকে বলেছিলেন—"পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে পিলখানা, ই.পি.আর. ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও নির্দেশ, দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান।

বঙ্গবন্ধুর এই বার্তা পাওয়ার পর সর্বস্তরের জনগণের পাশাপাশি চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর সেনানিবাসে বাঙালি জওয়ান ও অফিসাররা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। বঙ্গবন্ধু বার্তা পাঠিয়েছেন রাত ১২.৩০ মিনিটে। তার ঠিক এক ঘণ্টা পরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১.৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাসভবন থেকে। এর তিন দিন পর বন্দি অবস্থায় তাঁকে পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়। ২৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যা দেন। ২৬ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেছিলেন চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান তাঁর ২৬ মার্চ ১৯৭১-এর প্রদত্ত ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ সম্পর্কে অহংকারের সুরে বলেছিলেন— "The man and his party are enemies of

Pakistan and they want East Pakistan to break away completly from the country. He has attacked the Solidarity and intigrity of this country. This crime will not go unpunished."

(Text of Yahya Khan's broadcast, 26 March, 1971)

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ৯ মাস ধরে বাংলাদেশে যে মুক্তিযুদ্ধ চলে, তা পৃথিবীর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অনন্য। এই সময় মুজিবুর ছিলেন পাকিস্তানের জেলে। এদিকে তাঁর সহযোদ্ধারা পরের মাসের অর্থাৎ এপ্রিল মাসের ১০ তারিখে গঠন করেন বিপ্লবী সরকার।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন এবং ২৩ মার্চ থেকে দেশের সর্বত্র স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল। এদিকে বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কাজও শুরু হয়েছিল ২৬ মার্চ থেকে। ঐ দিন সন্ধ্যা ৭.৪০ মিনিটে ঐ ঐতিহাসিক বেতার কেন্দ্রে শুরু হয়েছিল স্বল্পকালীন অনুষ্ঠান। ঐ অনুষ্ঠানেই বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রেরিত স্বাধীনতাবাণীর বাংলা অনুবাদ পাঠ করেছিলেন অধ্যাপক আবুল কাশেম সন্দিপ। ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি প্রচার করেছিলেন তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান। যিনি পরবর্তীকালে লে. জেনারেল এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। এই ঘোষণাপত্রের সূচনাতে বলা হয়েছিল—

"The Government of the sovereign state of Bangladesh. On bihalf of our great leader, the supreme commander of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, we hereby proclaim the independence of Bangladesh."

১৯৭১-এর ১০ এপ্রিল : বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে গঠিত হয় বিপ্লবী সরকার

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরকে রাষ্ট্রপতি করে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (মুজিবনগর) বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সেদিনের ঐ অনুষ্ঠানেই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে পঠিত ও অনুমোদিত হয়। এরপর মুজিবনগরে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা সরকার পাক হানাদার বাহিনীকে বাংলার মাটি থেকে চিরতরে উৎখাতের জন্য সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনী আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয় সূচিত হয়।

ঐ বিপ্লবী সরকারের প্রধান হয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, উপরাষ্ট্রপতি বা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন তাজউদ্দীন আহমদ এবং অর্থমন্ত্রী এম. মনসুর আলী।

১০ এপ্রিল ১৯৭১। বাংলাদেশের মুজিবনগরে যে বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়েছিল সেই সরকারের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার বা ঘোষণাপত্র দেয়া হয়েছিল তা ছিল নিম্নরূপ—

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

মুজিবনগর, বাংলাদেশ
১০ই এপ্রিল, ১৯৭১

যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়,

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জনকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন,

এবং

যেহেতু সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন,

এবং

যেহেতু এই আহূত পরিষদ-সভা স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়,

এবং

যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃক তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে,

এবং

যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদি নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান করেন,

এবং

যেহেতু একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনায় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ, অন্যান্যের মধ্যে, বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের উপর নজিরবিহীন নির্যাতন ও গণহত্যার অসংখ্য অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে এবং এখনও অনবরত করিয়া চলিতেছে,

এবং

যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া, গণহত্যা করিয়া এবং অন্যান্য দমনমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের পক্ষে একত্রিত হইয়া একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং নিজেদের জন্য একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে,

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী উদ্দীপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের উপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম,

এবং

পারস্পরিক আলোচনা করিয়া, এবং

বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থ,

সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং তদ্দারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম, এবং

এতদদ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, এবং

রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন,

ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন, একজন প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ এবং তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

কর আরোপন ও অর্থ ব্যয়ন ক্ষমতার অধিকার হইবেন, এবং

বাংলাদেশের জনগণকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ সরকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কার্য করিতে পারিবেন।

আমরা বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, কোন কারণে রাষ্ট্রপতি না থাকা বা রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়া বা তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতির উপর এতদ্বারা অর্পিত সমদুয় ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং তিনি উহা প্রয়োগ ও পালন করিবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেতেছি যে, জাতিমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে আমাদের উপর যে দায় ও দায়িত্ব বর্তাইবে উহা পালন ও বাস্তবায়ন করার এবং জাতিসংঘের সনদ মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি আমরা দিতেছি। আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেতেছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সনের ২শে মার্চ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, এই দলিল কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে আমাদের যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করিলাম।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী
বাংলাদেশ গণপরিষদের ক্ষমতাবলে ও
তদধীনে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।

[সূত্র : বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ, ১৯৮৯]

বিপ্লবী মুজিবনগর সরকার তার যাবতীয় কার্যপদ্ধতি পরিচালনা করার জন্য যে প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছিলেন তার তালিকা ছিল নিম্নরূপ–

স্থাপিত	: ১০ই এপ্রিল ১৯৭১
শপথ গ্রহণ	: ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১
অস্থায়ী সচিবালয়	: মুজিবনগর
ক্যাম্প অফিস	: ৮ থিয়েটার রোড, কলকাতা
রাষ্ট্রপতি	: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন)
উপ-রাষ্ট্রপতি	: সৈয়দ নজরুল ইসলাম (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)
প্রধানমন্ত্রী	: তাজউদ্দীন আহমদ
অর্থমন্ত্রী	: এম মনসুর আলী
স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী	: এম কামরুজ্জামান
পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী	: খন্দকার মোশতাক আহমদ
প্রধান সেনাপতি	: মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী
চিফ অব স্টাফ	: আবদুর রব
বিমানবাহিনী প্রধান	: এ কে খন্দকার

[১৯৭১ সালে এম এ জি ওসমানী এবং আবদুর রব দু'জনেই অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দু'জনকেই জেনারেল (অব.) পদে উন্নীত করেন।]

বিশেষ দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ

তথ্য, বেতার ও প্রচার	: আবদুল মান্নান এমএলএ
সাহায্য ও পুনর্বাসন	: অধ্যাপক ইউসুফ আলী এমএলএ
ভলান্টিয়ার কোর	: ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম এমএলএ
বাণিজ্য বিষয়ক	: মতিউর রহমান এমএলএ

অস্থায়ী সচিবালয়ে বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মচারীবৃন্দ

সেক্রেটারি জেনারেল	: রুহুল কুদ্দুস
অর্থ সচিব	: খন্দকার আসাদুজ্জামান
ক্যাবিনেট সচিব	: তওফিক ইমাম
প্রতিরক্ষা সচিব	: আবদুস সামাদ
পররাষ্ট্র সচিব	: মাহবুবুল আলম চাষী (নভেম্বর পর্যন্ত)
	: এফতেহ

তথ্য সচিব	: আনোয়ারুল হক খান
সংস্থাপন সচিব	: নুরুল কাদের খান
স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশ প্রধান	: আবদুল খালেক
কৃষি সচিব	: নুরুদ্দীন আহমদ
বহির্বিশ্বে বিশেষ দূত	: বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
নয়া দিল্লিতে মিশন প্রধান	: হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী
কলকাতায় মিশন প্রধান	: হোসেন আলী (মরহুম)
পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান	: ড. মোজাফ্ফর আহমদ
পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ	: ড. মোশার্‌রফ হোসেন
	: ড. আনিসুজ্জামান
	: ড. সারোয়ার মুর্শেদ
	: ড. স্বদেশ রঞ্জন
বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির প্রধান	: ড. এ আর মল্লিক
ইয়থ ক্যাম্প-এর পরিচালক	: উইং কমান্ডার (অব.) এস আর মির্জা
পরিচালক, তথ্য ও প্রচার দফতর	: এম আর আখতার মুকুল
পরিচালক, চলচ্চিত্র বিভাগ	: এ খয়ের
পরিচালক, আর্টস ও ডিজাইন	: কামরুল হাসান (মরহুম)
রিলিফ কমিশনার	: শ্রী জে জি ভৌমিক
পরিচালক, মেডিক্যাল বিষয়ক	: ডাক্তার টি হোসেন
সহকারী পরিচালক, মেডিক্যাল	: ডাক্তার আহমদ আলী

মন্ত্রিসভার সদস্যদের ব্যক্তিগত স্টাফ

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিব	: কাজী লুৎফুল হক (মরহুম)
প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব	: ড. ফারুক আজিজ খান
পি আর ও	: আলী তারেক
স্টাফ অফিসার	: মেজর নূরুল ইসলাম [পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল (অব.)]
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একান্ত সচিব	: মামুনুর রশিদ
পি আর ও	: রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী
অর্থমন্ত্রীর একান্ত সচিব	: সা'দত হোসাইন
কলকাতার মিশনে তথ্য অফিসার	: জোয়াদুল করিম
	: আমিনুল হক বাদশা
পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একান্ত সচিব	: কামাল সিদ্দিকী [ড.]

পি আর ও	: কুমার শংকর হাজরা
প্রধান সেনাপতির দু'জন এডিসি	: ক্যাপ্টেন নূর
	: লে. শেখ কামাল [মরহুম]
প্রধান সেনাপতির পি আরও	: মোস্তাফা আল্লামা
উপ-সচিব, দেশরক্ষা	: আকবর আলী খান
উপ-সচিব, সংস্থাপন	: ওয়ালীউল ইসলাম
উপ-সচিব, স্বরাষ্ট্র	: খোরশেদুজ্জামান চৌধুরী
ট্রান্সপোর্ট অফিসার	: এম এইচ সিদ্দিকী
বেতারকেন্দ্রের অনুষ্ঠানের দায়িত্বে	: আশফাকুর রহমান খান
	: শহীদুল ইসলাম, টি এইচ শিকদার
	: বেলাল মোহাম্মদ ও তাহের সুলতান
বাংলা সংবাদের দায়িত্বে	: কামাল লোহানী
ইংরেজি সংবাদের দায়িত্বে	: আলী জাকের
ইংরেজি সংবাদ পর্যালোচনা	: আলমগীর কবীর (মরহুম)
উর্দু অনুষ্ঠানের দায়িত্বে	: জাহিদ সিদ্দিকী (মরহুম)
সঙ্গীতের দায়িত্বে	: সমর দাস ও অজিত রায়
নাটকের দায়িত্বে	: হাসান ইমাম, রণেন কুশারী ও
	: মোস্তফা আনোয়ার
ও বি ও সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান	: আশরাফুল আলম
প্রকৌশলীর দায়িত্বে	: সৈয়দ আবদুস শাকের
	: রেজাউল করিম চৌধুরী

বিভিন্ন জোনের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

দক্ষিণ-পূর্ব জোন	: অধ্যাপক নুরুল ইসলাম চৌধুরী এমএলএ (মরহুম)
	: জহুর আহমদ চৌধুরী এমএলএ
উত্তর-পূর্ব জোন	: দেওয়ান ফরিদ গাজী এমএলএ
	: শামসুর রহমান খান
পূর্ব জোন	: এম এ রব এমএলএ
উত্তর জোন	: মতিউর রহমান এমএলএ ও এ রউফ এমএলএ
পশ্চিম জোন	: আজিজুর রহমান ও আশরাফুল ইসলাম এমএলএ
দক্ষিণ-পশ্চিম জোন	: এম এ রউফ চৌধুরী এমএলএ
	: ফণী মজুমদার এমপিএ [প্রয়াত]

দেশব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের শুভ সূচনা রণাঙ্গনের ১১টি সেক্টর

প্রকৃতপক্ষে ২৫ মার্চ থেকেই মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়ে যায়। এই মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক প্রেরণার কেন্দ্রবিন্দুতে যিনি, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মুজিবনগর বিপ্লবী সরকারের পরিচালনায় দেশব্যাপী শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ সমগ্র দেশকে এগারোটি সেক্টরে বিভক্ত করেন। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আক্রমণ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধ নিহত হন।

রণাঙ্গনের ১১টি সেক্টর

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ব্যাপক ও জোরদার করার উদ্দেশ্যে নির্বাসিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ রণাঙ্গনকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করেছিলেন। প্রতিটি সেক্টরে একজন করে অধিনায়ক নিযুক্ত করে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। তবে যুদ্ধের মৌলিক নীতি নির্ধারণ ও সার্বিক দায়িত্ব ছিল মুজিবনগর সরকারের। নিচে সেক্টরগুলোর নাম ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডারদের নাম দেয়া হলো।

এক নম্বর সেক্টর	: ১ মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-জুন)
চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম	: ২ মেজর মোহাম্মদ রফিক (জুন-ডিসেম্বর)
এবং ফেনী নদী পর্যন্ত	
দুই নম্বর সেক্টর	: ১ মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর)
নোয়াখালী জেলা, কুমিল্লা জেলার	
আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত	
এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশ	
তিন নম্বর সেক্টর	: ১ মেজর কে এম শফিউল্লাহ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর)
আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন থেকে	: ২ নুরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)
পূর্ব দিকের কুমিল্লা জেলা, সিলেট	
জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা এবং	
ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমা ও	
ঢাকা জেলার অংশবিশেষ	

চার নম্বর সেক্টর : ১ মেজর সি আর দত্ত
সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল,
খোয়াই, শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন
থেকে পূর্ব ও উত্তর দিকে
সিলেট-ডাউকি সড়ক

পাঁচ নম্বর সেক্টর : ১ মেজর মীর শওকত আলী
সিলেট জেলার পশ্চিম এলাকা।
এবং সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে
সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ সড়ক থেকে
ময়মনসিংহ জেলার সীমানা

ছয় নম্বর সেক্টর : ১ মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (আগস্ট পর্যন্ত)
সমগ্র কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা এবং : ২ মেজর এম এ মঞ্জুর (আগস্ট থেকে ডিসেম্বর)
ফরিদপুরের অংশবিশেষ ছাড়াও
দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত
খুলনা জেলার এলাকা

সাত নম্বর সেক্টর : ১ উইং কমান্ডার এম বাশার
ব্রহ্মপুত্র নদের তীরাঞ্চল ছাড়া
সমগ্র রংপুর জেলা ও দিনাজপুরের
ঠাকুরগাঁও

আট নম্বর সেক্টর : ১ মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (আগস্ট পর্যন্ত)
সমগ্র কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা এবং : ২ মেজর এম এ মঞ্জুর (আগস্ট থেকে ডিসেম্বর)
ফরিদপুরের অংশবিশেষ ছাড়াও
দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত
খুলনা জেলার এলাকা

নয় নম্বর সেক্টর : ১ মেজর এ জলিল (ডিসেম্বরের অর্ধেক পর্যন্ত)
সাতক্ষীরা-দৌলতপুর সড়কসহ : ২ মেজর এম এ মঞ্জুর (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
খুলনা সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল এবং
বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা

দশ নম্বর সেক্টর : মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিংপ্রাপ্ত নৌ-
অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ এবং কমান্ডাররা যখন যে সেক্টরে এ্যাকশন
সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা ছাড়াও করেছেন, তখন সেসব সেক্টর
চট্টগ্রাম মোতাবেক কাজ করেছে। কমান্ডারদের নির্দেশ
ও চালনা

এগারো নম্বর : ১ মেজর আবু তাহের (৩ রা নভেম্বর পর্যন্ত)
কিশোরগঞ্জ ছাড়া সমগ্র
ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল জেলা : ২ ফ্লাইট লে.এম হামিদুল্লাহ (স্বাধীনতা পর্যন্ত)

অতিরিক্ত টাঙ্গাইল সেক্টর : ১ স্বঘোষিত কমান্ডার কাদের সিদ্দিকী
টাঙ্গাইল জেলা ছাড়াও ময়মনসিংহ (মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এই বাহিনী
ও ঢাকা জেলার অংশ মুজিবনগর সরকারের আনুগত্য স্বীকার
করে। সদস্য সংখ্যা প্রায় পনেরো
হাজারের মতো এবং এ্যাকশন ও
লড়াইয়ের সংখ্যা প্রায় তিন শতাধিক)

বিমানবাহিনী প্রধান : গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার

ব্রিগেড আকারে তিনটি ফোর্স গঠন

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে আরো জোরদার করার জন্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের উদ্যোগে মুজিবনগর সরকার ১১টি সেক্টর ও টাঙ্গাইলের অতিরিক্ত সেক্টর ছাড়াও জুন মাস নাগাদ ব্রিগেড আকারে তিনটি ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে প্রধান সেনাপতি এম এ জি ওসমানী তিনটি ফোর্স গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মুক্তিবাহিনীর তিনজন শ্রেষ্ঠ সেক্টর কমান্ডারের নাম অনুসারে এই তিনটি ফোর্সের নামকরণ করা হয় 'জেড' ফোর্স, 'এন' ফোর্স এবং 'কে' ফোর্স। তিনজন কমান্ডার হচ্ছেন যথাক্রমে জিয়াউর রহমান, কে এম শফিউল্লাহ এবং খালেদ মোশারফ। নিম্নে এই তিনটি ফোর্সের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

নাম	অধিনায়কের নাম	দায়িত্বকাল
১ 'জেড' ফোর্স	: লে. কর্নেল জিয়াউর রহমান	জুলাই-ডিসেম্বর
২ 'এস' ফোর্স	: লে. কর্নেল কে এম শফিউল্লাহ	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর
৩ 'কে' ফোর্স	: ১ লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফ	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর
	২ নভেম্বর মাসে খালেদ মোশাররফ যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হলে মেজর আবু সালেক অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।	

হেডকোয়ার্টার
জেনারেল (অব.) এম এ জি ওসমানী (সশস্ত্র মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি)
এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকার, বীরউত্তম
মেজর জেনারেল আবদুর রব, বীরউত্তম (মরহুম)
মেজর জেনারেল (অব.) নুরুল ইসলাম
কর্নেল (অব.) এ টি এম সালাউদ্দিন, বীরপ্রতীক
উইং কমান্ডার শামসুল আলম, বীরউত্তম
লে. ক. (অব.) এম এ ওসমান চৌধুরী

লে. ক. এনামুল হক (মরহুম)
লে. ক. এম. আবদুল মালেক মোল্লা
স্কোয়াড্রন লিডার (অব.) বদরুল আলম, বীরউত্তম
মেজর ফজলুর রহমান
মেজর (অব.) ফাত্তাহ চৌধুরী ।
ফ্লা. লে. মতিউর রহমান, বীরশ্রেষ্ঠ (শহীদ)
মেজর শামসুল আলম, বীরপ্রতীক
ক্যাপ্টেন এস মঈনুদ্দিন আহমদ, বীরপ্রতীক
লে. শেখ কামাল ('৭৫-এর সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত)

এক নম্বর সেক্টর ও 'জেড' ফোর্স

লে. জে. জিয়াউর রহমান, বীরউত্তম, পিএসসি, ফোর্স কমান্ডার, জেড ফোর্সের অধিনায়ক ('৮১-তে চট্টগ্রামে বিদ্রোহী সামরিক অফিসারদের হাতে নিহত)
ব্রিগেডিয়ার মহসীনউদ্দীন আহমদ, বীরবিক্রম, পিএসসি, (প্রাক্তন ১ নম্বর সেক্টর) ('৮১-তে সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড)
ব্রিগেডিয়ার (অব.) এ জে এম আমিনুল হক, বীরউত্তম (প্রাক্তন ২ নম্বর সেক্টর)
কর্নেল (অব.) সাফায়াত জামিল, বীরবিক্রম (প্রাক্তন ১ নম্বর সেক্টর)
কর্নেল (অব.) আনোয়ার হোসেন, বীরপ্রতীক
কর্নেল (অব.) অলি আহমদ, বীরবিক্রম (প্রাক্তন ১ নম্বর সেক্টর)
কর্নেল আমিন আহমদ চৌধুরী, বীরবিক্রম, পিএসসি
কর্নেল (অব.) বি জি পাটোয়ারী, বীরপ্রতীক, পিএসসি
লে. কর্নেল মাহবুবুল আলম, বীরপ্রতীক
লে. কর্নেল (অব.) মোদাচ্ছের হোসেন খান, বীরপ্রতীক ।
লে. কর্নেল এস এম ফজলে হোসেন
লে. কর্নেল সাদেক হোসেন
লে. কর্নেল এস আই এম বি নূরুন্নবী খান, বীরবিক্রম (চাকরিচ্যুত)
লে. কর্নেল (অব.) এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী, বীরবিক্রম
লে. কর্নেল আবদুল হালিম
লে. কর্নেল এম জিয়াউদ্দীন, বীরউত্তম (রিলিজড)
মেজর (অব.) এ কাইউম চৌধুরী
মেজর (অব.) আনিসুর রহমান
মেজর (অব.) সৈয়দ মনিবুর রহমান
মেজর (অব.) মনজুর আহমদ, বীরপ্রতীক
মেজর ওয়ালিউল ইসলাম, বীরপ্রতীক (প্রাক্তন ১ নম্বর সেক্টর)
মেজর হাফিজ উদ্দিন, বীরবিক্রম
স্কোয়াড্রন লিডার (অব.) লিয়াকত, বীরউত্তম

মেজর (অব.) ওয়াকার হাসান, বীরপ্রতীক
ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমান, বীরউত্তম (শহীদ)
ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন মমতাজ, বীরউত্তম (শহীদ)
লে. রফিক আহমদ সরকার (শহীদ)
লে. ইমদাদুল হক, বীরউত্তম (শহীদ)
মেজর (অব.) রফিক-উল-ইসলাম, বীরউত্তম, সেক্টর কমান্ডার
মেজর জেনারেল শামসুল হক, এএমসি পরে হেডকোয়ার্টার বিডিএফ
ব্রিগেডিয়ার হারুন আহমেদ চৌধুরী, বীরউত্তম
লে. (অব.) খুরশিদউদ্দিন আহমেদ
লে. ক. আবু ইউসুফ মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, বীরবিক্রম, পিএসসি (১৯৮১তে সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড)
এয়ার কমডোর সুলতান মাহমুদ, বীরউত্তম, পিএসসি (পরে হেডকোয়ার্টার বিডিএফ)
উইং কমান্ডার শাখাওয়াত হোসেন
মেজর (অব.) এনামুল হক
মেজর (অব.) শমসের মবিন চৌধুরী, বীরবিক্রম
মেজর (অব.) কামরুল ইসলাম
মেজর লতিফুল আলম চৌধুরী
মেজর শওকত আলী, বীরপ্রতীক (চাকরিচ্যুত)
মেজর ফজলুর রহমান
মেজর রকিবুল ইসলাম
ক্যাপ্টেন আফতাব কাদের, বীরউত্তম (শহীদ)
ক্যাপ্টেন শামসুল হুদা (মৃত)
ক্যাপ্টেন মনসুরুল আমিন (চাকরিচ্যুত)

সেক্টর নম্বর ২ এবং 'কে' ফোর্স

মে. জে. খালেদ মোশাররফ, বীরউত্তম, সেক্টর কমান্ডার ('কে' ফোর্সের অধিনায়ক)
ব্রিগেডিয়ার (অব.) এম এ মতিন, বীরপ্রতীক
কর্নেল আনোয়ারুল আলম
কর্নেল (অব.) শওকত আলী
কর্নেল আইনুদ্দিন, বীরপ্রতীক
কর্নেল এম আশরাফ হোসেন, পিএসসি
লে. ক. গাফ্‌ফার, বীরউত্তম (অব.)
লে. কর্নেল (অব.) বাহার
লে. কর্নেল এ টি এম হায়দার ('৭৫-এর সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত)
লে. ক. মাহবুবুর রহমান, বীরউত্তম ('৮১-তে সামরিক বিদ্রোহে নিহত)
লে. ক. হারুনুর রশীদ, বীরপ্রতীক

লে. ক. ফজলুল কবীর
লে. ক. ফজলুল কবীর, বীরপ্রতীক
লে. ক. ফজলুল কবীর
লে. ক. (অব.) আকবার হোসেন, বীরপ্রতীক
লে. ক. (অব.) জাফর ইমাম, বীরবিক্রম
লে. ক. দিদারুল আলম, বীরপ্রতীক (চাকরিচ্যুত)
লে. ক. শহীদুল ইসলাম, বীরপ্রতীক
লে. ক. এ টি এম আবদুল ওয়াহাব, পিএসসি
লে. ক. (অব.) মোখলেছুর রহমান
লে. ক. মোস্তফা কামাল
লে. ক. (অব.) জয়নুল আবেদীন
মেজর মালেক
মেজর সালেক চৌধুরী, বীরউত্তম (মরহুম)
মেজর (অব.) এ আজীজ পাশা
মেজর (অব.) বজলুল হুদা
মেজর (অব.) দিদার আনোয়ার হোসেন।
মেজর সৈয়দ মিজানুর রহমান (চাকরিচ্যুত)
মেজর (অব.) হাশমী মোস্তফা কামাল
মেজর জামিলউদ্দীন এহসান, বীরপ্রতীক
মেজর জিল্লুর রহমান
ক্যাপ্টেন (অব.) হুমায়ুন কবীর, বীরপ্রতীক
ক্যাপ্টেন (অব.) আখতার, বীরপ্রতীক
ক্যাপ্টেন (অব.) সেতারা বেগম, বীরপ্রতীক
ক্যাপ্টেন (অব.) মমতাজ হাসান, বীরপ্রতীক
লে. (অব.) শাহরিয়ার হুদা
লে. আজিজুল ইসলাম, বীরবিক্রম (শহীদ)

সেক্টর নম্বর ৩ এবং 'এস' ফোর্স
মেজর জেনারেল (অব.) কে এম শফিউল্লাহ, বীরউত্তম, পিএসসি, সেক্টর কমান্ডার (পরবর্তীকালে এস ফোর্সের অধিনায়ক)
ব্রিগেডিয়ার (অব.) নূরুজ্জামান, বীরউত্তম
মেজর জেনারেল মঈনুল হোসেন চৌধুরী, বীরবিক্রম
ব্রিগেডিয়ার এ এস এম নাসিম, বীরবিক্রম, পিএসসি
কর্নেল আবদুল মতিন, বীরপ্রতীক, পিএসসি
কর্নেল মতিউর রহমান, বীরপ্রতীক

কর্নেল সুবেদ আলী ভুঁইয়া, পিএসসি
কর্নেল আজিজুর রহমান, বীরউত্তম, পিএসসি
লে. ক. গোলাম হেলাল মোর্শেদ খান, বীরবিক্রম, পিএসসি
লে. কর্নেল এজাজ আহমেদ চৌধুরী
লে. ক. ইব্রাহিম, বীরপ্রতীক
লে. ক. (অব.) আবদুল মান্নান, বীরবিক্রম
মেজর মনসুর আমিন মজুমদার
মেজর আবুল হোসেন
মেজর শামসুল হুদা বাচ্চু
মেজর নজরুল ইসলাম, বীরপ্রতীক
মেজর (অব.) নাসিরুদ্দিন
মেজর কামাল
মেজর সাঈদ আহমেদ, বীরপ্রতীক
মেজর সৈয়দ আবু সাদেক
ক্যাপ্টেন মঈন
ক্যাপ্টেন আহমদ আলী
লে. (অব.) আনিস হাসান
লে. কবিরুদ্দিন (চাকরিচ্যুত)
লে. সেলিম হাসান (শহীদ)

সেক্টর নম্বর ৪
মেজর জেনারেল (রিলিজড) সি আর দত্ত, বীরউত্তম, সেক্টর কমান্ডার
কর্নেল আবদুর রব, পিএসসি
লে. ক. (অব.) শরিফুল হক ডালিম, বীরউত্তম
স্কোয়াড্রন লিডার (অব.) কাদের
লে. ক. (অব.) খায়রুল আলম
লে. ক. (অব.) এ এম রশিদ চৌধুরী, বীরপ্রতীক
লে. ক. (অব.) সাজ্জাদ আলী জহির, বীরপ্রতীক
লে. ক. (অব.) এ এম হেলালুদ্দিন, পিএসসি
মেজর (অব.) আব্দুর জলিল
মেজর (অব.) নিরঞ্জন ভট্টাচার্য (অব.)
মেজর (অব.) জহুরুল হক, বীরপ্রতীক
মেজর ওয়ারলউজ্জামান
লে. আতাউর রহমান

সেক্টর নম্বর ৫

লে. জে. (অব.) মীর শওকত আলী, বীরউত্তম, পিএসসি, সেক্টর কমান্ডার
মেজর (অব.) মোসলেমউদ্দীন
মেজর তাহেরুদ্দিন আখুঞ্জি
মেজর এস এম খালেদ (চাকরিচ্যুত)
মেজর আবদুর রউফ, বীরবিক্রম
মেজর মাহবুবুর রহমান
ক্যাপ্টেন হেলাল

সেক্টর নম্বর ৬

এয়ার ভাইস মার্শাল এম কে বাশার, বীরউত্তম (বোমারু বিমান দুর্ঘটনায় নিহত)
এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) সদরুদ্দিন, বীরপ্রতীক
কর্নেল নওয়াজেসউদ্দিন, পিএসসি ('৮১-তে সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড)
লে. ক. নজরুল হক, বীরপ্রতীক
লে. ক. (অব.) সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান
লে. ক. মতিউর রহমান, বীরবিক্রম, পিএসসি (মরহুম)
মেজর মোহাম্মদ আবদুল্লাহ,
মেজর মাসুদুর রহমান, বীরপ্রতীক
মেজর মেজবাহউদ্দিন আহমেদ, বীরবিক্রম
মেজর আবদুল মতিন
লে. সামাদ, বীরউত্তম (শহীদ)
ফ্ল. লে. ইকবাল

সেক্টর নম্বর ৭

লে. কর্নেল (অব.) কাজী নুরুজ্জামান, বীরউত্তম, সেক্টর কমান্ডার
ব্রিগেডিয়ার (অব.) গিয়াসউদ্দিন চৌধুর, বীরবিক্রম, পিএসসি
কর্নেল এম আবদুর রশিদ, বীরপ্রতীক, পিএসসি ('৮১-তে সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড)
মেজর নাজমুল হক (মরহুম)
মেজর বজলুর রশিদ (চাকরিচ্যুত)
মেজর আবদুল কাইয়ুম খান (চাকরিচ্যুত)
মেজর (অব.) এ মতিন চৌধুরী
মেজর আমিনুল ইসলাম
মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম
মেজর (অব.) আউয়াল চৌধুরী
ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, বীরশ্রেষ্ঠ (শহীদ)
ক্যাপ্টেন (অব.) কায়সার হক
ক্যাপ্টেন (অব.) ইদ্রিস

সেক্টর নম্বর ৮

মেজর জেনারেল এম এ মঞ্জুর, বীরউত্তম, পিএসসি, সেক্টর কমান্ডার ('৮১-তে সামরিক বিদ্রোহ ঘটাতে গিয়ে নিহত)
ব্রিগেডিয়ার শামসুদ্দিন আহমেদ
কর্নেল এস হুদা, বীরবিক্রম (মরহুম)
লে. কর্নেল এ আর আজম চৌধুরী, বীরপ্রতীক
লে. কর্নেল মুস্তাফিজুর রহমান, বীরবিক্রম
মেজর এন শফিউল্লাহ, বীরবিক্রম
মেজর অলিক কুমার গুপ্ত, বীরপ্রতীক
মেজর ফজলুর রহমান
মেজর মুজিবুর রহমান
স্কোয়াড্রন লিডার ইকবাল রশীদ
মেজর (অব.) মোহাম্মদ মোস্তাফা
মেজর রওশন ইয়াজদানী, বীরপ্রতীক ('৮১-তে সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড)
ফ্ল. লে. জামালুদ্দিন চৌধুরী
ক্যাপ্টেন তৌফিক-ই-এলাহি চৌধুরী
ক্যাপ্টেন আবদুল ওয়াহাব
ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম

সেক্টর নম্বর ৯

মেজর (অব.) এম এ জলিল, সেক্টর কমান্ডার
মেজর জিয়াউদ্দিন (চাকরিচ্যুত)
মেজর (অব.) শাহজাহান, বীরউত্তম
মেজর (অব.) মেহেদী আলী ইমাম, বীরবিক্রম
মেজর আহসানউল্লাহ (চাকরিচ্যুত)
ক্যাপ্টেন (অব.) শচীন কর্মকার
মেজর সৈয়দ কামালুদ্দীন
মেজর সৈয়দ (অব.) নুরুল হুদা

সেক্টর নম্বর ১০

এই সেক্টরের দায়িত্ব ছিল হেডকোয়ার্টারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে একটা নৌ কমান্ডো বাহিনী সংগঠিত করা।

সেক্টর নম্বর ১১

কর্নেল এম আবু তাহের, বীরউত্তম, সেক্টর কমান্ডার (সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড)
লে. ক. আবদুল আজিজ, পিএসসি

উইং কমান্ডার (অব.) হামিদুল্লাহ, বীরপ্রতীক
মেজর নূরুন নবী
মেজর তাহের আহমেদ, বীরপ্রতীক
মেজর (অব.) মো. আসাদুজ্জামান
মেজর (অব.) মাহবুবুর রহমান
মেজর গিয়াস আহমেদ ('৮১-তে সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড)
মেজর মইনুল ইসলাম (চাকরিচ্যুত)

মুজিবনগরে গঠিত সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান মওলানা ভাসানী

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

তাজউদ্দীন আহমদ

১৯৭১-এর ৭ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে পাকিস্তান সরকার

১৯৭১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানের ফায়জালাবাদ জেলে বঙ্গবন্ধুর প্রহসনাত্মক গোপন বিচার করে তাঁকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে এবং মৃত্যুদণ্ড দেয়। এই সংবাদে শুধু বাংলাদেশের জনগণই উত্তাল হয়ে ওঠেনি, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ এবং রাষ্ট্রপ্রধানরা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ভারতসহ বিভিন্ন দেশ বঙ্গবন্ধুর জীবনের নিরাপত্তার দাবি জানায়। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। তিনি বাংলাদেশের স্থপতি। কাজেই পাকিস্তানের কোনো অধিকার নেই তাঁকে বন্দি করে রাখার। কেননা ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ বহু রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক চাপে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদণ্ড দেয়ার সাহস করেনি। তবে ২৫ মার্চ ১৯৭১ থেকে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত তাঁকে জেলখানায় আটক রাখে। তাঁকে এই দশ মাস এমনভাবে রাখা হয়েছিল যে, কোনো মানুষ তো দূরের কথা, গণমাধ্যমের কোনো প্রতিনিধিও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। এদিকে দেশবাসী পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ। সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা অসংখ্য নিরীহ মানুষকে যেমন হত্যা করছে তেমনি প্রতিদিনই মা-বোনদের ইজ্জত-সম্মান লুণ্ঠন করছে। এই অবস্থায় একটা ভয়ংকর মানসিক উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে বঙ্গবন্ধু জেলের ভেতর এই দশ মাস কাটিয়েছিলেন।

মার্চ মাস থেকে সমগ্র বাংলাদেশজুড়ে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ এবং হত্যালীলা চলতেই থাকে। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ সেদিন প্রাণ বাঁচাতে পার্শ্ববর্তী ভারতীয় রাজ্যগুলিতে আশ্রয় নেন। ভারত সরকার অসহায়, নিরুপায় শরণার্থীদের পাশে এসে দাঁড়ায় সব রকম সহযোগিতা নিয়ে। একইসঙ্গে বাংলাদেশে চলছিল দখলদার বাহিনীর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও মদতে সৃষ্ট রাজাকারদের বেপরোয়া ও নৃশংস কার্যকলাপ। এদিকে গত কয়েক মাস ধরে মুক্তিযোদ্ধারাও গেরিলা কায়দায় হানাদার বাহিনীর উপর হামলা অব্যাহত রাখে জীবনকে বাজি রাখে। প্রতি মাসেই

অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা নিহত হতে থাকেন। তাঁদের মৃতদেহগুলি পবিত্রভাবে কবরস্থ করাও সম্ভব হয়নি। প্রিয়জনের বিয়োগব্যথায় সমগ্র বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে গিয়েছিল।

এইভাবেই অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় আগস্ট মাস। এদিকে ১৯৭১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আব্দুস সাত্তার একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে বললেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের ৭৮টি জাতীয় পরিষদ ও ১০৫টি প্রাদেশিক পরিষদের জন্য যথাক্রমে ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই সময় দেশ-বিদেশের হাজার হাজার সাংবাদিক এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবর্গ তখন বাংলাদেশে। তাঁরাও জীবনের বাজি রেখে তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করেছেন। অসংখ্য সাংবাদিক সরকারি রণাঙ্গনেই দিন কাটিয়েছেন। বেশ কিছু সাংবাদিকের মৃত্যুও হয়েছে।

এদিকে ১৯৭১ সালের ৩ আগস্ট প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান টেলিভিশনে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, বে-আইনি ঘোষিত আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার করা হবে। কেননা তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ। ৯ আগস্ট এক সরকারি প্রেস নোটে ঘোষণা করা হয় যে, আগামী ১১ আগস্ট থেকে শেখ মুজিবুরের বিচার শুরু হবে। ৩১ আগস্ট জাতিসংঘে পাকিস্তানি প্রতিনিধি জনাব আগা শাহী জানান যে, আগামী দু' সপ্তাহের মধ্যে এই বিচার সমাপ্ত হবে।

এইরকম পরিস্থিতির মধ্যেই ভারতের তৎকালীন অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রেরিত এক বাণীতে বিশ্বের সকল দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবি জানিয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের উপর চাপ সৃষ্টির আহ্বান জানালেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই বিবৃতি এবং আহ্বান ইয়াহিয়া খানকে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।

১৯৭১ সালের ১৭ আগস্ট। জাতিসংঘের জেনেভাস্থিত আন্তর্জাতিক আইন সমিতির পক্ষ থেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিকট একটি তারবার্তায় অবিলম্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জেল থেকে মুক্ত করে পরিস্থিতির রাজনৈতিক সমাধানের আহ্বান জানানো হয়। ২০ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবি জানানো হয় বিশ্বশান্তি কাউন্সিল থেকে।

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১। কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি সমিতির বৈঠক থেকে শেখ মুজিবুরের মুক্তির দাবি করা হয়। ঐ বৈঠকে ব্রিটেনের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. আর্থার বটমলি তাঁর ভাষণে ক্ষোভ

প্রকাশ করে বললেন, একমাত্র শেখ মুজিবুরের সঙ্গে আলোচনাই সমস্যার সমাধান করতে পারে। সে জন্য মুজিবুরকে মুক্তি দেয়া জরুরি।

এদিকে জেনারেল ইয়াহিয়া ১৯৭১ সালের ২ আগস্ট তারিখে বি.বি.সি.র সাথে এক সাক্ষাৎকারে বললেন, 'পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্ত বরাবর সংঘর্ষ অব্যাহত থাকলে তা ভয়াবহ যুদ্ধে পরিণত হতে পারে। আমি আমার সৈন্যবাহিনীকে পড়ে পড়ে মার খেতে বলতে পারি না। আমার দেশকে রক্ষার প্রশ্ন যেখানে জড়িত সেখানে আমি জোয়ানদের আর একটা গাল পেতে দিতে বলতে পারি না। আমি কিন্তু পাল্টা আঘাত হানবো।"

১৯৭১ সালের ১১ আগস্ট। মার্কিন টেলিভিশন সংস্থা সি. বি. এস.-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বললেন যে, "দুটো দেশই এখন যুদ্ধের খুবই কাছাকাছি এসে পড়েছে। আমি হুশিয়ার করে দিতে চাই যে, পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য আমরা যুদ্ধ করবো।"

১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্যারিসের প্রখ্যাত 'লা ফিগারো' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বললেন—"অনেক ধৈর্যসহকারে আমি সব কিছু লক্ষ্য করছি। আমি সমগ্র বিশ্বকে এই মর্মে হুশিয়ার করে দিতে চাই, ভারত যদি মনে করে থাকে যে, বিনা যুদ্ধে তারা আমার এক বিন্দু জমি দখল করতে পারবে, তবে তারা মারাত্মক ভুল করছে। এর অর্থই হবে সর্বাত্মক যুদ্ধ। অবশ্য আমি যুদ্ধকে ঘৃণা করি। কিন্তু আমার মাতৃভূমি রক্ষার জন্য এ ব্যাপারে আমি পিছপা হবো না।"

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ ইউসুফ জং পত্রিকায় বললেন—

"আমাদের সৈন্যবাহিনী এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং একটা যুদ্ধের জন্য আমাদের এখন কোনো নোটিশের প্রয়োজন নেই।"

৭ অক্টোবর, ১৯৭১। পূর্ব পকিস্তানের ইস্টার্ন কমান্ডার এবং সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজী পাকিস্তান টাইমস পত্রিকায় ঘোষণা করলেন যে, "যদি ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ লাগাতে চায় তাহলে সে যুদ্ধ ভারতের মাটিতে হবে।"

বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য বিশ্বব্যাপী বুদ্ধিজীবীদের চাপ

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষের দিক থেকেই বাংলাদেশের নিরীহ জনসাধারণের উপর নির্যাতন, দমন-পীড়ন, অমানবিক অত্যাচার শুরু হয়ে যায়। নিষ্ঠুর এই হত্যালীলা, ধর্ষণ ইত্যাদি চলতে থাকে একেবারে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। পাকিস্তান সরকারের সেনাবাহিনী এই নয় মাস ধরে বলা চলে বিশ্বের নিকৃষ্টতম হত্যালীলা, নির্যাতন, অত্যাচার চালাতে থাকে বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনগণের উপর। এই বর্বরোচিত ঘটনাবলি ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বব্যাপী। বিভিন্ন দেশের প্রতিবাদী সাধারণ মানুষই নয়, বুদ্ধিজীবী সমাজও এই সমস্ত নারকীয় ঘটনাবলির প্রতিবাদে সোচ্চার হন। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় কয়েকশো অধ্যাপক এবং সৃজনশীল মানুষ এক বিবৃতিতে এর প্রতিবাদ করেন এবং পাকিস্তানের সরকার তথা সামরিক কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দেওয়ার জন্য তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সনের কাছে দাবি জানান। এই সমস্ত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত মনীষী পল স্যামুয়েলসন, সালভাদর লুরিয়া এবং সাইমন কুজনেটজ প্রমুখ। তাঁরা তাদের বিবৃতিতে বলেন—

"পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধ এবং পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধের হুমকির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর বিরাট দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরে স্বায়ত্তশাসনের দাবিদার বলে পরিচিত একটা রাজনৈতিক দলের পক্ষে মাত্র কয়েক মাস আগে জনসাধারণ অভাবনীয় সমর্থন দেয়ায় তারা নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছে। সামরিক সরকার জনগণের এই রায় মেনে নিতে পারেনি। গত মার্চ মাসে পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী পূর্ব বাংলার জনসাধারণের ওপর ব্যাপকভাবে হামলা চালিয়েছে। তিন লাখের মতো হত্যা করা হয়েছে। প্রায় নব্বই লাখ বাঙালি শরণার্থী এর মধ্যেই সীমান্তের ওপারে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে এবং এখনও প্রতিদিন প্রায় ৩০ হাজার শরণার্থী সীমান্ত অতিক্রম করছে। পশ্চিম পাকিস্তানি হামলার জের হিসাবে ভারত সরকারকে এ ধরনের একটা সমস্যার মোকাবেলা করতে হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ায় এখন পশ্চিম পাকিস্তানই শান্তির প্রতি হুমকি হওয়া ছাড়াও যুদ্ধ বাধাতে চাচ্ছে। এতে শুধু ভারত ও পাকিস্তান জড়িত হবে, তাই-ই নয়; চীন, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও জড়িত হয়ে পড়বে।

বিবৃতিতে আরো বলা হয় যে—

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে পাকিস্তানের সামরিক মিত্র এবং যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্বের প্রতি সমর্থনের নীতি গ্রহণ করেছে। আমরা মার্কিনিরাই পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান করছি। সামরিক সাহায্য বন্ধ ঘোষণা করা সত্ত্বেও আমরা পাকিস্তানকে তা প্রদান অব্যাহত রেখেছি। এর সপক্ষে এ মর্মে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, সামরিক সাহায্য প্রদান অব্যাহত রেখে পাকিস্তানের ওপর প্রভাব খাটানো সম্ভব হবে এবং তা শান্তি রক্ষায় অপরিহার্য। কিন্তু এই নীতি ভারত ছাড়াও বাংলাদেশের জনগণকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। উপরন্তু এর ফলে পাকিস্তানি সরকারকে ভয়াবহ পথ পরিহার করে একটা রাজনৈতিক সমাধানে সম্মত হওয়ার জন্য প্রভাব বিস্তারে এই নীতি ব্যর্থ হয়েছে। এ ধরনের একটা নীতি গ্রহণের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন একটা সরকারের সমর্থক হয়ে পড়েছে, যে সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে জাতীয়ভিত্তিক একটা নির্বাচনের রায়কে অস্বীকার করেছে আর পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে প্রত্যাখ্যান করেছে। উপরন্তু এরা নিরস্ত্র জনসাধারণকে নির্বিচারে হত্যা করছে। আমাদের জাতীয় স্বার্থের খাতিরে যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের নীতির যথার্থতা প্রমাণ করা যায় না। পাকিস্তানের একনায়কত্বসুলভ সরকার সেখানে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার বিরুদ্ধে নৃশংস ও ভয়াবহ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং যা কোন সময়েই জয়যুক্ত হবে না, তা সমর্থন করা নিশ্চিতভাবে বোকামির পরিচয়। ন্যায়বিচার, মানবতা এবং জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করলে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে তার নীতির পরিবর্তনের যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে।

আমরা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলো উপস্থাপন করছি—

১. পূর্ব বাংলার নির্বাচিত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সঙ্গে একটা রাজনৈতিক মীমাংসায় না আসা পর্যন্ত পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য অথবা অর্থনৈতিক সহযোগিতা যুক্তরাষ্ট্র প্রদান করবে না এবং পাইপ লাইনের সাহায্য বন্ধ করবে এবং দেনা পরিশোধের কিস্তি আপাতত স্থগিত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করবে।

২. পাকিস্তানকে দেয়া এ ধরনের সমস্ত সাহায্য ভারতে অবস্থানকারী পূর্ব বাংলার শরণার্থীদের দেয়া হবে। যত দিন পর্যন্ত এসব শরণার্থী দেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না, তত দিন পর্যন্ত এই সাহায্য প্রদান অব্যাহত থাকবে এবং শরণার্থীদের বাবদ ভারতকে প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. জাতিসংঘের উদ্যোগে পূর্ব বাংলার জনসাধারণের জন্য অর্থনৈতিক সাহায্য বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হোক।

৪. পাকিস্তানকে এ মর্মে অবহিত করা হোক, পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের মতো যুক্তরাষ্ট্র এবার ভারতের প্রতি সাহায্য প্রদান স্থগিত রাখবে না।

৫. মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ, বিশেষত ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ইরান ও তুরস্ককে এ মর্মে আভাস দেয়া হোক যে, পূর্ব বাংলার আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একটা রাজনৈতিক সমাধানে আসার জন্য পাকিস্তানকে উৎসাহিত করলে যুক্তরাষ্ট্র তা অভিনন্দিত করবে।

শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুদ্ধিজীবী সমাজই নন, কানাডার বুদ্ধিজীবী এবং সৃজনশীল সমাজও বাংলাদেশের উপর পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর নারকীয় অত্যাচারের প্রতিবাদে সোচ্চার হন। কানাডার টরেন্টো নগরীতে আয়োজিত বুদ্ধিজীবীদের এক অন্তর্জাতিক সমাবেশ থেকে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের প্রতি পাঁচ দফা দাবি জানানো হয়। এই দাবিগুলি হলো—

১. পাকিস্তানকে দেয় সমস্ত সমরাস্ত্র বন্ধ ঘোষণা।

২. পাকিস্তানকে দেয় সমস্ত অর্থনৈতিক সহযোগিতা বন্ধ ঘোষণা।

৩. জরুরি অবস্থা বিধায় সম্ভাব্য সকল সাহায্য সংগ্রহ করে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে পূর্ব বাংলার অভ্যন্তরে দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা।

৪. শরণার্থীদের ভরণ-পোষণের জন্য ভারতকে প্রয়োজনীয় রিলিফ প্রদানের ব্যবস্থা।

৫. শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন রক্ষার জন্য হস্তক্ষেপ করা।

টরেন্টো সম্মেলন থেকে যে বিবৃতিটি প্রকাশ করা হয় তাতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছিল—

"আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তান সরকারকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সমরাস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখার নিক্সন সরকারের নীতির তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি। এই সাহায্য দক্ষিণ এশিয়ায় আরো সংঘর্ষের পরিপূরক হিসেব কাজ করছে। এই নীতি মার্কিনি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এবং বিশ্ববিবেকের নৈতিকতা বিরোধী।"

এই ঘোষণায় যাঁরা স্বাক্ষর দান করেন তাদের মধ্যে জাতিসংঘের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল হিউ কিননে সাইড, ব্রিটেনের প্রাক্তন মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য মিসেস জুডিথ হার্ট, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য মিসেস বার্নাড ব্রেইন, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টাবলি উলপোর্ট, চীনে কানাডার

প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত চেস্টার রোনিং, আন্তর্জাতিক ধর্মীয় শান্তি সংস্থার সেক্রেটারি হোমার জ্যাক ও আন্তর্জাতক জুরিস্ট কমিশনের জেটি থরসন। এছাড়া বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এম আর সিদ্দিকী (প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ও প্রাক্তন মন্ত্রী) ও এ এম এ মুহিত (প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী) এবং ভারতের পক্ষ থেকে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক নূরুল হাসান ও টাইমস অব ইন্ডিয়ার বোম্বের আবাসিক সম্পাদক অজিত ভট্টাচার্য সম্মেলনে যোগ দেন।

কিন্তু তখনো পর্যন্ত কোনোরকম চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না পাকিস্তান সরকার। তার প্রমাণ হলো ২৫ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া এক সাংবাদিক সম্মেলনের ঘোষণা করলেন।

"আগামী দশ দিনের মধ্যে আমি রাওয়ালপিন্ডিতে থাকতে পারি। আমি রণক্ষেত্রে একটা যুদ্ধ পরিচালনা করব।"

তাঁর এই ঘোষণা যে পরিকল্পিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল এই ঘোষণার পরবর্তী কয়েক দিনের ঘটনাবলিতে। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিমানবাহিনী একই সঙ্গে ভারতের বেশ কয়েকটি জায়গায় বোমাবর্ষণ করে। স্থানগুলি হলো অমৃতসর, পাঠানফোর্ট, শ্রীনগর, অবন্তীপুর, উত্তরালই সোধপুর, আম্বালা, আগ্রার বিমান ঘাঁটি ইত্যাদি।

ঐ দিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পূর্ব কর্মসূচি অনুযায়ী ছিলেন কলকাতাতে। তিনি দ্রুত দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেই মন্ত্রিসভার বৈঠক আহ্বান করেন এবং এর পরেই ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন। জরুরি অবস্থা জারির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে তিনি রাতেই জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ দেন। রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ ভারতীয় বিমান বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়েছিল।

১৯৭১-এর ৪ ডিসেম্বর : ইন্দিরা গান্ধীকে পত্র দিল বাংলাদেশ সরকার

দেশের এই ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যেই ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর মুজিবনগরের বিপ্লবী সরকার একটি জরুরি পত্র লিখলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে। পত্রটিতে স্বাক্ষর করলেন মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। ঐ পত্রে তাঁরা স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দান করার জন্য দাবি করেছিলেন। চিঠিতে তাঁরা বলেছিলেন–

"মহামান্য,

আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানতে পেরেছি যে, ৩রা ডিসেম্বরের অপরাহ্নে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা আপনার দেশের বিরুদ্ধে নগ্নভাবে হামলা চালিয়েছে। ইয়াহিয়া খানের এই সর্বশেষ পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক বিধি নিষেধ বেপরোয়াভাবে অমান্য করার পরিচয় বহন করছে এবং চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করছে যে, ইয়াহিয়া খান এই উপমহাদেশের রাষ্ট্রগুলোতে উত্তেজনা, ধ্বংসযজ্ঞ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টিতে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশের জনসাধারণ পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের এই ধরনের মনোবৃত্তির ব্যাপারে সজাগ এবং প্রায় নয় মাস পূর্বে নিজেদের স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করেছে। ঘটনার বাস্তবতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান করে আমরা গত ১৫ই অক্টোবর এবং ২৩শে নভেম্বর আপনাকে পত্র মারফত জানিয়েছি। আমরা পরিষ্কার ভাষায় আপনাকে অবহিত করেছি যে, হানাদার বাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে। এক্ষণে ইয়াহিয়া খান ও তাঁর সমরনায়করা যেভাবে আপনার দেশের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে তাতে এই আগ্রাসনকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে ভারত ও বাংলাদেশের জনসাধারণের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশিভাবে দেখা দিয়েছে। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা করা এবং এ ধরনের অন্যান্য মূল্যবোধকে অর্জন করার উদ্দেশ্য দু'দেশের মধ্যে যে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তার জন্য আমরা সম্মিলিতভাবে লড়াই করতে প্রস্তুত।

জনাব প্রধানমন্ত্রী, আপনাকে জানতে চাই যে, ৩রা ডিসেম্বর তারিখে আপনার দেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সরাসরি আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে আমাদের

মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের যে কোন সেক্টরে অথবা ফ্রন্টে হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত ও জোরদার করতে প্রস্তুত রয়েছে। তাই আমরা যদি আনুষ্ঠানিকভাবে পারস্পরিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি, তাহলে পাকিস্তানের সামরিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আমাদের সম্মিলিত প্রতিরোধ ব্যাপ্তি লাভ করবে। এই প্রেক্ষাপটে আমরা আপনাদের সমীপে পুনরায় অনুরোধ করতে চাই যে, ভারত সরকার অবিলম্বে আমাদের দেশ ও সরকারকে স্বীকৃতি দান করুক। এই উপলক্ষে আমরা আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে চাই যে, উভয় দেশের এই ভয়াবহ বিপদের সময় বাংলাদেশের সরকার ও জনগণ আপনাদের সঙ্গে রয়েছে। আমাদের আন্তরিক আশা রয়েছে যে, আমাদের যৌথ প্রতিরোধের ফলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের হীন পরিকল্পনা ও জঘন্য ইচ্ছা ব্যর্থ হতে বাধ্য এবং আমরা সফল হবো।

আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আপনাদের ন্যায়-নিষ্ঠা সংগ্রামের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি।

আপনাদের প্রতি সহযোগিতার পুনরুল্লেখ করছি।

এই চিঠি পাওয়ার এক দিন পর অর্থাৎ ৬ ডিসেম্বরই ভারতের প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় জনাব তাজউদ্দীন আহমদকে চিঠির উত্তর দিয়ে বললেন যে, মুজিবনগর সরকারকে ভারত স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে।

১৯৭১-এর ৬ ডিসেম্বর : বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর পত্র

১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর মুজিবনগরের বিপ্লবী সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের দাবি জানিয়ে ভারতের তৎকালীন জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে যে পত্র দিয়েছিল, সেই পত্র পাওয়ার এক দিনের মধ্যেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ সাহেবকে লেখা চিঠিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের যথার্থ উল্লেখ করেছেন। চিঠিটি ছিল নিম্নরূপ–

"প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে মাননীয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং আপনি যে বাণী আমার কাছে পাঠিয়েছেন, তাতে আমার সহকর্মীবৃন্দ ও আমি খুবই অভিভূত হয়েছি। পত্র পাওয়ার পর আপনাদের সাফল্যজনক নেতৃত্বে পরিচালিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদান সংক্রান্ত আপনাদের অনুরোধ ভারত সরকার পুনরায় বিবেচনা করেছে। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, বর্তমানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার প্রেক্ষাপটে ভারত সরকার আপনাদের স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আজ সকালে আমি পার্লামেন্টে এ ব্যাপারে একটা বিবৃতি দান করেছি। তার অনুলিপি এতদসঙ্গে পাঠালাম।

বাংলাদেশের জনসাধারণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কাল যাপন করছে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য আপনাদের যুব সম্প্রদায় নিঃস্বার্থভাবে আত্মাহুতির মাধ্যমে এক মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। ভারতের জনসাধারণও একই মূল্যবোধকে রক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি সন্দেহাতীতভাবে বলতে চাই যে, আমাদের মহান উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে এই অধ্যবসায় ও আত্মদান আমাদের দুই দেশের জনসাধারণের মধ্যে বন্ধুত্বকে আরো সুদৃঢ় করবে। পথ যতই দীর্ঘ হউক না কেন এবং ভবিষ্যতে আমাদের জনসাধারণের যতই ত্যাগ করতে হউক না কেন, বিজয়মালা আমরা বরণ করবোই।

এই উপলক্ষে আমি আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে এবং আপনার সহকর্মী ও বাংলাদেশের বীর জনতাকে আমার শুভাশিষ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি আপনার মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে আমাদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করছি।

আপনার বিশ্বস্ত
(স্বা-) ইন্দিরা গান্ধী

মাননীয় জনাব তাজউদ্দীন আহমদ
প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের আম্রকাননে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল। তার ৭ মাস ১৮ দিনপর ভারত সরকারের এই স্বীকৃতিই দিন স্বাধীন এবং সাবভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গঠনের একটি মাইলস্টোন।

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর : একটি জাতির মুক্তির দিন

সমগ্র ডিসেম্বর মাসজুড়ে উত্তেজনায় কাঁপছিল সমগ্র বাংলাদেশ। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী যখনই ৩ ডিসেম্বর ভারতের উপর আক্রমণ হানল তখন থেকেই পুরোপুরি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে। ৩ ডিসেম্বর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দ্রিরা গান্ধী ছিলেন কলকাতায়। গড়ের মাঠে তাঁর ছিল জনসভা। সেই সভাতে তিনি মুজিবনগরের বাংলাদেশ বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতিদানের বিষয়ে প্রায় কিছুই বলেননি। ৪ ডিসেম্বর ভারতে জারি হয় জাতীয় জরুরি অবস্থা। ঐ দিনেই গভীর রাতে জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দ্রিরা গান্ধী ভাষণ দেন। কিন্তু বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে তখন কিছুই উল্লেখ করেননি। ৪ ডিসেম্বরই মুজিবনগর সরকার ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এক পত্রে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে দাবি জানান। এই পত্র পাওয়ার এক দিন পরেই শ্রীমতী গান্ধী ৬ ডিসেম্বর এক পত্রে জানিয়ে দেন যে, ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এই চিঠি পাওয়ার পরেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। সমগ্র বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বয়ে যায় আনন্দের বন্যা।

৫ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবের বিপক্ষে মত প্রকাশ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাব ছিল যুদ্ধে পাকিস্তানকে পরাজিত করা। এই মুহূর্তে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবের অর্থই হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পথ বন্ধ হওয়া। ৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সংসদে একটি বিবৃতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের কথা বলেন। ৭ ডিসেম্বর যশোরের বিমান ঘাঁটি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দখলমুক্ত হয় এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধারা যৌথভাবে যশোরে প্রবেশ করে। ৮ ডিসেম্বর ভারতের চিফ অব আর্মি জেনারেল মানিক শ' পূর্ব রণাঙ্গনে পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণের অনুরোধ জানান। ঐদিনই ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং কুমিল্লা শহর দখলদারমুক্ত হয়। ৯ ডিসেম্বর চাঁদপুর ও দাউদকান্দি মুক্ত হয়।

১০ ডিসেম্বর কসবা-আখাউরা মুক্ত হয় এবং খালেদ মোশাররফ তাঁর বাহিনী নিয়ে ঢাকার দিকে এগিয়ে যান। ১১ ডিসেম্বর জেনারেল মানিক শ' পুনরায় সমগ্র পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন।

১২ ডিসেম্বরের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, কালিয়াকৈর, নরসিংদী প্রভৃতি স্থান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকার দিকে অগ্রসর হন। ঐ সময়ই খবর প্রচারিত হয় যে, সপ্তম নৌবহর ভারত মহাসাগরের দিকে রওয়ানা হয়েছে। ১৩ ডিসেম্বর জেনারেল মানিক শ' তৃতীয়বারের মতো পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়ে বলেন মিত্র বাহিনীর সৈন্যরা ঢাকা ঘেরাও করে ফেলেছে। ফলে আক্রমণ করাই হবে বাঞ্ছনীয় কাজ। ১৪ ডিসেম্বর ঢাকার গভর্নর আবদুল মালেকসহ উচ্চপদস্থ অসামরিক কর্মচারীবৃন্দ সমস্ত সরকারি পদ ত্যাগ করে ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আশ্রয় নেন এবং আন্তর্জাতিক রেডক্রসের কাছে নিরাপত্তা দাবি করেন। ঐদিনই পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার কাদের তাঁর দুজন লে. কর্নেল এবং একজন মেজরসহ আত্মসমর্পণ করেন। ১৫ ডিসেম্বর পাকিস্তানের সেনা প্রধান লে. জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজী আত্মসমর্পণের জন্য জেনারেল মানিক শ'-এর কাছে বার্তা পাঠান। এই বার্তার জবাবে ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল মানিক শ' পরের দিন অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় ঢাকায় পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণের জন্য সময় ধার্য করেন। ১৬ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে চারটার সময় আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক দলিল স্বাক্ষরিত হয়। পাকিস্তানের পক্ষে পরাজিত লে. জেনারেল নিয়াজী এবং মিত্রবাহিনীর পক্ষে ভারতীয় লে. জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরা দলিলে স্বাক্ষর করেন। ঐতিহাসিক এই ঘটনার মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় একটি নতুন সূর্য। যে সূর্যের নাম বাংলাদেশ। কবিগুরুর ভাষায় 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।'

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর : জয় হলো দেশপ্রেমের বললেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

বাংলাদেশের এই মুক্তিযুদ্ধে ভারত এবং ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন তা বিশ্বের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। প্রকৃতপক্ষে প্রথম থেকেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত ইতিবাচক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যে লক্ষ লক্ষ জনতা ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে তাদের পাশে যেভাবে ভারত সরকার দাঁড়িয়েছিল, তার মধ্য দিয়েই ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা গিয়েছিল।

১৬ ডিসেম্বর ঢাকাতে ভারতের সেনাবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় পার্লামেন্টে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, "ঢাকা নগরী এখন একটি স্বাধীন দেশের মুক্ত রাজধানী।" এর পরেই শ্রীমতী গান্ধী জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে বলেন, "পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর বাংলাদেশে আত্মসমর্পণের প্রেক্ষিতে দুই দেশের বর্তমান সংঘর্ষকে আর অব্যাহত রাখা অর্থহীন। আসলে এই আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে জয় হলো মানবতার, জয় হলো দেশপ্রেমের। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সীমাবদ্ধ—তা হচ্ছে ভয়াবহ রাজত্বের নাগপাশ থেকে স্বাধীন হওয়ার লড়াইয়ে বাংলাদেশের অকুতোভয় জনসাধারণকে সহায়তা করা।" পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাতে পাকিস্তানের কারাগার থেকে সসম্মানে এবং নির্বিঘ্নে বেরিয়ে আসতে পারেন সেই ব্যাপারেও তিনি পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ অব্যাহত রেখেছিলেন। কার্যত বাংলাদেশের জনগণের এই মুক্তি সংগ্রামে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকায় বাংলাদেশের জনগণ আপ্লুত। এই অনবদ্য ভূমিকার জন্য বাংলাদেশের জনগণের হৃদয়ে শ্রীমতী ইন্দ্রিরা গান্ধীর স্থান চিরদিনের মতো স্থায়ী হয়ে গেছে। পরবর্তীকালেও এই সম্পর্ক প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অব্যাহত হয়েছে। নানা বিষয়ে ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের এই সম্পর্ক বহু যুগ ধরেই চলতে থাকবে।

১৯৭২-এর ৮ জানুয়ারি : দশ মাস পরে মুক্ত হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

১৯৭২-এর ৮ জানুয়ারি। বাংলাদেশের জনগণের আনন্দের আর শেষ ছিল না। অসংখ্য প্রিয়জনের বিয়োগব্যথার মধ্যেও জনগণ যেন অপার আনন্দ অনুভব করলেন সেদিন। তাঁদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্ত হলেন পাকিস্তানের একটি জেলের কুঠরি থেকে। এদিকে যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়ের পর ইয়াহিয়া পদত্যাগে বাধ্য হয়। ক্ষমতায় আসীন হলো জুলফিকার আলি ভুট্টো। তিনি ক্ষমতায় বসেই প্রথম কাজটি করেন বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বজনমতের চাপ এতটাই ছিল পাকিস্তানের উপর যে, বঙ্গবন্ধুকে যেন তারা আর এক সেকেন্ড সময়ও কারাগারে রাখতে চাইছিলেন না।

১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি ভোরবেলায় রাওয়ালপিন্ডি থেকে লন্ডনে এসে পৌঁছান জনগণের অবিসংবাদি নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি সেহেতু বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে অনেক আগে থেকেই ঘোষিত, সেহেতু ব্রিটিশ সরকার তাঁকে লন্ডন বিমানবন্দরেই অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। লন্ডন বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ অফিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

ঐ দিনই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. হিথ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলে আলোচনা। সেই আলোচনায় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের প্রসঙ্গটি নিয়ে আসেন। সেই আলোচনাতেই হিথ বঙ্গবন্ধুকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, খুব শীঘ্রই ব্রিটিশ সরকার বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করবে। ঐ দিনই ব্রিটিশ শ্রমিক নেতা উইলসন শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকার করেন। ঐ দিনই দুপুরে বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হন। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি তিনি স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন করেন। তিনি সাংবাদিকদের কাছে যে লিখিত বিবৃতিটি দিয়েছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ—

"আজ আমি সম্পূর্ণ মুক্ত মানুষ হিসেবে আমার প্রিয় দেশবাসীর সঙ্গে স্বাধীনতার অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করছি। একটি ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধের

মাধ্যমে আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছি। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করাই হলো এই সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি—সে সংগ্রামে একটা কনডেম সেলে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানোর নির্দেশাধীন আসামী থাকা অবস্থায় আমার দেশবাসী জনগণ আমাকে তাদের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছে।

আজ আমি ঐ সমস্ত স্বাধীনতার স্বপক্ষের দেশগুলোর প্রতি বিশেষ করে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি—যারা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। আমি যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের প্রতিও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আজ আমি গণপ্রজাতন্ত্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ও এই দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এবং আশু জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তিতে সমর্থন প্রদানের জন্য দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি।

পাকিস্তানের নূতন প্রেসিডেন্ট জনাব ভুট্টোর সঙ্গে আমার কথিত আলাপের প্রসঙ্গে আমি সকলের অবগতির জন্য সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে এটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের কোন একটা সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব কিনা সে সম্পর্কিত আমার কাছে এবং বাংলাদেশের জনগণের কাছে ভুট্টো কর্তৃক আবেদন। আমি জনাব ভুট্টোকে জানিয়ে দিয়েছি যে জনগণের কাছে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়।

আমি সুস্পষ্টভাবে পুনঃউল্লেখ করতে চাই যে গণপ্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ এখন একটা নিশ্চিত বাস্তবতা এবং কেবলমাত্র এই মৌলিক বাস্তবতার আলোকেই অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে।

১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি : দিল্লি বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধু বললেন শ্রীমতী গান্ধী একজন মানবতাবাদী নেত্রী

স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখার জন্য বঙ্গবন্ধু ছটফট করছিলেন। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি ভোরে রাওয়ালপিন্ডি থেকে লন্ডনগামী বিমানে সকালবেলা তিনি এসে পৌঁছান লন্ডনে। লন্ডন থেকে ১০ জানুয়ারি তিনি বিমানে করে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা দেন। এদিকে সারা বিশ্ব ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছে যে, বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তিনি লন্ডন এসে পৌঁছেছেন এবং লন্ডন থেকে তিনি দিল্লি হয়ে ঢাকা যাবেন। বাংলাদেশ বিশেষ করে ঢাকার মানুষের মধ্যে তখন তীব্র আলোড়ন। কখন তাঁরা দেখতে পাবেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। এদিকে দিল্লির সরকার যখন জানতে পারে যে, বঙ্গবন্ধু কিছুক্ষণ সময়ের জন্য যাত্রা বিরতি করবেন তখনই এই মহান নেতাকে দিল্লি বিমানবন্দরেই অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করার জন্য আয়োজন করা হলো। যথাসময়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি.ভি. গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দ্রিরা গান্ধী দিল্লি বিমানবন্দরে ছুটে এলেন। সমগ্র ভারতীয় জাতির পক্ষে শ্রীমতী গান্ধী এবং ভি. ভি. গিরি বঙ্গবন্ধুকে ভারতের মাটিতে সংবর্ধনা এবং অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। ভারতের মাটিতে এই উষ্ণ অভিনন্দন গ্রহণ করে আপ্লুত বঙ্গবন্ধু সমগ্র ভারতীয় জাতি এবং ভারত সরকারের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। দিল্লি বিমানবন্দরে তিনি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ—

"আমার জন্য এটাই হলো সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মুহূর্ত। আমি আমার বাংলাদেশে ফেরত যাবার পথে আপনাদের মহান দেশের ঐতিহাসিক রাজধানীতে যাত্রা বিরতি করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ব্যক্তিগতভাবে আমার জনগণের সবচেয়ে আপন বন্ধু ভারতীয় জনগণ এবং আপনাদের মহতী প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য। মিসেস গান্ধী একজন মহান নেত্রী এবং একজন মানবতাবাদীও। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে আপনারা যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং যে বীরত্ব দেখিয়েছেন তা তুলনাবিহীন।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল অন্ধকার থেকে আলোতে যাওয়ার সংগ্রাম এবং নিরাশা থেকে আশার আলোতে পৌঁছার যুদ্ধ। আমি নয় মাস পরে

আমার স্বপ্নের সোনার বাংলায় ফিরে যাচ্ছি। এই নয় মাসে আমার জনগণ অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। অনেক সংগ্রাম করেছে এবং সহ্য করেছে অনেক অত্যাচার। আমাকে যখন তারা গ্রেফতার করে নিয়ে যায় তখন আমার জনগণ কেঁদেছিল, তারা যখন আমাকে অন্তরীণ করে রাখে তখন আমার জনগণ সংগ্রাম করেছে এবং এখন আমি যখন তাদের কাছে ফিরে যাচ্ছি, তারা বিজয়ী। আমি তাদের বিজয়ের আনন্দে শরীক হতে যাচ্ছি। আমি যখন তাদের কাছে ফিরে যাচ্ছি তখন তাদের সামনে অসংখ্য কাজ। বিজয়কে শান্তি, প্রগতি এবং উন্নতিতে রূপান্তরিত করার মহান সংগ্রাম তাদের সামনে। আমি কারো বিরুদ্ধে কোন ঘৃণাবোধ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি না। আমি যাচ্ছি মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের বিজয়, অসদাচরণের বিরুদ্ধে সভ্য আচরণের বিজয়, কাপুরুষতার বিরুদ্ধে সাহসিকতার বিজয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের বিজয় এবং অমঙ্গলের বিরুদ্ধে মঙ্গলের বিজয়ের সন্তুষ্টি নিয়ে। জয় বাংলা—জয় হিন্দ।"

[সূত্র : পূর্বদেশ, ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২]

১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি : স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। পবিত্র এই দিনটির জন্যই বাংলাদেশের মানুষ গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। পাকিস্তান সরকারের মৃত্যুদণ্ডকে উপেক্ষা করে দীর্ঘ প্রায় দশ মাস জেল জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে ১০ জানুয়ারি ঢাকার মাটিতে পা রাখলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সমগ্র জাতি তাঁকে ইতিমধ্যেই জাতির পিতা হিসেবে হৃদয়ে গ্রহণ করেছে। তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য জনসভার অয়োজন করা হয়েছিল ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে। কিন্তু তাঁর বিমান মাটিতে স্পর্শ করার অনেক আগে থেকেই লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল ঢাকা বিমানবন্দর। তাঁকে একটি বার দেখার জন্য মানুষের মধ্যে ছিল অবর্ণনীয় উচ্ছ্বাস আর আকুলতা। রেসকোর্স ময়দানে সেদিন স্বজন হারানোর ব্যথা নিয়েও লক্ষ লক্ষ মানুষ সেদিন হাজির হয়েছিলেন তাঁদের প্রিয় নেতার মুখ থেকে কিছু কথা শোনার জন্য। বঙ্গবন্ধুও জনসভায় সমবেত এত বিপুল পরিমাণ মানুষ দেখে অশ্রু সরবরণ করতে পারলেন না। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে নতুন বাংলাদেশ গঠনে যাঁরা শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। নয় মাসের এই মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করার জন্য তিনি ভারতের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। নতুন বাংলাদেশ গঠনের জন্য তিনি বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের প্রতি আন্তরিক আহ্বান জানান। তাঁর সেদিনের বক্তৃতার বিবরণ নিম্ন দেওয়া হলো—

"যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, যাঁরা বর্বর বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন, তাঁদের আত্মার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই।

ভাইয়েরা আমার, লক্ষ মানুষের প্রাণদানের পর আজ আমার দেশ স্বাধীন হয়েছে। আজ আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার প্রতি জানাই সালাম। তোমরা আমার সালাম নাও।

আমার বাংলায় আজ এক বিরাট ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা এসেছে। ৩০ লক্ষ লোক মারা গেছে। আপনারাই জীবন দিয়েছেন, কষ্ট করেছেন। বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বাস করবে, খেয়ে-পরে সুখে থাকবে, এটাই ছিল আমার সাধনা। বাংলার এক কোটি লোক প্রাণভয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয়

নিয়েছিল। তাদের খাবার, বাসস্থান দিয়ে সাহায্য করেছে ভারত। আমরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী, ভারত সরকার ও ভারতবাসীকে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে জানাই কৃতজ্ঞতা। বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থন দান ও সহযোগিতা দানের জন্য ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন জনগণকেও আমি ধন্যবাদ জানাই।

গত ৭ মার্চ আমি এই রেসকোর্সে বলেছিলাম, 'দুর্গ গড়ে তোল।' আজ আবার বলছি, 'আপনারা একতা বজায় রাখুন।' আমি বলেছিলাম, 'বাংলাদেশকে মুক্ত করে ছাড়ব।' বাংলাদেশ আজ মুক্ত, স্বাধীন। একজন বাঙালি বেঁচে থাকতেও এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেব না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন দেশরূপেই বেঁচে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোন শক্তি নাই।

গত ১০ মাসে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বাংলাকে বিধ্বস্ত করেছে। বাংলার লাখো মানুষের আজ খাবার নাই, অসংখ্য লোক গৃহহারা। এদের জন্য মানবতার খাতিরে আমরা সাহায্য চাই। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের প্রতি আমি সাহায্যের আবেদন জানাই। বিশ্বের সকল মুক্ত রাষ্ট্রকে অনুরোধ করছি— বাংলাকে স্বীকৃতি দিন। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় অত্যন্ত ভালবাসি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে মানুষ কর নি।'

কবিগুরুর এই আক্ষেপকে আমরা মোচন করেছি। বাঙালি জাতি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তারা মানুষ, তারা প্রাণ দিতে জানে, এমন কাজ তারা এবার করেছে যার নজির ইতিহাসে নাই।

আমি প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়, নেতা হিসেবে নয়, আপনাদের ভাই হিসেবে বলছি—আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, যদি দেশবাসী খাবার না পায়, যুবকরা চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে, পূর্ণ হবে না। আমাদের তাই এখন অনেক কাজ করতে হবে। তোমরা, আমার ভাইয়েরা, গেরিলা হয়েছিলে দেশমাতার মুক্তির জন্যে। তোমরা রক্ত দিয়েছ। তোমাদের রক্ত বৃথা যাবে না।

তোমরা বাংলায় যারা কথা বল না, তারা এখন থেকে বাংলার মানুষ হও। ভাইরা, তাদের গায়ে হাত দিও না, তারাও আমাদের ভাই। বিশ্ববাসীকে আমরা দেখাতে চাই, বাঙালিরা কেবল স্বাধীনতার জন্যেই আত্মত্যাগ করতে পারে, তাই নয়, তারা শান্তিতেও বাস করতে পারে।

অনেকেই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। আমি তাদের জানি। ইয়াহিয়া সরকারের সাথে যারা সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে তাদের বিরুদ্ধে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। এদের বিচার হবে। সে ভার সরকারের ওপর ন্যস্ত রাখুন।

ইয়াহিয়া খান আমার ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন। আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান। বাঙালিরা একবারই মরতে জানে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের কাছে নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। তাদের আরো বলেছি, তোমরা মারলে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার লাশ বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিও।

মার্চের সেই রাতে আমাকে ছেড়ে যাবার সময় আমার সহকর্মী তাজউদ্দীন, সৈয়দ নজরুল ও অন্যরা কাঁদছিলেন। কিন্তু আমি বলেছি, এখানে আমি মরতে চাই। তবুও মাথা নত করতে পারব না। আমি তাদের বলেছিলাম, তোমরা নির্দেশমত সংগ্রাম চালিয়ো। তারা সে ওয়াদা পালন করেছে।

বাংলাদেশ আজ মুক্ত, স্বাধীন। কিন্তু আজ আমাদের সামনে অসংখ্য সমস্যা আছে, যার আশু সমাধান প্রয়োজন। বিধ্বস্ত বাংলাকে নতুন করে গড়ে তুলুন। নিজেরাই সবাই রাস্তা তৈরি করতে শুরু করুন। যার যার কাজ করে যান।

পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে আমার কোনো ক্ষোভ নাই। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা, আপনারা অসংখ্য বাঙালিকে হত্যা করেছেন, অসংখ্য বাঙালি মা-বোনের অসম্মান করেছেন, তবু আমি চাই আপনারা ভালো থাকুন।

আমি আজ বক্তৃতা দিতে পারব না। ওরা আমার লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে, এমন গ্রাম নেই যেখানে আগুন দেয় নাই, যেখানে মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করে নাই। আজ বহু ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী ও সহকর্মীকে আমি দেখছি না। এত বেসামরিক লোককে হত্যা করার নজির আর নাই। প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এত বেসামরিক লোক মরে নাই। সকলে জেনে রাখুন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ। ইন্দোনেশিয়া প্রথম ও ভারত তৃতীয়। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ইসলামের নামে এ দেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোন ধর্মভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে আমি চিনি। তাঁকে আমি জানাই

আমার শ্রদ্ধা। তিনি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কন্যা, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নাতনি। তাঁর রক্তে মিশে রয়েছে রাজনীতি। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে আমার মুক্তির জন্যে আবেদন করেছেন। আমার সাথে দিল্লিতে শ্রীমতী গান্ধীর আলাপ হয়েছে। আমি যখনই বলব, ভারতীয় সেনাবাহিনী তখনই দেশে ফেরত যাবে। এখনই আস্তে আস্তে অনেককে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

প্রায় ১ কোটি লোক যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল এবং বাকি যারা দেশে রয়ে গিয়েছিল, তারা সবাই অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে অংশগ্রহণকারী সকল শ্রেণীর জনতাকে আমি পরম কৃতজ্ঞতার সাথে সালাম জানাই। আমি সালাম জানাই মুক্তিবাহিনীকে, গেরিলা বাহিনীকে, কর্মী বাহিনীকে; আমি সালাম জানাই সংগ্রামী শ্রেণীকে, কৃষককুলকে, বুদ্ধিজীবীদের। বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। একটি লোককেও আর না খেয়ে মরতে দেওয়া হবে না। সকল রকমের ঘুষ লেনদেন বন্ধ করতে হবে।

আমি ফিরে আসার আগে ভুট্টো সাহেব অনুরোধ করেছেন, দুই অংশের মধ্যে বাঁধন সামান্য হলেও রাখা যায় কিনা। আমি তখন বলেছিলাম, আমি আমার মানুষের কাছে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না। আজ আমি বলতে চাই—ভুট্টো সাহেব, আপনারা সুখে থাকুন। আপনাদের সাথে আর না। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে মুজিব সর্বপ্রথম তার প্রাণ দেবে। বাঙালি আর স্বাধীনতা হারাতে পারে না। আমি আপনাদের মঙ্গল কামনা করি। আমরা স্বাধীন, এটা মেনে নিন। আপনারা স্বাধীনভাবে থাকুন।

গত ২৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ মাসে বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এ দেশের প্রায় সব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে। তারা আমার মানুষকে হত্যা করেছে। হাজার হাজার মা-বোনের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে। বিশ্ব এসব ঘটনার সামান্য কিছুমাত্র জানে। বিশ্বকে মানব ইতিহাসের জঘন্যতম কুকীর্তির তদন্ত অবশ্যই করতে হবে। একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বর্বর পাকবাহিনীর কার্যকলাপের সুষ্ঠু তদন্ত করার জন্যে আবেদন জানাচ্ছি। আমি বিশ্বের সকল মুক্ত দেশকে অনুরোধ জানাই, আপনারা অবিলম্বে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন। জাতিসংঘেরও উচিত অবিলম্বে বাংলাদেশকে আসন দিয়ে তার ন্যায়সঙ্গত দাবি পূরণ করা।

জয় বাংলা! বাংলাদেশ-ভারত–ভাই ভাই।

[সূত্র : দৈনিক বাংলা, ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২]

১৯৭২-এর ১২ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭২-এর ১২ জানুয়ারি। অনেক আত্মত্যাগ, অনেক সংগ্রাম, অনেক রক্তদান আর অসংখ্য মানুষের শহীদের মৃত্যুবরণের ফসল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জাতি গঠনে সরকারসহ দেশের মানুষকে এবার মনোযোগী হতে হবে। ইতিমধ্যেই বঙ্গবন্ধু সকল রাষ্ট্রের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি নতুন দেশ ও সমাজ গঠনের আহ্বান জানিয়ে কতগুলি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন—"যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে মুছে ফেলতে হবে যেন, আমরা অবিলম্বে আমাদের নতুন সমাজ গঠনের কাজ শুরু করতে পারি।"

১৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যে সরকারি বিবৃতিটি প্রকাশ করেছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ—

সংগ্রামীদের প্রতি ধন্যবাদ

বাংলাদেশের জনতা ও আমার সরকারের পক্ষ থেকে আমি গণবাহিনীর সকল সদস্যের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ ও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সকল সংগ্রামী বাহিনীর সদস্যরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে যে দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও শৌর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয়। আমাদের বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধকালে সংগ্রামে অবতীর্ণ সকল সংগ্রামীর রক্ত ও ত্যাগ বৃথা যেতে পারে না। আমরা এত দিন যে স্বপ্ন দেখে আসছিলাম, এখন আমাদেরকে সেই সোনার বাংলা গঠন করতে হবে।

দেশরক্ষা বাহিনীতে নেতৃত্ব গ্রহণ করুন

তাই, আমি ও আমার সরকার গণবাহিনীর সকল সদস্যকে আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা ও এক নয়া সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে তাদের সকল শক্তি ও প্রচেষ্টা নিয়োজিত করার আহ্বান জানাচ্ছি। সরকার ঐকান্তিকতা সহকারে আশা করে, মুক্তিযুদ্ধের বীরেরা বাংলাদেশের নয়া সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীতে নেতৃত্বদানের জন্য এগিয়ে আসবেন।

গণপুলিশ বাহিনীতে যোগদান করুন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার একটি নয়া পুলিশ বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা হবে একটি গণপুলিশ বাহিনী। অতীতের ন্যায় এ বাহিনী নির্যাতন ও যন্ত্রণা সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে না। একমাত্র আমাদের বীর গণবাহিনীর মধ্য হতে লোক বাছাই করেই যথাযথভাবে অনুরূপ একটি গণপুলিশ বাহিনীতে লোক ও অফিসার নিয়োগ করা সম্ভবপর। তাই, আমার সরকার গণবাহিনীর সদস্যদের মধ্য থেকে পুলিশ ও অফিসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

দক্ষ জনশক্তির চাহিদা রয়েছে

আমাদের প্রিয় দেশটিকে সর্বাধিক দ্রুততার সাথে গড়ে তোলা এবং অতঃপর আমাদের জাতীয় অভীষ্টসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রাপ্তব্য সমুদয় সম্পদ (বৈষয়িক ও জনশক্তি) কাজে লাগানোর জন্য আমাদিগকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে হবে। পরিকল্পনা তৈরি ও প্রগতির নীলনকশা প্রণয়নের প্রয়োজনে আমাদের বিপুলসংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, প্রকৌশলী, স্থপতি, চিকিৎসক, কারিগর ও সকল ধরনের কুশলী জনশক্তির দরকার রয়েছে। হীন দুশমন আমাদের সমাজের প্রগতির পথে আমাদেরকে নেতৃত্বদানের যোগ্য বুদ্ধিজীবীবৃন্দ ও দক্ষ জনশক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেছিল। আমরা বহু অমূল্য জীবনকে হারিয়েছি। আমাদেরকে শুধু এই ক্ষতি সামলানো নয়, অধিকন্তু উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে নূতনতর কুশলতা অর্জন করতে হবে। যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে মুছে ফেলতে হবে, যেন আমরা অবিলম্বে আমাদের নূতন সমাজ গঠনের কাজ শুরু করতে পারি।

বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত নেতৃত্ব চাই

আমি আন্তরিকভাবে অনুভব করি, দেশের পুনর্গঠন, দেশের অর্থনীতির মৌলিক কাঠামো পুনঃরচনা, সম্ভাব্য দ্রুততম গতিতে অগ্রগতি অর্জনের ক্ষেত্রে বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত নূতন ধরনের নেতৃত্বদানের ব্যাপারে গণবাহিনী হলো প্রতিভাগুলির সর্বোত্তম উৎস। সরকারের অভিপ্রেত হলো, গণবাহিনীর সদস্যবৃন্দ, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্যে অধ্যয়ন পরিত্যাগকারী শিক্ষার্থীরা জাতীয় উন্নয়নের সকল অঙ্গনে দক্ষতা ও যোগ্যতার বিকাশ

ঘটাবেন। এ সকল বিষয় বিবেচনার মধ্যে রেখে দেশের যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ বিদ্যায়তনে অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ পুনরাম্ভ করতে ইচ্ছুক স্বাধীনতা সংগ্রামীদিগকে সরকার সকল সুযোগ-সুবিধাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। যারা শিক্ষা সমাপন করেছেন তাদেরকে অবিলম্বে উপযুক্ত পদে গ্রহণ করা হবে।

মিলিশিয়া শিবির খোলা হয়েছে

একটি জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের বিস্তারিত কর্মসূচি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে ঘোষণা করেছে। কর্মসূচি মোতাবেক সকল মহকুমা সদরে শিবির স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল শিবিরে প্রয়োজনীয় বাসস্থান, আহার, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সুবিধার আয়োজন করা হয়েছে। জাতীয় মিলিশিয়ার জন্য একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ড গঠিত হয়েছে এবং সরকার জাতীয় মিলিশিয়ার আওতায় সংগঠিত গণবাহিনীর সদস্যদের সমস্যাবলি সমাধানে সাহায্য করছেন।

যোগ্যতানুসারে বাছাই করা হবে

জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের পশ্চাতে বিদ্যমান উদ্দেশ্যটি হলো গণবাহিনীর সদস্যদিগকে একটি সংগঠন ও একটি নিয়মানুবর্তিতার আওতায় আনয়ন করা। অতঃপর তাদেরকে তাদের যোগ্যতা, আগ্রহ ও দক্ষতা অনুযায়ী জাতীয় পুনর্গঠন, উন্নয়ন, দেশরক্ষা এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার বিভিন্ন কাজের জন্য বাছাই করা হবে।

দশ দিনের মধ্যে অস্ত্র সমর্পণ করুন

জাতীয় মিলিশিয়া সংগঠনের এ কর্মসূচি সম্ভাব্য দ্রুততম গতিতে অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে, যেন আমাদের গৌরবের ধন—ছেলেদের ক্ষমতা ও কর্মক্ষমতাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। গণবাহিনীর সদস্যদের সর্বান্তকরণ সহযোগিতা ও সমর্থন ব্যতীত এটা সম্পাদন করা সম্ভব হবে না। তাই, আমার নির্দেশ হলো, গণবাহিনীর যে সকল সদস্য এখনও নিজ নিজ অস্ত্র নিয়ে মহকুমা পর্যায়ের শিবিরগুলোতে হাজির হন নাই, এই নির্দেশ প্রকাশের দিন হতে দশ দিনের মধ্যে তাদেরকে অবশ্যই অস্ত্রসমেত শিবিরে হাজির হতে হবে। এ সময়ের মধ্যে গণবাহিনীর সকল সদস্যকে গোলাবারুদসহ অস্ত্রগুলি অবশ্যই মহকুমা হাকিমদের নিকট সমর্পণ করতে হবে।

নতুবা জনগণ সন্দেহের চোখে দেখবে

আমি এ ব্যাপারে আস্থাশীল যে, আমার 'বীর ভাইয়েরা' দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আমার ডাকে সাড়া দিবেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপরোক্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী হাজিরা দান করবেন। এ সময়ের পরও যারা অস্ত্র নিজেদের কাছে রেখে দিবেন, দেশবাসী তাদেরকে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহের চক্ষে দেখবেন। এ সময়ের পরে কেউ অস্ত্র হাতে রাখলে তা অননুমোদিত ও বে-আইনি বলে সাব্যস্ত করা হবে।

কুখ্যাত আলবদর সদস্যরা এখনও ঘুরে ফিরছে

এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ঘৃণ্য ও কুখ্যাত আল-বদর, আল-শামস ও রাজাকার বাহিনীর বহু সদস্য এখনও নিজেদেরকে গণবাহিনীর সদস্য হিসেবে পরিচয় দিয়ে চলেছে এবং দেশের জনগণের জানমালের উপর হুমকি সৃষ্টি করছে।

অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে

স্বভাবতই ধরে নেওয়া যায় যে, এরা জাতীয় মিলিশিয়া শিবিরে যোগদান অথবা আমার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অস্ত্র সমর্পণে এগিয়ে আসবে না। নির্ধারিত সময় পরে অননুমোদিত অস্ত্র বহনকারী লোকদেরকে আমার দেশবাসী তাই সঙ্গতভাবেই উক্ত কুখ্যাত বাহিনীগুলির সদস্য বলে মনে করতে পারেন এবং অনুরূপ ভ্রান্তির পরিণতিতে অপ্রীতিকর ঘটনাবলির সৃষ্টি হতে পারে।

আসুন সোনার বাংলা গড়ি

আসুন, আমরা সকলে এক নতুন সোনার বাংলা গড়ে তুলি।

জয় বাংলা

[সূত্র : সংবাদ, ১৮ জানুয়ারি ১৯৭২]

স্বাধীন দেশের প্রথম ভাষা দিবসে বঙ্গবন্ধুর আহ্বান

১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন সদ্য স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের।

৬ ফেব্রুয়ারি তিনি ভারত সরকারের আমন্ত্রণে নয়াদিল্লি যান এবং নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তিনি ভারত সরকারের সঙ্গে কথা বলেন। ২৪ বছর আগে ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তৎকালীন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে বহিষ্কার করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ছিল। তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয় এবং তাঁকে আজীবন সদস্যপদ দেয়া হয়।

১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ভাষা আন্দোলন উদ্‌যাপন। বাংলা একাডেমি আয়োজন করে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি। ১৫ ফেব্রুয়ারি এই ভাষা দিবস উদ্‌যাপন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। এই অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ–

"দেশবাসী ভাই ও বোনেরা আমার,

আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি আমরা স্বাধীন দেশের মাটিতে প্রথমবারের মতো শহীদ দিবস উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ থেকেই এ সংগ্রাম শুরু হয়। সেদিন আমরা গ্রেপ্তার হয়েছিলাম রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে। সেটা শুধু ভাষা আন্দোলনই ছিল না এবং কেবলমাত্র ভাষা আন্দোলনই সেদিন শুরু হয় নাই। এ আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের মানুষের স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন। ১৯৪৮ সাল থেকে আস্তে আস্তে এ সংগ্রাম শুরু হয়।' '৫২ সালে এই সংগ্রাম চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। সেদিন আমাদের দেশের ছেলেরা রক্ত দিয়েছিল, শহীদ হয়েছিল বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। কিন্তু সেটা কী শুধু ভাষা আন্দোলনই ছিল?

সেটা কেবলমাত্র ভাষা আন্দোলনই ছিল না। ছেলেরা রক্ত দিয়েছিল কেবলমাত্র ভাষার জন্য নয়, এর সঙ্গে ছিল সাংস্কৃতিক, স্বাধিকার আর মানুষের মতো বাঁচবার অধিকারের সংগ্রাম। সেদিন অনেকেই বুঝতে চেষ্টা করেননি যে, বাংলার মানুষ জেগে উঠেছে, বাংলার মানুষকে আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। সেদিন থেকে শুরু হয়েছিল চরম সংগ্রামের প্রস্তুতি।

বছরের পর বছর এই দিনটি আমার দেশের ভাই-বোনেরা পালন করছে শহীদ দিবস হিসেবে। কিন্তু শহীদ দিবস পালন করলেও বারবার এর উপর আঘাত এসেছে। এ দিনটি সত্যিকার অর্থে আমরা উদ্‌যাপন করতে পারিনি। কারণ শোষকগোষ্ঠী এই দিনটিকে হিংসার চোখে দেখত এবং তারা এটাকে ধ্বংস করতে বারবার চেষ্টা করছে। এমনকি যে সামান্য শহীদ মিনারটি গড়ে উঠেছিল তার উপরও বারবার এই ষড়যন্ত্রকারীরা এবং শোষক শ্রেণী আঘাত করেছে।

তারপর থেকে বছরের পর বছর অনেক ভাই-বোন, দেশের জনসাধারণ জীবন দিয়েছেন। জীবন দিয়েছেন স্বাধিকারের আন্দোলনে, স্বাধীনতা আন্দোলনে। তারা বাঁচতে চেয়েছে মানুষের মতো। তারা চেয়েছে তাদের অধিকার, তারা চেয়েছে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে তারা বাস করবে। কিন্তু পৈশাচিক শক্তি সেটা কিছুতেই মানতে চায়নি। হত্যা করেছে আমার ভাই-বোনদের, আঘাত করেছে আমাদের সংস্কৃতির উপর, আঘাত করেছে আমাদের অর্থনীতির উপর। নির্যাতন করেছে আমার মা-বোনদের। ভিখারি করেছে বাংলার সাধারণকে। কিন্তু বাঙালি এমন এক জাতি—যারা রক্ত দিতে জানে। যে জাতি মরতে শিখে, সে জাতিকে কেউ রুখতে পারে না—শোষকগোষ্ঠী বুঝে নাই। তাই, তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে তারা আক্রমণ করেছিল।

আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি সত্য। কিন্তু তা অনেক রক্তের বিনিময়ে। এত রক্ত কোন দেশ কোন জাতি স্বাধীনতার জন্য দেয় নাই। কিন্তু এ রক্ত আমাদের বৃথা যাবে, এ স্বাধীনতা আমাদের বৃথা যাবে যদি এদেশের মানুষের মুখে আমরা হাসি ফোটাতে না পারি, যদি এদেশের মানুষকে শোষণমুক্ত করতে না পারি, শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করতে না পারি এবং তা যদি করতে হয়, তাহলে এদেশের মানুষকে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে হবে। আমি আশা করি, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ এবারে এ শপথই নেবে।

আমরা স্বাধীন হয়েছি। কিন্তু স্বাধীন হলেও আমরা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারব না, যদি শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করতে না পারি। সে জন্য জাতি, ধর্ম, দল, মত নির্বিশেষে ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক সকলকে অগ্রসর হতে হবে—এটাই আমরা আশা করি। এ দিনে আমাদের শপথ হবে, যে স্বাধীনতা আমরা এনেছি, যদি প্রয়োজন হয় রক্ত দিয়ে সে স্বাধীনতা রক্ষা করব। যদি প্রয়োজন হয় দেশ গড়ে তোলার জন্য আরও রক্ত দেব। আজ প্রতিজ্ঞা করতে হবে শহীদদের রক্তের কথা মনে করে। যারা মরে গেছে, যারা শহীদ হয়েছে,

যাদের মায়ের বুক খালি হয়েছে, যে বোন বিধবা হয়েছে, যে কোটি কোটি মানুষ আজ গৃহহারা হয়েছে তাদের কথা স্মরণ করে শপথ নিতে হবে, বাংলার মাটিতে শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করতে হবে। মানুষ যাতে আর দুঃখ, কষ্ট না পায় আর কোনদিন অত্যাচারিত, নিপীড়িত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের কাজে অগ্রসর হতে হবে। তাই, আমি অনুরোধ করছি, বিশেষভাবে যুবসমাজ, ছাত্রসমাজ, কৃষক শ্রমিক ভাইদের সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে।

আমরা মহাবিপদের মধ্যে আছি। আমাদের কিছুই নাই। নতুন করে সবকিছু গড়তে হবে। আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে দেশকে গড়ে তুলি, একটি শোষণহীন সমাজ তৈরি করি।

শহীদ স্মৃতি অমর হোক। জয় বাংলা।

[সূত্র : সংবাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২]

১৯৭২ সালের মে দিবসে বঙ্গবন্ধুর শোষণহীন বাংলাদেশ গঠন করার আহ্বান

সদ্য স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করার পর থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বঙ্গবন্ধুর কাছে আমন্ত্রণ আসতে থাকে। ইতিমধ্যেই বঙ্গবন্ধু ভারত সফর করে এসেছেন। এরই মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আমন্ত্রণ আসে সেই দেশ সফর করার জন্য। ২৮ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন। ১২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ভারতীয় মিত্রবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করে।

১৯৭২ সালের ১ মে। আন্তর্জাতিক মে দিবস। এই মে দিবসে তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা দেন। তাঁর এই ঐতিহাসিক ভাষণের কিছুটা এখানে তুলে ধরা হলো—

"আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,

স্বাধীন বাংলার মুক্ত মাটিতে এবারই সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক মে দিবস পালিত হচ্ছে। বাংলার মেহনতি মানুষ শৃঙ্খলামুক্ত পরিবেশে এই দিনটিকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করার অধিকার অর্জন করেছে, এজন্য দেশ ও জাতি আজ গর্বিত। মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের এক জ্বলন্ত প্রতীক। সারাবিশ্বের শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের জন্য আজকের এ দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার মেহনতি মানুষ বিশেষ করে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবক যারা সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের জুলুম এবং ঔপনিবেশিক জালেমদের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীনতার ইতিহাস লিখে গেলেন, তাঁদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার কথা বাংলাদেশের মানুষ কোনদিন ভুলবে না। তাঁরা আর কোনদিন আমাদের কাছে কোন দাবি-দাওয়া নিয়ে আসবেন না। কিন্তু এই লাখো লাখো শহীদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এদেশের ইতিহাসে। যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের মানুষ দেশ গড়ার সংগ্রামে তাঁদের কাছ থেকে পাবে প্রেরণা। তাই, আজকের এই মহান দিনে আমার দেশের শ্রমজীবী মানুষদেরকে আমি শোষণহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকায় নেমে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমার প্রাণপ্রিয় দেশবাসী,

আপনারা অতীতে বারবার আমার ডাকে সাড়া দিয়ে নির্ভীক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আমার বিশ্বাস, এবারও আপনারা আমার আহ্বানে মনে-প্রাণে এগিয়ে আসবেন। অতীতে আমরা একটি মর্মান্তিক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিগড়ে বাঁধা পড়ে গিয়েছিলাম। গুটি কয়েক সুবিধাবাদী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জাতীয় সম্পদ ও শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদন নিজেদের কুক্ষিগত করে রেখেছিল। দেশ আজ স্বাধীন। সম্পদের মালিক জনগণ। তাই, কোনো শ্রেণীবিশেষের ভোগ-লালসার জন্য এবং লোভ চরিতার্থ করার নিমিত্তে এই সম্পদকে অপচয় করতে দেওয়া হবে না। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতন্ত্র কায়েম করা। এই ব্যবস্থায় দেশের সমুদয় উৎপাদিত ও প্রাকৃতিক সম্পদ কৃষক-শ্রমিক ও সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সুষমভাবে বণ্টন করা হবে। যদিও বাধা অনেক, সমস্যার শেষ নেই। তবুও লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা জানেন, আমাদের বর্তমান জাতীয় উৎপাদন সাড়ে সাত কোটি দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত নয়। শত শত বছর ধরে আমরা একটা নিকৃষ্ট উপনিবেশ এবং বিদেশিদের বাজার হিসেবে লুণ্ঠিত হয়েছি। বিদেশিরা দেশের অর্থনীতিকে জনগণের প্রয়োজনের উপযোগী করে গড়ে তোলেনি। এর পরে ইয়াহিয়ার বর্বর সৈন্যরা আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে এ দেশের অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের কাজে হাত দিয়েছে। আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির গোড়াপত্তন করেছি। পাশাপাশি দুঃখী জনগণের অভাব মোচন ও দুর্দশা লাঘবের জন্য আমাদের সাধ্যমত আশু সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। সুদসহ কৃষকদের সমস্ত বকেয়া খাজনা ও পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির কর চিরদিনের জন্য বিলোপ করা হয়েছে।"

]সূত্র : সংবাদ, ৩ মে, ১৯৭২]

১৯৭২-এর ৪ নভেম্বর : বাংলার জনগণ পেল মৌলিক অধিকার

দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনে এবং দীর্ঘ জেল জীবন ভোগ করতে করতে বঙ্গবন্ধু শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ৩০ জুলাই লন্ডনে তাঁর পিত্তকোষে অস্ত্রোপচার করা হয়। শারীরিকভাবে কিছুটা সুস্থ হয়ে লন্ডন থেকে তিনি জেনেভা গমন করেন। ১০ অক্টোবর বিশ্বশান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে জুলিও কুরি সম্মানে ভূষিত করে। নভেম্বরের ৪ তারিখ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন যে, দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের দিন ধার্য হলো ৭ মার্চ, ১৯৭৩। ঐ একই দিনে খসড়া সংবিধান কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে অনুমোদিত হয় সর্বসম্মতিক্রমে। খসড়া সংবিধান অনুমোদন প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

"জনাব স্পিকার সাহেব, আজই প্রথম সাড়ে সাত কোটি বাঙালি তাদের শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে। বাংলার ইতিহাসে বোধহয় এই প্রথম বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিরা জনগণের ভোটের মারফতে এসে তাদের দেশের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছেন।"

১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২ সাল। বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে স্বাক্ষর করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৫ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুর সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রদানের ঘোষণা করেন। ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয় বাংলাদেশের নতুন সংবিধান। এই সংবিধানের মাধ্যমে জনগণ পেল তাঁদের মৌলিক অধিকার।

এই এক বছরে বঙ্গবন্ধুর সরকারের সাফল্যের দিকটি ছিল তাৎপর্যমণ্ডিত। সব দিক থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত বাংলাদেশে এক বছরের মধ্যে যে সাফল্য এসেছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে তা হলো—

"প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন, এক কোটি মানুষের পুনর্বাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত নামমাত্র মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, মদ, জুয়া, ঘোড় দৌড়সহ সমস্ত ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড কার্যকরভাবে নিষিদ্ধকরণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন, ১১০০০ প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা, ৪০ হাজার প্রাথমিক স্কুল সরকারিকরণ, দুস্থ মহিলাদের কল্যাণের জন্য নারী পুনর্বাসন সংস্থা,

মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ, বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ, পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত ব্যাংক-বীমা ও ৫৮০টি শিল্প ইউনিটের জাতীয়করণ ও চালু করার মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মসংস্থান, ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ কমপ্লেক্সের প্রাথমিক কাজ ও অন্যান্য নতুন শিল্প স্থাপন, বন্ধ শিল্প কারখানা চালুকরণ ইত্যাদি। (বঙ্গবন্ধু–সম্পাদনা মিজান রহমান)

এছাড়াও গত এক বছরের মধ্যে বিশ্বের একটা উল্লেখযোগ্যসংখ্যক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ ছিল বঙ্গবন্ধুর সরকারের একটা তাৎপর্যমণ্ডিত সাফল্য।

১৯৭২-এর ৬ ফেব্রুয়ারি : এই ঋণ শোধ করার নয়
ব্রিগেড ময়দানে বঙ্গবন্ধু

১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি। কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে এক বিশাল ঐতিহাসিক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মুজিবুর বললেন বাংলাদেশ এবং ভারতের ঐ মৈত্রী বন্ধন চিরস্থায়ী। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও ভাষণ দেন ঐ ঐতিহাসিক সভায়। ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন— ভারতের এই ঋণ শোধ করার নয়।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পূর্ণরূপ এখানে প্রদত্ত হলো—

"ভারতের মহান নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, আমার ভাই ও বোনেরা, আজ আমি ভারতের জনগণের জন্য বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের শুভেচ্ছার বাণী নিয়ে এসেছি। আমি কৃতজ্ঞতার বাণী নিয়ে এসেছি।

এ ঋণ শোধ করার নয়

আপনারা ভারতের জনগণ আমাদের মুক্তি সংগ্রামে এমনভাবে এবং এত পরিমাণে সাহায্য করেছেন যে, কোন কৃতজ্ঞতা দিয়েই সে ঋণ শোধ করার নয়। আপনারা জানেন, বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশে যে অমানুষিক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে ইতিহাসে তার তুলনা নেই। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে অসহায়ের আর্তনাদ শোনা গেছে। ভারত আমাদের এক কোটি মানুষকে খাদ্য দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে সর্বরকমের সাহায্য করেছে। ভারতের জনগণকে সামান্য কৃতজ্ঞতা দিয়ে আমি ছোট করতে চাই না। আমি কল্পনাও করতে পারি না ভারত সাহায্য না করলে আমাদের জনগণের কী অবস্থা হতো। এই মহৎ দানের জন্য শুধু কৃতজ্ঞতাই নয়, আমরা কোনদিন আপনাদের ঋণ শোধ করতে পারব না।

আপনারা জানেন, আমরা আমাদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আর কোন জাতিকেই তাদের স্বাধীনতার জন্য এত রক্ত দিতে হয় নি। বর্বর শত্রুর হাতে না হলেও আমাদের তিরিশ লাখেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, আমাদের মা-বোনেরা তাদের মানসম্ভ্রম হারিয়েছে। বাংলাদেশের শতকরা চল্লিশটি বাড়ি-ঘর পুড়ে ছাই হয়েছে। শত্রুরা আমাদের বহু জ্ঞানী-গুণী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। আমাকে গ্রেপ্তার করার সময়

জনগণকে আমি অস্ত্র দিয়ে যেতে পারি নি, কিন্তু আমার জনগণ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। আমি জানতাম, আমার জনগণ ও সহকর্মীরা সংগ্রাম করবে এবং রক্ত দেবে। তারা তা করেছেন। তারা তাদের জীবন দিয়েছেন।

ভারতের জনগণ ও ভারতের সশস্ত্র বাহিনী এগিয়ে না এলে আমরা আমাদের সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারতাম না। আমি আবারও আপনাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনাদের দেওয়ার কিছুই নেই আমার, আপনাদের জন্য আমার ভালোবাসা আছে, আমি আপনাদের তাই দিচ্ছি। আপনারা অবগত আছেন যে, পাকিস্তানি শাসকরা ১৯৪৮ সালে এবং ১৯৫২ সালে আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে যোগ্য মর্যাদায় বসাতে চাইলে আমাদের উপর হামলা হয়। ১৯৫৮ সালে বাংলাদেশকে শোষণ করার জন্য আইয়ুব খান সামরিক আইন জারি করে। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ কোনদিন পশু শক্তির কাছে মাথা নত করে নি। আমার ভাইয়েরা তাদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছে। তারা তাদের জীবন দিয়েছে এবং এখনও লড়াই করছে। আপনারা একাত্তরের ইতিহাস ভালভাবেই জানেন।

পাকিস্তানের ৩টি শ্লোগান

সবসময় পাকিস্তানের তিনটি শ্লোগান ছিল "ইসলাম খতরা মে হ্যায় (ইসলাম বিপদাপন্ন), কাশ্মীর লে লেয়েঙ্গা (কাশ্মীর নিয়ে নেব) এবং হিন্দুস্তান হামারা দুশমন হ্যায় (হিন্দুস্তান আমাদের শত্রু)।" কিন্তু তারা সমস্যাজর্জরিত জনসাধারণের প্রতি নজর দেন নি। জনসাধারণ যে অনাহারে মরছে সেদিকে তাদের নজর নেই।

পাকিস্তানি শাসকরা ভেবেছিল, বন্দুক দিয়েই বাঙালিদের দাবিয়ে রাখা যাবে। কিন্তু দাবিয়ে রাখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশে তারা নজীরবিহীন হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। তারা বাঙালি পুলিশ বাহিনীর শতকরা ষাট জনকে হত্যা করেছে। তারা অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে খুন করেছে। তারা খাদ্য গুদাম ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। আমার জনগণ না খেয়ে লড়াই করেছে। অনেকে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী আমাদের সর্বাত্মক সাহায্য দিয়েছেন। কিন্তু আমার জনগণ স্বাধীনতা লাভ করেছে, তার মূল কারণ হলো, তারা ঐক্যবদ্ধ ছিল। আমি বিশ্বাস করি, তারা তাদের দেশকে পুনর্গঠিত করতে পারবে।

আমি পাকিস্তানিদের সাবধান করে দিয়েছিলাম, বাংলাদেশ শুধুমাত্র উর্বর নরম পালিমাটির দেশই নয়, বাংলাদেশের এই নরম মাটিই চৈত্র মাসে পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। এই বাংলাদেশ তিতুমীরের বাংলাদেশ, সুভাষ

বসুর বাংলাদেশ, ফজলুল হকের বাংলাদেশ, সোহরাওয়ার্দীর বাংলাদেশ, সূর্য সেনের বাংলাদেশ।

তারা ফাঁসি দিতে চেয়েছিল

আপনারা জানেন যে, তারা আমাকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমার জীবন রক্ষার জন্য দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। মৃত্যুভয়ে আমি ভীত নই, কেননা মৃত্যু স্বাভাবিক, বরং বেঁচে থাকাটাই অস্বাভাবিক। দুনিয়ার যাঁরা আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে সমর্থন দিয়েছেন, আমি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট ব্রিটেন, অপরাপর দেশের সরকার ও জনগণকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি মার্কিন জনগণ ও সাংবাদিকদের কৃতজ্ঞতা জানাই। কিন্তু মার্কিন সরকারকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি না। আমি বুঝতে পারি না বাংলাদেশের মানুষকে হত্যা করার জন্যে মার্কিন সরকার কীভাবে পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য দেয়, আমি বুঝতে পারি না মার্কিন সরকার কীভাবে বাংলাদেশকে সাহায্য করার কারণে ভারতে সাহায্যদান বন্ধ করে দেয়। আজকের দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী খেলা শেষ হয়ে গেছে। ভারত ও বাংলাদেশের মাটিতে সাম্রাজ্যবাদী খেলা আর চলবে না।

পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার নেই। যদি এখনও কেউ মনে করেন বাংলাদেশ পাকিস্তানের অঙ্গ, তবে তার যোগ্য স্থান পাগলাগারদে।

বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে এবং তারা স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন তোমরা কারা? আমি তোমাদের (পাকিস্তানিদের) বলে দিতে চাই, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনতার একটি মাত্র মানুষ জীবিত থাকতেও বাংলাদেশের মাটিতে তোমরা পা দিতে পারবে না। আমি প্রতিহিংসায় বিশ্বাস করি না। আমি বলি, পশ্চিম পাকিস্তান শান্তিতে থাক।

ইন্দিরার সাথে মিল কেন?

অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন, শ্রীমতী গান্ধী তোমার জন্যে এত কিছু করছে কেন? ব্যাপার কী? আমার উত্তর অত্যন্ত সহজ।

আমাদের মিল আদর্শের মিল, নীতির মিল। তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, আমিও গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, আমিও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি, শ্রীমতী গান্ধীও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করেন। আমরা উভয়েই ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী।

ফাটল ধরতে পারবে না

আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি, পৃথিবীর কোন শক্তিই ভারত ও বাংলাদেশের অক্ষয় মৈত্রীতে ফাটল ধরাতে পারবে না।

এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, ভারতে যেন সাম্প্রদায়িকতা না থাকে। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা নেই। অতীতে যখনই পূর্ব বাংলা নিজেদের অধিকারের কথা বলেছে, তখনই সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানো হয়েছে। আমি ভারতের জনগণকে উপদেশ দিতে চাই না, আমি শুধু বলতে চাই, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে।

আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি যে, আমরা জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি প্রতিষ্ঠার কাজ চালিয়ে যাব।]

প্রিয় ভাইয়েরা আমার

আমি সোজা মানুষ, আমি যা বুঝি, আমি তাই করি। বক্তৃতা শেষ করার আগে আমি আবারও বলছি যে, আমাদের বন্ধুত্ব অক্ষয়।

জয় বাংলা, জয় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, জয় হিন্দ, ভারত-বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

[সূত্র : সংবাদ, ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২]

* ১৯৭৩ সাল। জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচনে মোট ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ২৯৩টি আসন। বঙ্গবন্ধুর প্রতি বাংলাদেশের মানুষের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছার নিদর্শন ছিল নির্বাচনের ফলাফল।

১৯৭৪-এর ২২ ফেব্রুয়ারি : পাকিস্তানের বুকে দাঁড়িয়ে আধিপত্যবাদের বিরোধিতা

১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি। যে পাকিস্তানের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু আজীবন সংগ্রাম করেছেন, পাকিস্তানে জেল খেটেছেন; সেই পাকিস্তানের বুকে দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বিরোধিতা করেছেন আধিপত্যবাদের। ১৯৭৪ সালের ২২ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি। পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আইওসি সম্মেলন। এই সম্মেলন শুরুর প্রাক্কালে পাকিস্তান সরকার শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল। সেই সম্মেলনে যোগ দিয়ে বঙ্গবন্ধু সমগ্র বিশ্বের শান্তিকামী, গণতন্ত্রপ্রিয় ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের কাছে আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার আবেদন জানান। একই সঙ্গে তিনি উগ্রজাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধেও জনগণকে এ বিষয়ে আসার আহ্বান জানান। সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানের মাটিতে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু কী বলছেন তা-ই ছিল আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি যা বলেছিলেন তা সংক্ষেপে এখানে উল্লেখিত হলো—

"বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের এখানে সমবেত ভাইদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ ও আরব ভাইদের ন্যায়সংগত সংগ্রামে তাদের সমর্থন ঘোষণার জন্য এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারায় আমরা খুবই আনন্দিত।

সেক্রেটারি জেনারেলসহ অন্য যাঁরা আমাদের ভাইদের সঙ্গে আজ আমাদের উপস্থিতির আয়োজন করতে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন, আমি তাদের সকলের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যে মহামান্য নেতৃবৃন্দ আজ আমাদের স্বাগত জানিয়েছেন আমি তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আর ধন্যবাদ জানাই সম্মেলনের চেয়ারম্যান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে। আমি বলতে চাই, সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায় উন্মোচিত হয়েছে। আমরা এই উপমহাদেশে এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যুগপৎ অবদান রাখার পথ উন্মুক্ত করেছি।

আজকের মতো মানবজাতি ইতিপূর্বে কখনও এত বড় কঠোর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় নাই। একদিকে ভয়াবহ বিপদ আর অপরদিকে জীবনের মানোন্নয়নে সৃজনশীল বিপুল সম্ভাবনা বিশ্বের মানুষ ইতিপূর্বে এমন পরিস্থিতির দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় নাই। মানুষ এখন বস্তুগত দিক হতে বৃহত্তর শক্তি অর্জন করেছে, যা সে আর কখনও করতে পারে নাই। সে পৃথিবীকে ধ্বংস করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। আমরা যুদ্ধের জন্য শক্তি অপব্যবহার করতে দেখেছি, জনগণকে নিপীড়ন করতে দেখেছি। আমরা তাদের ন্যায়সংগত অধিকার অস্বীকার করতে দেখেছি। অকথ্য দুর্ভোগের মাঝে তাদের ঠেলে দিতে আমরা দেখেছি। আর এইসব অবর্ণনীয় যাতনার চূড়ান্ত নিদর্শন হয়ে রয়েছেন আমাদের ফিলিস্তিনি ভাইয়েরা।

আর এই জন্যই অতীতের তুলনায় আজ এই শক্তিকে প্রজ্ঞার সঙ্গে কাজে লাগানোর প্রয়োজন বেশি। ধ্বংস নয় সৃষ্টি, যুদ্ধ নয় শান্তি, দুর্ভোগ নয় মানুষের কল্যাণে আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা যদি মহানবীর প্রচারিত মানবপ্রেম ও মর্যাদার শাশ্বত মূল্যবোধ আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারি তাহলে বর্তমানকালের সমস্যা সমাধানে মুসলিম জনসাধারণ সুস্পষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

এইসব মূল্যবোধে উদ্দীপিত হয়ে শান্তি ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে আমরা একটি নূতন আন্তর্জাতিক ঐতিহ্য গড়ে তুলতে পারি। এই সম্মেলন শুধুমাত্র আরব ভাইদের সংগ্রামের প্রতি সমর্থনে আমাদের ঐক্য সংহত করার জন্যই নয়, বরং জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির সঙ্গে বিশ্বব্যাপী শান্তি ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহের সঙ্গে আমাদের একাত্মতা ঘোষণার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদ ও সকল প্রকার শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের সঙ্গে একাত্মতার উপর জোর দিতে হবে। আমাদের ভাইদের উপর যে নিদারুণ অবিচার হয়েছে অবশ্যই এর অবসান ঘটাতে হবে।

অন্যায়ভাবে দখলকৃত আরব ভূখণ্ড অবশ্যই ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে জেরুজালেমের উপর। রামাদান যুদ্ধের অকুতোভয় বীর শহীদানের প্রতি আমরা সালাম জানাই। তাঁরা তাঁদের শৌর্য ও আত্মত্যাগের দ্বারা বহু অমূলক ধারণা ধূলিসাৎ করে এমন একটি নয়া কার্যকর অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যাতে এই কথাই মূর্ত হয়ে উঠেছে যে, ন্যায়বিচার ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বিজয় অবধারিত।

আমরা পুরোপুরিরূপে বিশ্বাস করি যে, ইতিহাস এটি ক্রান্তিলগ্নে এসে পৌঁছিয়েছে। আমরা আমাদের সম্মিলিত ও সুচিন্তিত কার্যক্রম দ্বারা আমাদের ভাইদের উপর চালিত অবিচারের অবসান ঘটাতে পারব।

আল্লাহর কৃপায় আমরা এখন আমাদের সম্পদ ও শক্তি এমনভাবে সংহত করতে পারি, যাতে আমাদের সকলের জন্য শান্তি ও ন্যায়বিচার অর্জন করা যায়।

এই সাফল্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশের সাড়ে সাত কাটি মানুষ সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের সকল সম্মিলিত প্রচেষ্টা সফল করুন।"

[সূত্র : দৈনিক বাংলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪]

১৯৭৪-এর ৯ সেপ্টেম্বর : আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু

১৯৭৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর। জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আলজিয়ার্সে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা। এই সম্মেলনে যোগ দিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বিশ্ববাসীর কাছে আন্তরিকভাবে আবেদন জানান শান্তি, স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য। বিশেষ করে কোনো রাষ্ট্র যেন দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি কোনো রকম বৈষম্যমূলক আচরণ না করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য তিনি রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রতি আহ্বান জানান। দেশে দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ছিল তার উদাত্ত আহ্বান। এদিকে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা হলো।

"জোটনিরপেক্ষ জাতিগোষ্ঠীতে আমাদের স্বাগত জানানোর জন্য এখানে উপস্থিত সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

এই গোষ্ঠীতে শান্তি ও প্রগতির প্রতিনিধিত্বমূলক শক্তির পার্শ্বে নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম হওয়া বাংলাদেশের জন্য প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে।

যে তিনজন মহান রাষ্ট্রনীতিবিদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন শুরু হয়, তাঁদের আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। এই তিন মহান নেতা হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট টিটো, প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসের এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। আমরা যদিও প্রেসিডেন্ট নাসের ও পণ্ডিত নেহেরুকে হারিয়েছি, সৌভাগ্যক্রমে প্রেসিডেন্ট টিটো ও পণ্ডিত নেহেরুর সুযোগ্যা কন্যা মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে আমাদের মাঝে পেয়েছি।

জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, আলজেরিয়া, ভিয়েতনাম তথা বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের সেইসব দেশের বীর শহীদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই। আমি শহীদদের নামে প্রতিজ্ঞা করছি যে, আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায় মুক্তিসংগ্রামরত মানুষের পিছনে বাংলাদেশ সর্বদাই থাকবে।

আলজেরিয়ার বীর জনগণ এবং সাহসী নেতৃবৃন্দ যাঁরা ঐতিহাসিক মুক্তিসংগ্রামকে গৌরবোজ্জ্বল বিজয়ের পথে পরিচালিত করে সারা বিশ্বে মুক্তিসংগ্রামীদের প্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছেন, তাদেরকে আমি সালাম জানাই। এই সম্মেলনকে সফল করার উদ্দেশ্যে সব রকম প্রয়াসী হওয়ার জন্য সম্মেলনের চেয়ারম্যান স্বাধীনতার মহান সংগ্রামী নেতা প্রেসিডেন্ট বুমেদীন ও আলজেরিয়ার সরকার ও জনগণকে আমি অভিনন্দন জানাই।"

(সূত্র : দৈনিক বাংলা, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪)

১৯৭৪-এর ২৪ সেপ্টেম্বর : জাতিসংঘে দাঁড়িয়ে বললেন ক্ষুধা, অশিক্ষা দূর করতে চাই

১৯৭৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। রাষ্ট্রসংঘের ২৯তম সম্মেলন, বঙ্গবন্ধু সেই সম্মেলনে অংশ নিয়ে বলেন, শুধু বাংলাদেশ নয়, যেকোনো দেশের বুক থেকে দারিদ্য, ক্ষুধা, অশিক্ষা, বেকার সমস্যা দূর করাই হবে বর্তমান রাষ্ট্রসমূহের প্রথম ও প্রধান কাজ। এই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু তাঁর মাতৃভাষা বাংলাতে বক্তৃতা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুই ছিলেন প্রথম রাষ্ট্রনায়ক যিনি বাংলায় বক্তৃতা করেন। তাঁর এই ঐতিহাসিক বক্তৃতা অনুবাদ করে সবাইকে শোনানো হয়েছিল। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা গভীর উৎসাহের সঙ্গে তাঁর এই বক্তৃতা শুনেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণটি সকলের কাছে সমাদৃত হয়েছিল এই কারণেই যে, তিনি মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য আহ্বান করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়টি সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা হলো—

"জনাব সভাপতি

আজ এই মহামহিমান্বিত সমাবেশে দাঁড়িয়ে আপনাদের সাথে আমি এই জন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগিদার যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এই পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পূর্ণতা চিহ্নিত করে বাঙালি জাতির জন্য এটা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অর্জনের জন্য এবং একটি স্বাধীন দেশে মুক্ত নাগরিকের মর্যাদাসহ বাঁচার জন্য বাঙালি জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম করেছেন, তারা বিশ্বের সকল জাতির সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্যসহ বাস করবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রক্ষিত আছে, আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

আমি জানি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের এই অঙ্গীকারের সঙ্গে শহীদানের বিদেহী আত্মাও মিলিত হবে। এটা বিশেষ আনন্দের ব্যাপার যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন সক্রিয় যোদ্ধা সভাপতি থাকাকালেই বাংলাদেশকে এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে।

জনাব সভাপতি

গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির শীর্ষ সম্মেলনের সাফল্যের ব্যাপারে আপনার মূল্যবান অবদানের কথা আমি স্মরণ করছি।

যাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ বিশ্ব-সমাজে স্থান লাভ করেছে, এই সুযোগে আমি তাঁদেরকেও অভিবাদন জানাই। বাংলাদেশের সংগ্রামে সমর্থনদানকারী সকল দেশ ও জনগণের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংহতকরণ, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন ও ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বাংলাদেশকে যাঁরা মূল্যবান সাহায্য দিয়েছেন, তাঁদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। জাতিসংঘে যাঁরা আমাদের স্বাগত জানিয়েছেন, তাঁদের আমি বাংলাদেশের পক্ষ হতে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।)

(সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ মে, ১৯৭৫)

১৯৭৪-এর ১০ ডিসেম্বর : নৌবাহিনী দিবসে বললেন বাঁচতে হবে আত্মমর্যাদার সঙ্গে

১৯৭৪ সালের ১০ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল নৌবাহিনী দিবসের অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেই অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকতে হবে। নৌবাহিনীসহ সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্যের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তারা যেন নিষ্ঠার সঙ্গে সেই দেশপ্রেমিক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বলেছিলেন যে, আপনাদের কখনো ভুললে চলবে না যে, আপনারা এদেশের জনগণের একটা অংশ এবং এদেরই সন্তান। আপনারা এদেশের জনগণের ভাই। তারা যদি অসন্তুষ্ট থাকেন তাহলে আপনারাও অসন্তুষ্ট এবং তারা খুশি থাকলে আপনারাও খুশি। বাংলাদেশের এই পরিস্থিতিতে খাদ্য জোগাড় করাই হলো আমাদের প্রথম কাজ। জনগণের জন্য খাবার জোগাড় করার পূর্বে অন্য কোনো কিছু করা যাবে না। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের একটি অংশ এখানে তুলে ধরা হলো—

"আজ আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে খুব আনন্দিত। আপনারা অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌবাহিনীর সদস্য হিসেবে জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছেন। তখন এই বাহিনীর ছিল না কোনো জাহাজ, ছিল না তেমন কোন অস্ত্রশস্ত্র। তাদের তেমন কিছুই ছিল না। নিজেদের জীবন বাজী রেখে তারা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। অনেকে শহীদ হয়েছেন এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন।

আপনারা জানেন যে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে বাঙালিদেরকে তেমন নিয়োগ করা হোত না—যা নিয়ে আমরা অনেক দিন ধরে সংগ্রাম করে আসছি। যারা জীবনে কোনদিন নদী দেখেনি এবং নদীর পানিতে যাদের সাঁতার কাটার বা গোছল করার সুযোগ হয়নি তাদেরকেও নৌবাহিনীতে নেওয়া হোত। অন্যদিকে পানিতে যে বাঙালিদের জন্ম এবং পানিতে যারা ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছে তাদেরকে গ্রহণ করা হোত না নৌবাহিনীতে। এ বিষয়টা নিয়ে আমি অনেক দিন ধরে সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম করে আসছি।

আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের তিন বছর হোল। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি অনেক ত্যাগ স্বীকার করে। আমাদের ছিল মাত্র কয়েকজন নৌসেনা এবং ছিল না কোন নৌবাহিনী জাহাজ ও অস্ত্রশস্ত্র। কিন্তু আজ আমি গর্বিত ও আনন্দিত যে এই স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই আমাদের নৌবাহিনী মোটামুটিভাবে একটা রূপ নিতে সক্ষম হয়েছে।

বর্তমানে দেশের অবস্থা তেমন ভাল না। দেশের খাদ্য অবস্থা খুব সন্তোষজনক না। বিদেশ থেকে খাবার আমদানী করতে হয়। খাদ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় দেশের অর্থনীতিতেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অর্থনীতি আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমি আপনাদের সামরিক বাহিনী, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীকে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম দিয়ে যথাযোগ্যভাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নিয়েছি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য।

(সূত্র : আই. এস. পি. আর. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়)

১৯৭৫-এর ২৬ মার্চ : বললেন দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবোই

১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ, স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পঞ্চম স্বাধীনতা দিবস। এই উপলক্ষে জনসভা আয়োজিত হয়েছিল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। প্রধান বক্তা হিসেবে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি সেদিন বলেছিলেন বাংলাদেশের লক্ষ কোটি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই হবে সরকারের প্রধান কাজ। এক্ষেত্রে সবার আগে যেটা প্রয়োজন তা হলো প্রত্যেকের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন মেটানো। তিনি বলেছিলেন, সমস্ত বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের সঙ্গে আমরা বন্ধুত্ব চাই। আমরা বিশ্বশান্তি এবং জোটনিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাস করি। বাংলাদেশকে আমরা বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে এক আসনে তুলতে চাই। এজন্য অশিক্ষা দূর করে সকল মানুষের জন্য শিক্ষার সম্প্রসারণ জরুরি। তাঁর বক্তৃতার অংশ বিশেষ এখানে তুলে ধরা হলো—

"আমার ভাই ও বোনেরা,

আজ ২৬শে মার্চ, ১৯৭৫ সাল। একাত্তরের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলার মানুষকে আক্রমণ করেছিল। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছিল। সেদিন রাতে বিডিআর-এর ক্যাম্পে, পুলিশ ক্যাম্পে, আমার বাড়িতে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ঢাকা শহর ও দেশের অন্যান্য স্থানে আক্রমণ চালায় ও নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাশবিক শক্তি দিয়ে। বাংলার মানুষকে আমি ডাক দিয়েছিলাম। ৭ই মার্চ আমি তাদের প্রস্তুত করে দিয়েছিলাম। যখন দেখলাম আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে, সেই মুহূর্তে আবার আমি ডাক দিয়েছিলাম। আর নয়, মোকাবিলা কর। বাংলার মানুষ যে যেখানে আছ, যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুদের মোকাবিলা কর। বাংলার মাটি থেকে শত্রুকে উৎখাত করতে হবে। বাংলাদেশের মানুষকে স্বাধীন করতে হবে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। দুনিয়ার মানুষের কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম। আমার সামরিক বাহিনীতে যারা বাঙালি ছিল, তাদের এবং আমার বিডিআর, আমার পুলিশ, আমার ছাত্র, যুবক ও কৃষকদের আমি আহ্বান করেছিলাম। বাংলার মানুষ

রক্ত দিয়ে মোকাবিলা করেছিল। ৩০ লক্ষ লোক শহীদ হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মা-বোন ইজ্জত হারিয়েছিল, শত শত বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছিল। দুনিয়ার জঘন্যতম ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল পাকিস্তানি শোষক শ্রেণি। দুনিয়ার ইতিহাসে এত রক্ত স্বাধীনতার জন্য কোন দেশ দেয় নাই, যা বাংলার মানুষ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা এমনভাবে পঙ্কিলতা শুরু করল। যা কিছু ছিল ধ্বংস করতে আরম্ভ করল। ভারতে আমার এক কোটি লোক আশ্রয় নিয়েছিল। তার জন্য আমরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব। আমি তাদের স্মরণ করি, খোদার কাছে তাদের মাগফেরাত কামনা করি, যারা এদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছে, আত্মাহুতি দিয়েছে। আমি তাদের স্মরণ করব, যে সকল মুক্তিবাহিনীর ছেলে, যেসব মা-বোন, আমার যে কর্মীবাহিনী, যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছিল, শহীদ হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে। এদেশ তাদের সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর যাঁরা জীবন দিয়েছিল বাংলার মাটিতে, আজ তাদের কথাও আমি স্মরণ করি।

এখানে একটা কথা। আপনাদের মনে আছে, পাকিস্তানিরা যাওয়ার পূর্বে ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে, ১৬ই ডিসেম্বরের আগে, কারফিউ দিয়ে ঢাকা এবং অন্যান্য জায়গায় আমার বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করব, সম্পদ ধ্বংস করব, বাঙালি স্বাধীনতা পেলেও এই স্বাধীনতা রাখতে পারবে না। ইনশাআল্লাহ, বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা হয়েছে। বাংলার লোক স্বাধীন হয়েছে। বাংলার পতাকা আজ দুনিয়ায় ওড়ে। বাংলাদেশ আজ জাতিসংঘের সদস্য। বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর সদস্য, কমনওয়েলথের সদস্য, ওআইসি-এর সদস্য। বাংলাদেশ দুনিয়ায় এসেছে, বাংলাদেশ থাকবে, কেউ একে ধ্বংস করতে পারবে না।"

(সূত্র : ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা 'বঙ্গবন্ধু স্মরণে')

১৯৭৫-এর ১৯ জুন : দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭৫ সালের ১৯ জুন। বঙ্গবন্ধু বললেন, দেশের মাটি, দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর সংযোগ রেখে আমরা শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই। বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে তিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের মাটি, মানুষ, আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করেই আমরা আমাদের দেশের অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন করতে চাই। কোনো দেশ থেকে কোনো সিস্টেম আমরা আমদানি করতে চাই না। আমাদের মূল আদর্শ হলো, বাংলাদেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে সম্মানের সঙ্গে পৃথিবীর বুকে বাঁচিয়ে রাখা। এজন্য বাংলাদেশের দুঃখী মানুষকে পেটভরে খাবার দিতে হবে। আমরা এমন একটি সমাজ গঠন করতে চাই যেখানে থাকবে না কোনো দুর্নীতি, অত্যাচার, জুলুম বা শোষণ।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমরা পেয়েছি আমাদের কাঙ্ক্ষীত স্বাধীনতা। এক সাগর রক্তের উপর দিয়ে এসেছে আমাদের স্বাধীনতা। এই দেশকে যদি বিশ্বের দরবারে দাঁড় করাতে হয় তাহলে প্রয়োজন দ্বিতীয় বিপ্লব। এজন্যই আমি দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছি। আমরা জোটনিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি স্বাধীন বিদেশ নীতিতে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপর ভিত্তি করে আমরা এগুতে চাই। আমরা দুনিয়ার নির্যাতিত জনগণের সঙ্গে আছি। আমরা কারো সাথে শত্রুতা করতে চাই না। আমরা বন্ধুত্ব চাই সকলের সঙ্গে। আমরা আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রি। আমরা বিশ্ব শান্তি চাই। আমরা কারো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। আমাদের ব্যাপারেও কেউ হস্তক্ষেপ করুক এটা আমরা চাই না। আমরা দেশকে গড়তে চাই।

আমরা মনে করি আমাদের বৈদেশিক নীতি সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। আজ আমরা জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে কাজ করছি। আমরা আছি ইসলামিক সামিটে, আছি কমনওয়েলথ এবং ইউএন ও-তে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আমাদের প্রয়োজন নেই। এতে আমাদের কোনো স্বার্থ নেই। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, আমাদের স্বজন হারানোর অর্থ কী? এই অর্থ হলো আমাদের অর্থনীতির মালিক আমরা এবং আমাদের দেশ সেই সম্পদ ভোগ করবে।

অনেক কষ্ট করেছে আমাদের দেশের মানুষ। না খেতে পেয়ে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে যে সম্পদ আছে, তা যদি গড়তে পারি, সৎভাবে কাজ করতে পারি তাহলে বাংলাদেশের কষ্ট একদিন দূর হয়ে যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে রাশিয়ার, আছে ভারতবর্ষের সঙ্গে। আমরা বন্ধুত্ব চাই আমেরিকার সঙ্গেও। দেশকে গড়ার জন্যই এই দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক। দেশ গড়ার কাজে, নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলার কাজে সকলে এগিয়ে আসুন।

(সূত্র : বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতার কণ্ঠস্বর, শহিদ হোসেন)

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট : সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর জীবনাবসান

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট। আর পাঁচটা দিনের মতো সেদিনও সূর্য উদিত হয়েছিল পূর্ব আকাশে। কিন্তু জনগণের এক মহান সূর্য সেদিন মানুষের মননে উদিত হয়নি। দিনটি ছিল একটি কালো দিন। বাঙালির শোকের দিন। আকস্মিকভাবে মহাপ্রয়াণ ঘটল মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নেওয়া বঙ্গবন্ধুর। তিনি জাতির পিতা। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বলেছিলেন, রক্ত যখন দিয়েছি আরো রক্ত দেব। তিনি কথা রাখলেন। তাঁর শরীরের সবটুকু রক্ত তিনি ঢেলে দিলেন তাঁর প্রিয় সোনার বাংলার মাটিতে। যেন তিনি বাংলাদেশের মাটিকে চুম্বন দিয়ে গেয়ে উঠলেন আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। তিনি নিহত হলেন দেশদ্রোহীদের দ্বারা। বাঙালি হারাল তাদের হৃদয় ছোঁয়া সূর্যের মতো আলোকোজ্জ্বল এক নেতাকে। বিশ্ববাসী হারাল গণতন্ত্রপ্রিয় ধর্মনিরপেক্ষ শান্তি প্রিয় এক মহান দেশপ্রেমিক ব্যক্তিত্বকে।

এই বছরটি তিনি শুরু করেছিলেন নতুন সরকারি ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি। বাংলাদেশে প্রবর্তিত হয় রাষ্ট্রপতি ধাঁচের সরকার। প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। গঠন করলেন জাতীয় দল। যে দলের নামকরণ করেছিলেন বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। নতুন এই দল গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে। তিনি সরকারের প্রশাসনিক এই পরিবর্তনকে বলেছিলেন দ্বিতীয় বিপ্লব।

বঙ্গবন্ধুর এই দ্বিতীয় বিপ্লব কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতাকে অর্থবহ করা। মানুষের মৌলিক চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব কর্মসূচির অন্যতম বিষয় ছিল—দুর্নীতি দমন, ক্ষেতে খামারে ও কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা। নতুন এই মঞ্চ বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবী মহলকেও যুক্ত করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুই নির্বাচিত হয়েছিলেন এই দলের চেয়ারম্যান।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। বাংলাদেশের বর্তমান জনপ্রিয়তম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন ঐ দিন ঘটেছিল ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড। তিনি

একটি প্রবন্ধে বলেছেন–"মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে আসছে, প্রতিটি মুসলমানকে আহ্বান জানাচ্ছে–সে আহ্বান উপেক্ষা করে ঘাতকের দল এগিয়ে এলো ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্যে। গর্জে উঠল হাতের অস্ত্র। ঘাতকের দল হত্যা করলো স্বাধীনতার প্রাণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। এ নরপিশাচরা হত্যা করল আমার মাতা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিবকে। হত্যা করল মুক্তিযোদ্ধা ছাত্রনেতা শেখ কামালকে, শেখ জামালকে, তাদের নরপরিণীতা বধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামালকে। যাদের হাতের মেহেদীর রং বুকের তাজা রক্তে মিশে একাকার হয়ে গেল। খুনিরা হত্যা করল বঙ্গবন্ধুর একমাত্রা ভ্রাতা শেখ আবু নাসেরকে। সামরিক বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জামিল, যিনি রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা দানের জন্য ছুটে এসেছিলেন। হত্যা করল কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার ও কর্মকর্তাদের।

আর সব শেষে হত্যা করল রাসেলকে, যার বয়স মাত্র দশ বছর। বারবার রাসেল কাঁদছিল, 'মায়ের কাছে যাবো' বলে। তাকে বাবা-ভাইয়ের লাশের পাশ কাটিয়ে মায়ের লাশের পাশে এনে নির্মমভাবে হত্যা করল। ওদের ভাষায় রাসেলকে Mercy Murder (দয়া করে হত্যা) করেছে।

ঐ ঘৃণ্য খুনিরা যে এখানেই হত্যাকাণ্ড শেষ করেছে তা নয়, এই সাথে একই সময়ে হত্যা করেছে যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণিকে তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণিকে–হত্যা করেছে কৃষক নেতা আবদুর রব সেরনিয়াবাতকে, তার তের বছরের কন্যা বেবীকে। রাসেলের খেলার সাথী তার কনিষ্ঠ পুত্র ১০ বছরের আরিফকে। জ্যেষ্ঠপুত্র আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর জ্যেষ্ঠ সন্তান চার বছরের সুকান্তকে। তার ভ্রাতুপুষ্প সাংবাদিক শহীদ সেরনিয়াবাত ও নান্টুসহ পরিচারিকা ও আশ্রিতজনকে। আবারো একবার বাংলার মাটিতে রচিত হলো বেঈমানীর ইতিহাস। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে শেষ নবাব সিরাজুদ্দৌলার সাথে বেঈমানী করেছিল তারই সেনাপতি। ক্ষমতার লোভে, নবাব হওয়ার আশায়। ১৯৭৫ সালে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল বাংলাদেশে।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল তাঁরই মন্ত্রিপরিষদের সদস্য খন্দকার মোশতাক, রাষ্ট্রপতি হওয়ার খায়েশে। ঘাতকের দলে ছিল কর্নেল রশিদ, কর্নেল ফারুক, মেজর ডালিম, হুদা, শাহরিয়ার, মহিউদ্দিন, খায়রুজ্জামান, মোসলেম গং। পলাশীর প্রান্তরে যেমন নীরবে দাঁড়িয়েছিল নবাবের সৈন্যরা সেনাপতির গোপন ইশারায়–"

(সূত্র : বঙ্গবন্ধু–মিজান রহমান)

বঙ্গবন্ধু একজন ব্যক্তিই শুধু নন, তিনি একটি দেশের প্রতীক। একটি আন্দোলন। বঙ্গবন্ধু মানে একটি সংগ্রাম, একটি রাষ্ট্র। একটি বিপ্লব। তিনি একটি জাতি নির্মাণের কারিগর। মহাকাব্যের অমর গাঁথা এবং একটি ইতিহাস। বঙ্গবন্ধুর প্রয়াণ নিছক একটি প্রয়াণই নয়। তাঁর প্রয়াণ বাঙালি জাতির প্রেরণা। তাঁর সমগ্র জীবন বিশ্বের সকল দেশপ্রেমিক মানুষের কাছে প্রেরণা। যত দিন বাংলাদেশ থাকবে, পৃথিবীতে মনুষ্য জাতি থাকবে তত দিন আরো উজ্জ্বলতর হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামটি। ১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির জীবনে এক কলঙ্কময় দিন। এই দিবসটি জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করে সমগ্র বাংলাদেশবাসী।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির কাছে সবচাইতে দুঃখের দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। কেননা ১৫ আগস্ট ভোররাতে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতক অফিসারের হাতে নিহত হন। সেদিন রাতে ধানমণ্ডির ঐ তীর্থভূমিতে বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের ষোলজন সদস্য-সদস্যাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। যা ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ড।

সেদিন ঐ কালো রাতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যাঁরা নিহত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন–বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুননেছা, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠপুত্র মুক্তিযোদ্ধা লে. শেখ কামাল, পুত্র লে. শেখ জামাল, কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেল, দুই পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামান, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের, ভগ্নিপতি ও কৃষিমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও তাঁর কন্যা বেবী সেরনিয়াবাত, পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, দৌহিত্র সুকান্ত আবদুল্লাহ বাবু, ভ্রাতুষ্পুত্র শহীদ সেরনিয়াবাত, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবনেতা ও সাংবাদিক শেখ ফজলুল হক মনি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজুমনি, বঙ্গবন্ধুর সামরিক সচিব কর্নেল জামিল আহমেদ এবং চৌদ্দ বছরের কিশোর আবদুল নঈম খান রিন্টু। ইতিহাসের এই বর্বরতম হত্যাকাণ্ডে গোটা বিশ্ব সেদিন শোকস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ হয়ে যাবার পর বাংলাদেশে জারি হয়েছিল সামরিক শাসন। হত্যা করা হয় গণতন্ত্রকে। শুরু হয় জঘন্য ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। কেড়ে নেয়া হয় জনগণের ভোটাধিকার, ঐ হত্যাকাণ্ডের চল্লিশ দিনের মাথায় ২৬ সেপ্টেম্বর জারি করা হয় সামরিক অধ্যাদেশ। এই রকম নিষ্ঠুর, অমানবিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বিচার প্রক্রিয়া শুরুই করা হয়নি পরবর্তী দুই দশক। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর ২ অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারে সদস্যগণকে হত্যার বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করা হয়। ১২ নভেম্বর জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়। ১৯৯৭ সালের ১ মার্চ ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে বিচারকার্য শুরু হয়। ৮ নভেম্বর ১৯৯৮ জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল ৭৬ পৃষ্ঠার রায় ঘোষণায় ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। ২০০০ সালের ১৪ নভেম্বর হাইকোর্টে মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিলের দুই বিচারক বিচারপতি মো. রুহুল আমিন এবং বিচারপতি এ. বি. এম. খায়রুল হক দ্বিমতে বিভক্ত রায় ঘোষণা করেন। এরপর তৃতীয় বিচারপতি মো. ফজলুল করিম ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। এরপর পাঁচজন আসামি আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল করে। ২০০২-২০০৬ পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় মামলাটি কার্য তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। ২০০৭ সালে শুনানির জন্য বেঞ্চ গঠিত হয়। ২০০৯ সালে ২৯ দিন শুনানির পর ১৯ নভেম্বর প্রধান বিচারপতিসহ পাঁচজন বিচারপতি রায় ঘোষণায় আপিল খারিজ করে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। ২০১০ সালের ২ জানুয়ারি আপিল বিভাগে আসামিদের রিভিউ পিটিশন দাখিল এবং তিনদিন শুনানি শেষে ২৭ জানুয়ারি চার বিচারপতি রিভিউ পিটিশন খারিজ করেন। এদিনই মধ্যরাতের পর ২৮ জানুয়ারি পাঁচ ঘাতকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ঘাতকদের একজন বিদেশে পলাতক অবস্থায় মারা গেছে। এবং ছয়জন বিদেশে পলাতক রয়েছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি ৩৪ বছর পর বাস্তবায়িত হলো।

[সূত্র : আমি বিজয় দেখেছি–এম. আর. আখতার মুকুল, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার কণ্ঠস্বর–যাহিদ হোসেন, বঙ্গবন্ধু-সম্পাদনা মিজান রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও সংগ্রাম–ড. দেবব্রত দেবরায়, অসমাপ্ত আত্মজীবনী–শেখ মুজিবুর রহমান)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই মহান আত্মবলিদান বৃথা যায়নি। তিনি শারীরিকভাবে হয়তো আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর স্থায়ী আসন পাতা হয়েছে গেছে বিশ্বের ত্রিশ কোটি বাঙালির হৃদয়ে। তিনি আছেন বিশ্ববাসীর স্মরণে, মননে। তার মহান আদর্শকে পাথেয় করে বাংলাদেশ আজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে তাঁরই সুযোগ্যা কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। জয় বাংলা। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। বঙ্গবন্ধু অমর রহে।
